পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের
তাফসীর মাহফিল থেকে

বিষয়ভিত্তিক
তাফসীরুল কোরআন

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

বিষয়ভিত্তিক

তাফসীরুল কোরআন

প্রথম খন্ড

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক তাফসীর মাহফীলে কোরআন-হাদীস, ইতিহাস, দর্শন, চলমান ঘটনা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আলোচিত বিষয়সমূহ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯

বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন
প্রথম খন্ড
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
সার্বিক সহযোগিতায় ঃ রাফীক বিন সাঈদী
অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল
প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ নাবিল কম্পিউটার
৫৩/১ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
প্রচ্ছদ ঃ কোবা কম্পিউটার এন্ড এ্যাডভারটাইজিং
৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭
মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০
শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ২০০ টাকা মাত্র

Bishoy Bhittique Tafsirul Quran 1st Part by Moulana Delawar Hossain Sayedee, Co-operated by Rafeeq bin, Sayedee, Copyist : Abdus Salam Mitul, Published by Global publishing Network, Dhaka.2nd Edition 2009 March, Price : 200 Hundred Tk, only in BD, 5 Doller in USA, 3 Pound UK.

কিছু কথা

সর্বপ্রথমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আলীশানে শতকোটি শোকর গোজার করছি, যিনি আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাত বিশ্ব-মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন দান করে পৃথিবীতে প্রচলিত অগণিত বাঁকা পথের গোলক ধাঁ-ধাঁ থেকে বের করে সহজ-সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম মানবতার মহান মুক্তিদূত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি, যাঁর ওপরে আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং যাঁর মাধ্যমে বিশ্বের শোষিত, নিপিড়ীত ও নির্যাতিত মানবতার মুক্তির পথনির্দেশনা দিয়েছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুয়্যাতের জীন্দেগীতে কোরআনের বিধান বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে অশুভ শক্তির সাথে সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সংগ্রামমুখর জীবন-যাপন করেছেন। সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমেই তিনি একদল নিষ্ঠাবান, নিঃস্বার্থ, অকুতোভয় বীর মুজাহিদ তৈরী করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন আল কোরআনের বিপ্লবী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ কর্মী। আল্লাহর রাসূল তাঁদের মাধ্যমেই একটি শোষণ মুক্ত, নিরাপত্তাপূর্ণ, সুখী -সমৃদ্ধশালী ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রত্যেক যুগের চিন্তানায়কগণই এ কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, আল কোরআনের বিধান বাস্তবায়ন ব্যতীত পৃথিবীর মানুষ কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না।

সেই কোরআনের বিপ্লবী সিপাহ্সালার সারা দুনিয়ার অগণন মানুষের প্রাণ প্রিয় মুফাচ্ছির আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব পৃথিবীর আনাচে কানাচে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে কোরআনের আহ্বান পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আল হাম্‌দুলিল্লাহ- তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টায় সারা পৃথিবীব্যাপী ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে এবং অগণিত মানুষ কোরআনের বিধান দুনিয়ায় পুনরায় বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বজ্র শপথ গ্রহণ করেছে। আল্লাহর কোরআন একটি বিপ্লবী আন্দোলনের পয়গাম নিয়ে এসেছে- এই কথাটি মুসলমানরা কালের ব্যবধানে বিস্মৃত হয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আল্লামা সাঈদী সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে মুসলমানরা কোরআনের দিকে ফিরে আসছে। শুধু মুসলমানরাই নয়- অগণিত অমুসলিমও তাঁর হাতে হাত দিয়ে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে। তিনি পৃথিবীর দেশে দেশে তাফসীরুল

কোরআন মাহফিলের মাধ্যমে মানুষকে কোরআনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত প্রত্যেকটি শব্দই শান্তি পিয়াসী মুক্তি পাগল জনতার প্রাণে কোরআনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই আকর্ষণকে স্থায়ীভাবে মানুষের মনের জগতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিক তাফসীর মাহফিলে আলোচিত বিষয়সমূহ গ্রন্থাবদ্ধ করে জাতির খেদমতে পেশ করার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে কামিয়াব করুন।

তাফসীর মাহফিলে আল্লামা সাঈদী সাহেবের আলোচনা শুনে কোরআন পাগল জনতা যেভাবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন, আমরা আশা করছি– তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ এবং তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা– যা বর্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, এসব গ্রন্থ পাঠ করেও মুক্তি পিয়াসী জনতা কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। দুই খন্ডে বিভক্ত **বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন** – নামক এই গ্রন্থ সাজানো হয়েছে, তাঁর বক্তৃতা ও লেখনী দিয়ে। গ্রন্থের কোথাও তথ্যগত ভুল কারো দৃষ্টিতে ধরা পড়লে তা আমাদের ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ সংশোধন করা হবে। শব্দ ধারণযন্ত্র থেকে সঙ্কলন করার ক্ষেত্রে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের অসতর্কতা হেতু তথ্যগত ভুল লেখনী আকারে গ্রন্থাবদ্ধ হওয়া বিচিত্র কিছু নয়, এ জন্য তথ্যগত ভুলের দায়-দায়িত্ব একান্তভাবেই অনুলেখক-সঙ্কলকের।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোরআনের খাদেম আল্লামা সাঈদী সাহেবকে শারীরিক সুস্থতা ও দীর্ঘ হায়াত দান করুন এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করে আখিরাতের ময়দানে একে নাজাতের উসিলা বানিয়ে নিন।

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্কের পক্ষে

বিনয়াবনত

আব্দুস সালাম মিতুল

আলোচিত বিষয়

আলোচিত বিষয়

আলোচিত বিষয়

আলোচিত বিষয়

আলোচিত বিষয়

আলোচিত বিষয়

গ্লোবাল পাবলিশিং এর প্রকাশিত বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাস্সীর **মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী** কর্তৃক রচিত বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর ও অন্যান্য গবেষণাধর্মী গ্রন্থের কয়েকটি।

১। তাফসীরে সাঈদী- সূরা ফাতিহা
২। তাফসীরে সাঈদী সূরা আসর
৩। তাফসীরে সাঈদী সূরা লূকমান
৪। তাফসীরে সাঈদী আমপারা
৫। বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন ১ ও ২
৬। মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২
৭। আমি কেনো জামায়াতে ইসলামী করি
৮। আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ
৯। আলকোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান
১০। আল্লামা সাঈদী রচনাবলী ১, ২ ও ৩
১১। মানবতার মুক্তিসনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন
১২। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্য্যের অপরিহার্যতা
১৩। আল কোরআনের মানদণ্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা
১৪। আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?
১৫। হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন
১৬। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম
১৭। দ্বীনে হক এর দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি
১৮। চরিত্র গঠনে নামাজের অবদান
১৯। কাদিয়ানীরা কেনো মুসলিম নয়?
২০। দেখে এলাম অবিশ্বাসীদের করুণ পরিণতি
২১। শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে
২২। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মোনাজাত
২৩। জান্নাত লাভের সহজ আমল
২৪। পবিত্র কোরআনের মুজিজা
২৫। আল্লাহ কোথায় আছেন?
২৬। আখিরাতের জীবন চিত্র
২৭। ঈমানের অগ্নিপরিক্ষা
২৮। নীল দরিয়ার দেশে
২৯। ফিক্হুল হাদীস

অন্যান্য লেখকের

১। প্রিয় রাসূল (সাঃ) দেখতে কেমন ছিলেন
২। পবিত্র রমজানে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
৩। জিয়ারতে মক্কা- মদীনা ও কোরআন- হাদীসের দোয়া
৪। বাংলাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ
আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর অবদান

সর্বত্র শুধুই মূর্তি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে সময়ে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন সে সময়ে আরবে নানা ধরণের ধর্মমত প্রচলিত ছিল। এক আল্লাহর দাসত্ব করার লোক সংখ্যা ছিল হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন। কেউ আকাশের চাঁদকে, কেউ আকাশের তারকা মালার, এর মধ্যে আবার ছোট তারকার ও বড় তারকার পূজারী ছিল। কেউ সূর্যকে, কেউ বাতাশকে, কেউ সাগর-মহাসাগরের, কেউ মাটির পুতুলের, কেউ বৃক্ষ-তরু-লতার দাসত্ব করতো।

কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করতো বটে, কিন্তু সে বিশ্বাস ছিল অংশীদারির ঘৃণ্য স্পর্শে কলংকিত। তারা ধারণা করতো, আল্লাহর মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি রয়েছে। কেউ ধারণা করতো আল্লাহ নিরংকুশভাবে শক্তিশালী নন, এ কারণে তিনি তাঁর ফেরেশ্তা বাহিনী দিয়ে তাঁর রাজত্বের কর্মকান্ড সমাধা করান।

অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল শিরক মিশ্রিত। অধিকাংশ গোত্র পাথর বা মাটির বানানো পুতুলের পূজা-আরাধনা করতো। আরবের বুকে সর্ব প্রথম মূর্তি পূজার প্রচলন করে রাবিয়া ইবনে হারিসা নামক এক লোক। তাঁর আরেক নাম ছিল আমর ইবনে লুয়াই। এই লোকটা ভীষণ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ছিল। আরবের কুজায়া গোত্রের সমস্ত কিছুর উৎস-ই ছিল সে।

সে সময়ে মক্কার ঘরের দেখাশোনা করাটা বর্তমান যুগের ন্যায় অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার কাজ ছিল। কাবাঘর কে বা কোন গোত্র দেখা শোনা করবে, তা নিয়েও যুদ্ধ দাঙ্গা হাঙ্গামা হতো। ইতিহাসে দেখা যায়, জুরহাম নামক এক ব্যক্তি কাবাঘরের খেদমত করতো অর্থাৎ জুরহাম ছিল মক্কার ঘরের মোতাওয়াল্লী। আমর ইবনে লুহাই শক্তি প্রয়োগ করে, যুদ্ধ করে জুরহামকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে কাবাঘরের দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ সে জোর পূর্বক কাবা ঘরের খাদেম সেজেছিল। আর এই লোকই গোটা আরবে মূর্তি পূজার প্রচলন করেছিল।

আমর ইবনে লুয়াই একবার সিরিয়া ভ্রমণে যেয়ে সেখানের মানুষদেরকে মূর্তি পূজা করতে দেখে তাদেরকে সে প্রশ্ন করেছিল, তোমরা এসব মূর্তির পূজা করছো কেন? তারা জবাব দিয়েছিল, এসব মূর্তি আমাদের দেবতা, এরা আমাদের সব ধরণের প্রয়োজন পূরণ করে। যুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী করে, বৃষ্টির প্রয়োজন হলে বৃষ্টি বর্ষন করে, আমাদেরকে নানাভাবে লাভবান করে।

আমর এই সমস্ত কথা শুনে অনেকগুলো মূর্তি সাথে করে এনে কাবাঘরের আশেপাশে স্থাপন করেছিল। গোটা আরবের প্রাণ কেন্দ্র ছিল কাবাঘর। আরবের সমস্ত গোত্র কাবাঘরে হজ্জ করতে আসতো। তারা ফিরে যাবার সময়ে মক্কা থেকে একটা করে পাথর সাথে করে নিয়ে যেত। সে সমস্ত পাথরে মূর্তি খোদাই করে সেগুলোর পূজা করতো।

কাবাঘরের আশেপাশে যেসব মূর্তি ছিল তার ভেতর একটা পুরনো মূর্তি ছিল যার নাম দেয়া হয়েছিল মানাত। এই মানাত মূর্তি সমুদ্রের কাছে কাদিদ নামক স্থানে বেদীতে স্থাপন করা হয়েছিল। মদীনার আউজ ও খাজরাজ গোত্র, হুযাইল গোত্র এবং খুজায়া গোত্র এই মান্নাত দেবতার পূজা করতো। তারা এই মূর্তির সামনে কোরবানী দিত। কাবাঘরে হজ্জ করতে আসার সময় তারা এই মূর্তির কাছে এহ্‌রাম খুলতো।

তায়েফে একটা বিশাল মূর্তি ছিল। সেটার নাম দেয়া হয়েছিল লাত। ছাকিফ গোত্র এই লাতের পূজা আরাধনা করতো। মক্কায় উজ্জা নামে একটা বিশাল মূর্তি স্থাপন করে তার পূজা করতো কুরাঈশ ও কেনানা গোত্র। দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানে উদ নামক একটা মূর্তি স্থাপন করে তার পূজা করতো কলব গোত্র। ছুওয়া, ইয়াগুস ও ইয়াউক মূর্তিও ছিল দুমাতুল জান্দালে। এসব মূর্তির পূজা করতো হুজায়েল গোত্র, মাজহুজ গোত্র, ইয়েমেনের কয়েকটি গোত্র, হামাদান গোত্র।

সবচেয়ে বড় যে মূর্তি ছিল তার নাম হুবল। এই হুবলকে স্থাপন করা হয়েছিল একেবারে কাবাঘরের ছাদের ওপরে। মক্কার কুরাঈশ গোত্র ছিল হুবল মূর্তির পূজারী। তারা বিভিন্ন সময়ে হুবলের নামে উচ্চস্বরে শ্লোগান দিত। ওদিকে ইয়েমেনের হামীর গোত্র সূর্যের পূজা করতো। কেনানা গোত্র করতো চাঁদের পূজা। এককথায় আরবের সর্বত্র ছিল মূর্তি পূজার প্রচলন।

প্রতিটি ঘরে ঘরে ছিল মূর্তি আর মূর্তি। এক একটি বংশ ও গোত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ছিল। সেযুগের মূর্তি পূজার অবস্থা কল্পনা করে কবি একটা চিত্র অংকন করেছেন– প্রতিটি গোত্র, প্রতিটি কবিলা এবং বংশের জন্য একটা করে খোদা ছিল। এভাবে তারা তাদের প্রতিটি ঘরের জন্য একটা করে খোদা বানিয়ে নিয়েছিল। আর এভাবেই প্রতিটি ঘরে ঘরে মূর্তির আরাধনা চলতো।

প্রাণহীন মূর্তির সামনে কেন নত করি মাথা

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম যখন পৃথিবীতে এলেন সে সময়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের এই আদি পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন–

فَاِمَّايَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ–

আমার পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের কাছে পৌছবে, যারা আমার সেই বিধান অনুসরণ করবে, তাদের জন্য ভয়ভীতি এবং চিন্তার কোন কারণ অবশিষ্ট থাকবে না। (সূরা বাকারা-৩৮)

মহান আল্লাহ স্পষ্ট ঘোষনা করেছেন যে, মানুষের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমেই ইসলাম এই পৃথিবীতে আগমন করেছে। সুতরাং পৃথিবীতে যত নবী ও রাসূল এসেছিলেন তাঁদের সবাই ইসলামী আদর্শ প্রচার করেছেন। ইসলাম কোন নতুন আদর্শের নাম নয়। ইসলাম চির পুরাতন এক শাশ্বত আদর্শের নাম। আর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন, তিনি হলেন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণতা দানকারী। বিদায় হজ্জের সময়ে কোরআনের যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, সে আয়াতেও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, আজ আপনার আদর্শকে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا–

আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে কবুল করে নিয়েছি। (সূরা মায়েদা-৩)

যদিও ইসলাম বৈরী মহল বিশ্বব্যাপী প্রচার করেছে এবং তাদের প্রচারিত কথাই মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শিক্ষাঙ্গণে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম জাতির ভেতরে এই কথাটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে–ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু কোরআন-হাদীস ও

ইতিহাসের মোকাবেলায় এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। আদম আলাইহিস্ সালামের থেকে ইসলামের যাত্রা শুরু। সে কারণে প্রত্যেক নবী-রাসূলই ইসলামের দিকেই মানুষকে এই কথা বলে ডেকেছেন যে, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ব্যতীত আর কেউ দাসত্ব লাভের যোগ্য নয়। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামও মানুষকে নির্ভেজাল ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আদর্শ, তাওহীদের শিক্ষা মহাকালের ঘূর্ণায়মান চক্রের আবর্তন ও বিবর্তনে এক শ্রেণীর মানুষের ভ্রান্তির কারণে বিকৃত হয়ে যায়। নির্ভেজাল একত্ববাদের মধ্যে তারা অংশীবাদের মিশ্রণ ঘটায়।

যে কাবাঘর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তান ও আল্লাহর নবী হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামকে সাথে করে পুনঃনির্মাণ করেন, সেই কাবাঘরের মাথায় পৌত্তলিকগণ মূর্তি স্থাপন করে। তাওহীদের অমীয় আদর্শ পৌত্তলিকতার ঘৃণ্য আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। এক সময়ে তাওহীদের প্রজ্বলিত আলোক শিখা গোটা আরবকে আলোকিত করেছিল, সে আলোক শিখা জোনাকীর আলোর ন্যায় মিটমিট করে জ্বলতে থাকে। মুশরিকদের শত অপচেষ্টাতেও তাওহীদের শিখা নির্বাপিত হয়নি।

তদানীন্তন সমাজের কিছু সচেতন সতর্ক দৃষ্টির অধিকারী, সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষ ছিলেন, যারা মনে প্রাণে মূর্তিপূজা ঘৃণা করতেন। কালের মহাস্রোতে এই শ্রেণীর মানুষ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে সময়ে ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন, সে সময় পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব ছিল। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শের অনুসারী বা নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসন্ধানকারীদেরকেই সে সময়ে হানিফী বলা হতো।

গোটা আরবে মূর্তিপূজার প্লাবন বয়ে গেলেও এক শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব সেখানে ছিল যারা মূর্তিকে সমস্ত অন্তর দিয়ে যে শুধু ঘৃণাই করতো তা নয়, তারা বিরোধিতাও করতো। প্রতি বছরের শেষে মূর্তিপূজকরা মূর্তির সমাবেশ ঘটাতো। এই ধরণের এক সমাবেশে জায়েদ ইবনে আমর, ওয়ারাকা ইবনে নওফেল, ওসমান ইবনে হুওয়াইরেস, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ প্রমুখ বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কোরায়েশ গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা। ওসমান ছিলেন আব্দুল

উজ্জার নাতি, আব্দুল্লাহ ছিলেন হযরত হামজার ভাইয়ের সন্তান, জায়েদ ছিলেন হযরত ওমরের চাচা আর ওয়ারাকা ছিলেন হযরত খাদিজার চাচাত ভাই। মূর্তির সমাবেশে তারা অজস্র মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ করেই তাদের মনের জগতে গুঞ্জন আরম্ভ হলো, আমরা কেন নিঃপ্রাণ পাথরের সামনে নিজেদের মাথানত করি ? কেন আমরা এই জড় পদার্থের আরাধনা করি? এসব কাজ তো অনর্থক ! এসব পাথরের মূর্তি তো কারো কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, তাহলে কেন আমরা এসবের আরাধনা করবো?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার অনেক পূর্ব থেকেই তাঁর সাথে জায়েদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। জায়েদ মূর্তিকে ঘৃণা করে মহাসত্যের অনুসন্ধানে সে সময়ে সিরিয়া গিয়েছিল। সেখানে সে ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের সাথে মিলিত হয়েছিল। কিন্তু সে ঐ সব ধর্মে সত্যের সন্ধান পেলেন না বিধায় তাঁর মনের অস্থিরতা দূর হলো না। পুনরায় মক্কায় ফিরে এলো। পরিচিতদের কাছে সে বলতো, আমি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শকে বিশ্বাস করি। হানিফী ধর্ম মেনে চলি।

হযরত আছমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমি জায়েদকে দেখেছি, সে কাবাঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে সমবেত কোরাঈশদের লক্ষ্য করে আক্ষেপের স্বরে বলতো, হে কোরাঈশের দল! আমি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নেই।

তদানীন্তন আরব সমাজে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। এই ধরণের অমানবিক প্রথার জায়েদই প্রথম বিরোধিতাকারী ব্যক্তি। তিনি এধরণের অনেক কন্যা সন্তানকে নিয়ে নিজে প্রতিপালন করেছেন। (বোখারী)

কায়েস ইবনে নুশবাহ নামক এক ব্যক্তি মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিল। সেই মূর্তির যুগেও সে এক আল্লাহর ওপরে বিশ্বাসী ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন আন্দোলনের সূচনা করলেন, তখনই সে ইসলামে শামিল হয়েছিল। আরবের বিখ্যাত বাগ্মী কায়েস ইবনে ছায়েদাল আইয়াদিও নিজেকে মূর্তিপূজা হতে বিরত রেখেছিল। এ ধরণের অনেকেই তদানীন্তন আরবে মূর্তিপূজার বিরোধিতা করতো। ওয়ারাকা ইবনে নওফল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ মূর্তিপূজা ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

বনী আমের ইবনে সা'সায়া বংশের একজন ব্যক্তি তাঁর নাম ছিল আনূনা বিগাতুল জা'য়াদী। তিনি মূর্তি পূজার কঠোর বিরোধী ছিলেন। তিনি পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস করতেন। জীবনের সমস্ত কর্মকান্ডের জবাব আদালতে আখেরাতে দিতে হবে তা তিনি বিশ্বাস করতেন এবং মানুষের কাছে বলতেন। তিনি রোজা পালন করতেন এবং আল্লাহর কাছে তওবাহ করতেন। বনী আদী ইবনে নাজ্জার বংশের সিরমা ইবনে আনাসও ছিলেন মূর্তিপূজার ঘোর রিরোধী। মহানবীর আগমনের পূর্বে তিনি অত্যন্ত সহজ সরলভাবে জীবন-যাপন করতেন। কোন ধরণের মাদকদ্রব্য তিনি ব্যবহার করতেন না। নিজের স্ত্রীর মাসিক হলে তিনি স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন না। স্ত্রীর সাথে মিলিত হলে তিনি গোছল ফরজ হয়েছে মনে করতেন। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু পরে তা গ্রহণ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহর কোনো শরীক নেই। ইসলামী পদ্ধতিতে তিনি পাক-নাপাক বুঝে চলতেন। দরবারে রেসালাতে তিনি যখন এসে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি বয়েসের শেষ প্রান্তে পৌছেছিলেন।

আমি ঐ ইয়াতিম শিশুটিকেই নিয়ে যাবো

অভিজাত আরবরা একটা প্রথা চালু রেখেছিল যে, তারা তাদের শিশুদের দুধ পান করানোর জন্য আরবের শহরতলীর অধিবাসীদের কাছে প্রেরণ করতো। এর কারণ হলো, তাদের ভাষা ছিল প্রকৃতই আরবী এবং উচ্চারণও ছিল একেবারে স্পষ্ট। তাছাড়া তাদের মধ্যে শিশু প্রতিপালিত হলে, সে শিশু আরবের নিজস্ব বৈশিষ্ট নিয়ে বেড়ে উঠতো। তাদের চরিত্রে আরবের প্রকৃত স্বভাব প্রস্ফুটিত হত।

এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বলেছেন, আমি প্রতিপালিত হয়েছি আরবের শুদ্ধভাষী বনী সা'আদ গোত্রে। আরবে দীর্ঘদিন যাবৎ শিশুদের দুধ পান করানোর এই প্রথা বহাল ছিল। শহরতলীর বেদুঈনেরা বছরে দুইবার প্রথানুসারে শহর এলাকায় আগমন করতো। এ সম্পর্কে সীরাতে ইবনে হিশাম হালিমার নিজস্ব বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, আমি স্বামীকে ও তাঁর দুধের শিশুকে সাথে নিয়ে বনী সা'আদের কয়েকজন নারীর সাথে দুধ পান করাবে এমন শিশুর খোঁজে এসেছিলাম। সে বছরে কোন ফসলাদি জন্মেনি ফলে আমাদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। বাহন হিসাবে আমরা যে গাধাটা ব্যবহার করছিলাম তা ছিল সাদা রংয়ের এবং রোগা। আমাদের সাথে একটি উট ছিল। কিন্তু সে উট এক ফোটা

দুধ দিতেও সমর্থ ছিল না। ফলে আমার দুধের শিশুটি সব সময় কাঁদতো এবং আমরা তাঁর কান্নার শব্দে রাতে ঘুমাতে পারতাম না। আমার সন্তান পেটভরে দুধ পান করবে এমন পরিমাণ দুধ আমার বুকেও ছিল না। আমরা সে সময়ে একটু বৃষ্টি এবং সুখের আশা করছিলাম।

হযরত হালিমা বলেন, আমাদের পথ ছিল দীর্ঘ, ফলে আমাদের কাফেলা ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। অবশেষে আমরা শিশুর সন্ধানে মক্কায় এসে উপস্থিত হলাম। এ সময়ে আমাদের সবাইকে একে একে ঐ সন্তানটি গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো। তারপর যখনই আমরা জানতে পারলাম শিশুটির পিতা জীবিত নেই, তখন আমরা সবাই শিশুটিতে গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করলাম। কেননা, আমরা সবাই আশা করতাম শিশুর পিতা আমাদেরকে বড় অংকের অর্থদান করবে। কিন্তু শিশুটির পিতা নেই, ইয়াতিম। এই শিশুর দাদা আর মা আমাদেরকে তেমন কোন কিছুই দিতে পারবে না। ফলে শিশু প্রতিপালনের সমস্ত শ্রমই আমাদের বৃথা যাবে। এ সমস্ত দিক ভেবে আমরা অন্য শিশুর সন্ধান করছিলাম। ইতোমধ্যে সবাই ধনী ঘরের শিশু লাভ করলেও আমার ভাগ্যে কিছুই জুটলো না।

তিনি আরো বলেন, আমার সাথে যারা এসেছে তারা সবাই শিশু নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে যাত্রা করলো অথচ আমি কোন শিশুই পেলাম না। অবশেষে আমি আমার স্বামীকে বললাম, খোদার শপথ! আমার সাথিরা শিশু নিয়ে যাচ্ছে আর আমি তাদের সাথে রিক্ত হাতে ফিরে যাবো, এটা আমার কাছে লজ্জার কারণ বলেই মনে হচ্ছে। আমি ঐ ইয়াতিম শিশুটিকেই নিয়ে যাবো। আমার স্বামী আমার কথা শুনে আমাকে পরামর্শ দিয়ে বললো, শুন্য হাতে না ফিরে ঐ শিশুটিকেই নিয়ে যাও। এমনও তো হতে পারে যে, ঐ শিশুর মধ্যেই খোদা আমাদের জন্য উত্তম কোন কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দুধমাতা বলেন, তারপর আমি ঐ শিশুর মা ও দাদার কাছে গেলাম এবং শিশুটিকে নেয়ার কথা জানালাম। তারা আমাকে দিয়ে দিল এবং আমি শিশুটিকে আমার কোলে উঠাতেই আমার বুকে দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সে দুধ শিশুটি পেটভরে পান করলো এবং আমার নিজের সন্তানও পেটভরে পান করে ঘুমিয়ে পড়লো। অথচ অন্য দিন আমার সন্তান পেটভরে দুধ পেত না বলে সব সময় কাঁদতো। বিষয়টা আমাকে বেশ অবাক করলো। তারপর

আমার স্বামী আমাদের উটের কাছে যেয়ে দেখলো, আমাদের সেই উটেরও হঠাৎ করে প্রচুর দুধ এসেছে। তিনি দুধ দোয়ালেন এবং আমরা দু'জনে তা তৃপ্তি মিটিয়ে পান করলাম। তারপরেও উটের দুধ পরিপূর্ণ থাকলো। আমার স্বামী অত্যন্ত খুশী হয়ে আমাকে বললো, তুমি এমন এক মহাকল্যাণময় শিশু এনেছো, যে শিশুর কোন তুলনা হতে পারেনা। আমিও স্বামীর কথায় সম্মতি জানালাম।

হযরত হালিমা বলেন, তারপর আমরা আমাদের সেই রোগা দুর্বল গাধার পিঠে উঠে নিজের এলাকার দিকে যাত্রা করলাম। আমরা অবাক হয়ে গেলাম, আমাদের সেই দুর্বল রোগা গাধা আমার সাথিদের শক্তিশালী গাধাদের পরাজিত করে অত্যন্ত দ্রুত বেগে সবার আগে এগিয়ে চললো। আমার সাথিরা অবাক হয়ে আমাকে ডেকে বললো, আমাদের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। তুমি যে গাধার পিঠে চড়ে এসেছিলে, এই গাধা কি সেই গাধা? আমি তাদেরকে জানালাম, এটাই সেই গাধা। তারা অবাক কণ্ঠে মন্তব্য করলো, শপথ খোদার ! গাধার গতিতে এত পরিবর্তন!

তিনি বলেন, এভাবে আমরা সবার পূর্বে আমদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। সে সময়ে আমাদের ঐ এলাকার মত রৌদ্র তাপে ঝলসানো এলাকা এই পৃথিবীতে আর একটি ছিল কিনা আমরা জানিনা। আমরা শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে আসার পর থেকে আমাদের পশুপাল প্রতিদিন পেটভরে খেয়ে আসতো। আমরা সেই পশুপাল থেকে প্রচুর দুধ পেতাম। অথচ অন্যের পশুপাল খেতেও পেত না দুধও দিতে পারতো না। আমাদের পশুপাল পেটভরে খেতে পায় এ কারণে অনেকে আমাদের পশুর সাথে তাদের পশুও চরতে দিত, যেন তাদের পশু আমাদের পশুর সাথে পেটভরে খেতে পারে। কিন্তু তবুও তাদের পশুর পেট ভরতো না দুধও দিত না। এভাবে আমরা অল্প দিনেই অভাব মুক্ত হয়ে গেলাম। এই সচ্ছল অবস্থার ভেতর দিয়েই প্রায় দুই বছর পার হয়ে গেল। আমি শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দুধ ছাড়িয়ে দিলাম। সাধারণ শিশুর থেকে এই শিশুটি অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে উঠছিল। মাত্র দুই বছরের শিশু, অথচ তার শারীরীক গঠন এবং স্বভাব ছিল কয়েক বছরের বালকের মত।

হালিমা বলেন, আমরা তাঁকে আমাদের কাছেই রাখতে আগ্রহী ছিলাম বেশী। কারণ তাকে নিয়ে আসার পর থেকেই আমাদের উন্নতি হচ্ছিল। তবুও প্রথানুসারে তাকে আমরা তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। তাঁর মা'কে আমরা বললাম, শিশুটিকে

যদি আমাদের কাছে আরো কিছু দিন থাকতে দিতেন তাহলে আরো তাঁর স্বাস্থ্য ভালো হত। আমাদের মনে এই ভয় হয় যে, শিশুটি মক্কায় কোন ধরণের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আমাদের এ সমস্ত কথা ও আগ্রহ দেখে তাঁর মা শিশুটিকে পুনরায় আমাদের সাথেই দিয়ে দিলেন। আমরা আনন্দ চিত্তে তাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে ফিরে এলাম। সে সময়ে প্রকৃত অর্থেই মক্কায় মহামারী আকারে বসন্ত রোগ ছড়িয়ে ছিল।

শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত হালিমার ডান স্তনের দুধই শুধু পান করতেন। বামের দুধে কখনো মুখ দিতেন না। কেননা, মা হালিমার শিশু সন্তান আব্দুল্লাহর জন্য সে দুধ শিশুনবী রেখে দিতেন। তিনি শিশু সুলভ কান্নাকাটি করতেন না এবং কখনো কাপড়ে মল মুত্র ত্যাগ করতেন না। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি যথাস্থানে মল মূত্র ত্যাগ করতেন। তিনি কখনো উলঙ্গ হয়ে পড়তেন না। উলঙ্গ হয়ে পড়ার উপক্রম হলে অদৃশ্য জগৎ থেকে তাকে অচ্ছাদিত করে দেয়া হত। পৃথিবীতে আগমন করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর গর্ভধারিনী মায়ের দুধ দুই অথবা তিন দিন পান করেছিলেন।

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবু লাহাবের ক্রীতদাসী সুয়ায়বিয়ার দুধ পান করেন। আল্লাহর রাসূল যখন যুবক তখন তিনি তাঁর এই দুধ মা'কেও অত্যন্ত সম্মান করতেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঐ মহিলাকে আবু লাহাবের কাছে থেকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু আবু লাহাব তাঁর দাসী সুয়ায়বিয়াকে বিক্রি করতে রাজী হয়নি। পরে সে নিজেই ঐ মহিলাকে মুক্ত করে দিয়েছিল।

মক্কা থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করেছিলেন, তখনও তিনি তাঁর এই দুধ মা সুয়ায়বিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় ও অর্থ প্রেরণ করতেন। আবু লাহাবের মুক্ত করা দাসী সুয়ায়বিয়ার দুধ তিনি কয়েক দিন পান করেছিলেন বলে সে জীবিত থাকা পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর খেদমত করেছেন তেমনি হযরত হালিমার খিদমতও তিনি করেছেন। হযরত খাদিজার সাথে তাঁর বিয়ের পরে হযরত হালিমা নবীর কাছে এসেছিলেন। তাকে দেখেই আল্লাহর রাসূল নিজের পবিত্র শরীরের চাদর বিছিয়ে বসতে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আসুন আমার আম্মা আসুন!

হযরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আল্লাহর নবীকে জানালেন, আমাদের অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছে এবং সে কারণে আমাদের পশু সম্পদ সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। দুধ মায়ের মুখে অভাবের কথা শোনার সাথে সাথে তিনি তাকে ৪০ টি ছাগল এবং একটা উট বোঝাই করে নানা ধরণের সামগ্রী দিয়ে দিলেন।

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত হালিমার বোন অর্থাৎ নবীর খালা এসে নবীর কাছে তাঁর দুধমাতার ইন্তেকালের সংবাদ দিয়েছিলেন। এ বেদনাদায়ক সংবাদ শোনার পরে বিশ্বনবীর দু'চোখ দিয়ে ঝর্ণাধারার মত পানি প্রবাহিত হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর এই খালাকে কিছু কাপড় এবং দুইশত দিরহাম ও গদিসহ একটা উটদান করেছিলেন। হাফেজ মোগলতাঈ, মুনজেরী, হাফিজ ইবনে হাজার আস্ কালানী, ইবনে খুজাইমা, ইবনে জাওযী প্রমুখ মনীষীগণ উল্লেখ করেছেন, হালিমা ইসলাম গ্রহণ করার পরে ইন্তেকাল করেছিলেন। বনী সাআদ ছিল হাওয়াজেন গোত্রের একটা শাখা। সে সময়ে হাওয়াজেন গোত্রের খ্যাতি ছিল যে, তারা স্পষ্ট উচ্চারণে আরবী ভাষা বিশুদ্ধভাবে বলে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম বিশুদ্ধ ভাষী। কারণ আমি কুরাঈশ বংশের লোক এবং আমার ভাষা হচ্ছে হাওয়াজেন গোত্রের ভাষা।

শিশু মা বলে আর কাকে ডাকবে

আল্লাহর নবীর মা আমেনা শিশু নবীকে সাথে করে মদীনা গেলেন। তাদের সাথে হযরত উম্মে আয়মানও ছিলেন। সে সময়ে তিনি তাঁর সন্তানকে হযরত আব্দুল্লাহর ইন্তেকালের স্থান এবং তাঁর কবর দেখিয়েছিলেন। মদীনায় অবস্থান কালের অনেক ঘটনা পরবর্তীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে হিজরতের সময় বলেছিলেন। মায়ের সাথে মদীনায় অবস্থানের সময়ে বিশ্বনবী হযরত উম্মে আয়মানের সাথে ঘুরতেন। তিনি বনী নাজ্জারদের বিশাল সরোবরে সাঁতার শিখেছিলেম। তাঁর মা যখন তাঁর আব্বার কবরের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন, সে সময়ে শিশুনবী তাঁর মা'কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, আম্মু তুমি কেঁদোনা। আখিরাতে নিশ্চয়ই আব্বার সাথে তোমার দেখা হবে।

মক্কা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে অর্ধেক পথ এসে বিশ্বনবীর মাতা হযরত আমেনা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর অসুস্থতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হলো।

আরোগ্যের কোন লক্ষণ ছিল না। তারপর বিশ্বনবীর মমতাময়ী মা পিতৃহীন সন্তানকে মাতৃহীন করে মৃত্যু যবনিকার আড়ালে চলে গেলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনা যেখানে ঘটেছিল, সে স্থানের নাম ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, আবওয়া। এই আবওয়া পল্লীতেই শিশুনবী মা'কে চিরকালের জন্য হারালেন। এলাকার মানুষের সহযোগিতায় হযরত উম্মে আয়মান বিশ্বনবীর মা'কে কাফন-দাফন করেছিলেন।

আজ এই এক বিংশ শতাব্দীর উষা লগ্নে ঐ ঘটনার প্রায় দেড় হাজার বছর পরে আমরা আমাদের এই বাইরের চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্য বন্ধ করে মনের চোখ দিয়ে একটু যদি ঐ হৃদয় বিদারক দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে কি দৃশ্য দেখতে পাবো! এমন একজন শিশু বালক, যিনি পৃথিবীতে আসার পূর্বেই পিতাকে হারিয়েছেন। তাঁর আব্বা ডাকের সাড়া দেবে এমন কেউ আর এই পৃথিবীতে নেই। গোটা পৃথিবী ব্যাপী আব্বা আব্বা বলে চিৎকার করলেও স্নেহদাতা আব্বা সন্তানের করুণ ডাকে সাড়া দেবেন না। সেই অসহায় ইয়াতিম বালক তাঁর অসুস্থ মায়ের পাশে অশ্রু সজল চোখে মায়ের রোগাক্রান্ত মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছেন। অসহায়ভাবে দেখছেন, তাঁর জীবনের শেষ আশ্রয় কিভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

গোটা পৃথিবীতে শান্তির একমাত্র স্থানটুকু নিষ্ঠুর মৃত্যু কিভাবে একটু একটু করে নিঃশেষে গ্রাস করে নিচ্ছে। নির্মম মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণকারী মমতাময়ী মা করুণ চোখে তাঁর অসহায় সন্তানের দিকে তাকিয়ে আছেন। অসহায় সন্তানকে ছেড়ে যাচ্ছেন–তাকে যেতে হচ্ছে। কোন উপায় নেই, যেতে তাকে হবেই। কিন্তু সন্তানের কথা ভেবে তাঁর বুকের মাঝে যে যন্ত্রণার বরফ জমাট বেঁধেছিল, তা গলে তরল হবার পূর্বেই মৃত্যুর হীম শিতল থাবা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

বোবা যন্ত্রণা শিশুর বুকে মাথা কুটে ফিরছে, তাঁরই চোখের সামনে মমতাময়ী মা–তাঁর জীবনের একমাত্র সম্বল কঠিন মাটির নিচে চাপা পড়লো। দৃষ্টির সামনে থেকে চিরকালের জন্য গর্ভধারিণী মা হারিয়ে গেল। মা আর কোনদিন তাকে গভীর মমতায় বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে আদর করবে না। মধুর কণ্ঠে আব্বু বলে তাকে কাছে ডেকে তাঁর শিশু মুখে আর কোনদিন চুমোয় ভরিয়ে দেবে না।

নেই–কোথাও কেউ নেই এই নির্মম মরু প্রান্তরে শিশুকে সান্ত্বনা দেবার। একমাত্র সাথি আয়মান ছাড়া আর কেউ নেই। শিশুনবীকে উটের পিঠে উঠিয়ে উম্মে আয়মান মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বারবার পেছন ফিরে তাকান মায়ের কবরের দিকে। যে কবরে অন্তিম শয়নে শায়িতা বিশ্বনবীর মা জননী আমেনা। আল্লাহর নবীর চোখ দিয়ে মর্মযন্ত্রণার অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। উম্মে আয়মান আর সহ্য করতে পারলেন না। শিশুকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বললেন, আজ থেকে আমিই তোমার মা। সত্যই, উম্মে আয়মান প্রাণভরে শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আদর করতেন।

এ কারণে পরিণত বয়সে আল্লাহর নবী তাকে বলতেন, আপনি আমার গর্ভধারিণী মায়ের মতই। তাকে পরম শ্রদ্ধা করতেন তিনি। মদীনায় আল্লাহর নবীকে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মা খেজুরের যে বাগানদান করেছিলেন সে বাগান তিনি হযরত উম্মে আয়মানকে দিয়েছিলেন। তারপরও তিনি তাকে প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য করতেন। আব্বা নেই, কোনদিন তিনি তাকে চোখের দেখাও দেখেননি। মা ছিলেন, আজ তিনিও নেই। দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান সমস্ত পৃথিবীটাই শিশুর কাছে আজ অন্ধকার হয়ে গেছে। নির্জন মরু প্রান্তরে মা'কে কবর দিয়ে এক বুক হাহাকার আর শুন্যতা নিয়েই শিশুনবী মক্কায় ফিরে এলেন।

যে মুহূর্তে শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একা ফিরে এসেছিলেন, সে মুহূর্তে আব্দুল মুত্তালিবের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা আল্লাহ তা'য়ালাই জানেন। তিনি পরম আদরে তাঁর ইয়াতিম নাতিকে কোলে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। আদরের আব্দুল্লাহ নেই, ছিল আব্দুল্লাহর স্ত্রী আমেনা। আজ সে-ও নেই। রইলো শুধু তাদের স্মৃতি এই শিশু। দাদা তাকে চোখের আড়াল করতেন না। নাতির ভেতরে দাদা এমন কিছু দেখেছিলেন, যে কারণে তিনি তাঁর নাতিকেই পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

সে এক অসাধারণ সন্তান

গোত্রপতি আব্দুল মুত্তালিবের জন্য কা'বাঘরের ছায়ায় একটা কম্বলের আসন ছিল। সে আসনে বসার অধিকার ছিল একমাত্র আব্দুল মুত্তালিবের। স্বয়ং আব্দুল মুত্তালিবের কোন সন্তানও সে আসনে বসতেন না। আব্দুল মুত্তালিব সে আসনে বসে তাঁর কাছে আগত অতিথিদের সাথে কথা বলতেন। একদিন সে আসন

বিছানো ছিল। আসনের চারদিকে আগত অতিথি বসে আব্দুল মুত্তালিবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় শিশুনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এসে সে আসনের ওপরে বসে পড়লেন। আগত অতিথিবৃন্দ চমকে উঠলেন। দ্রুত আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণ শিশুনবীকে উঠিয়ে দিতে গেল সে আসন থেকে।

আব্দুল মুত্তালিব কা'বার দিকেই আসছিলেন। বিষয়টা তাঁর চোখে পড়তেই সে ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, তাঁকে উঠানোর প্রয়োজন নেই, তাঁকে বাধা দিও না। খোদার শপথ! সে এক অসাধারণ সন্তান। তাঁর মর্যাদাই ভিন্ন ধরণের। আমি আশা করি, সে এমন সম্মান ও মর্যাদাবান হবে, যা ইতোপূর্বে কোন আরব হয়নি। আমার বাছার মেজাজ বড় রাজকীয়, তাকে থাকতে দাও।

তারপর তিনি বসে শিশুনবীকে কাছে টেনে নিতেন। নবীর মাথায় পিঠে হাত দিয়ে আদর করতেন। প্রিয় নাতির মুখে চুমো দিতেন। শিশু নবীর হাঁটা উঠা বসা তাকানো, কথা বলা তথা সমস্ত কিছুই ছিল ভিন্ন ধরণের। শিশুনবীর যে কোন আচরণই আব্দুল মুত্তালিবকে মুগ্ধ করতো। তিনি তাঁর নাতির দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। আব্দুল মুত্তালিব অন্য কারো সাথে আলাপ আলোচনা করার সময় শিশুনবীর প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ থাকতেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামটা যেন তাঁর মুখে লেগেই থাকতো। মা ও বাপের অভাব তিনি তাঁর নাতিকে বুঝতে দিতেন না।

কিন্তু বিধাতার নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস! শিশুনবীর ভাগ্যে দাদার এই আদর স্নেহও বেশী দিন সহ্য হলো না। প্রচন্ড ঝড় শুরু হলে মহাসাগরের উর্মিমালা যেমন একটার পরে আরেকটা এসে আছড়ে পড়ে, তেমনি বিশ্বনবীর জীবনে মর্মান্তিক যন্ত্রণার তরঙ্গ একটার পরে আরেকটা আছড়ে পড়ছিল। হঠাৎ দাদা মুত্তালিব গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর এক সময় সবশেষ হয়ে গেল। পরম স্নেহদাতা দাদা পরপারে যাত্রা করলেন। বিশ্বনবীর বুকের ভেতরটা আরেকবার শুন্য হয়ে গেল। সে সময়ে বিশ্বনবীর বয়সও ছিল মাত্র আট বছর। পিতাকে তিনি চোখেও দেখলেন না। তারপর মমতাময়ী মা তাকে একা ফেলে চলে গেলেন। মা'কে হারানোর যন্ত্রণার যে ক্ষত বিশ্বনবীর বুকের ভেতরে সৃষ্টি হয়েছিল, সে ক্ষত থেকে তখন পর্যন্ত রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হয়নি। এই চরম অবস্থার ভেতরে তাঁর বুকে আরেকটা ক্ষত সৃষ্টি হলো। প্রিয় দাদাও তাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

হযরত উম্মে আয়মান বলেছেন, যে সময়ে দাদা মুত্তালিব এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান সে সময় শিশুনবী দাদার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর তাঁর চোখ থেকে অঝোর ধারায় পানি ঝরছিল। তাঁর জানাজার সাথে শিশুনবী কাঁন্নাভেজা চোখে গিয়েছিলেন। পরিণত বয়সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকালের ঘটনা কি আপনার স্মরণে আছে? তিনি বলেছিলেন, মনে আছে। সে সময়ে আমার বয়স হয়েছিল আট বছর।

প্রথম সাড়া তিনিই দিলেন

পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে পদ্ধতিতে এবং কৌশলে দাওয়াতের কাজ করতে আদেশ করলেন তিনি সেভাবেই ইসলামী আন্দোলনের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন। আমাদেরকে স্মরণে রাখতে হবে, ইসলাম একটি আদর্শের নাম। এই আদর্শ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিশ্বনবী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। সুতরাং তিনিই হলেন ইসলামী জাগরণের বিশ্বনেতা। ইসলামী আদর্শে যারাই বিশ্বাস স্থাপন করবেন বা ঈমান আনবেন তাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব কি তা মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে শিক্ষা দিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কারো ওপরে কোন শক্তি প্রয়োগ করা যাবেনা। কেননা, কোনটা সত্য এবং কোনটা মিথ্যা তা স্পষ্টরূপে পার্থক্য করে দেয়া হয়েছে। এখন যার যেটা খুশি তা সে গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ-قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ-فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى-لَا انْفِصَامَ لَهَا-

দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই, প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল কথা সুস্পষ্ট এবং ভুল চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গিয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, সে এমন এক শক্তিশালী অবলম্বন ধরেছে, যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয়। (সূরা বাকারা-২৫৬)

সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করবে, তাকে সর্বপ্রথম পৃথিবীর সমস্ত শক্তিকে অস্বীকার করতে হবে, তারপরে তাকে এক আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে।

উল্লেখিত আয়াতে তাগুত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় তাগুত তাকেই বলে, যে শক্তি আল্লাহর আইন পালন নিজেই শুধু অমান্য করে না, অন্যকেও অমান্য করতে বাধ্য করে।

অতএব ঈমান আনতে হলে সর্বপ্রথম নিজেকে তাগুত মুক্ত করতে হবে। আর তাগুত মুক্ত জীবনের প্রতীক হলো সে মানুষ একমাত্র আল্লাহরই আইন পালন করে, অন্য কোন শক্তির আইন পালন করে না তথা অন্য কোন শক্তির দাসত্ব করে না। একজন মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করে, তার প্রমাণ হলো সে আল্লাহকে সিজদা দেয়, নামাজ আদায় করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যাত লাভের পরে তাঁর ওপরে প্রথম দায়িত্ব দেয়া হলো নামাজ আদায়ের। একমাত্র আল্লাহ তথা তাওহীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করার পরে যে দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহ অবশ্য করণীয় করেছেন, তাহলো নামাজ আদায়। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেছেন, সর্বাগ্রে আল্লাহর রাসূলের ওপর যে কাজ ফরজ করা হয় তাহলো নামাজ আদায় করা। সে নামাজ প্রথমে ছিল দুই রাকাত করে।

হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তাঁকে অজুর পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। তিনি মক্কার মালভূমি এলাকায় অবস্থান করছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তাঁর কাছে সুন্দর মানুষের আকৃতিতে এলেন। তাঁর শরীর থেকে অদ্ভুত সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন আপনি মানুষ এবং জ্বিনের জন্য রাসূল নির্বাচিত হয়েছেন। এ কারণে আপনি তাদেরকে পবিত্র কালিমার দিকে আহ্বান করুন। এরপর তিনি তাঁর পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করলেন। সে স্থান থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। সে পানি দিয়ে হযরত জিবরাঈল অজু করলেন যেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অজুর পদ্ধতি শিখে নিতে পারেন।

হযরত জিবরাঈল অজু করে আল্লাহর রাসূলকে বললেন, এবার আপনি অজু করুন। তিনি অজু করার পরে আল্লাহর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম নবীকে সাথে করে চার সিজদায় দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। এভাবে মহান আল্লাহ তাঁর

নবীকে নামাজ আদায় করা তথা আল্লাহকে সিজদা দেয়া, নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসেবে গড়ে তোলার পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। এরপরে আল্লাহর নবী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে অজুর নিয়ম শিক্ষা দিলেন এবং তাঁকে সাথে করে সেইভাবে নামাজ আদায় করলেন, যেভাবে তাঁকে সাথে করে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম নামাজ আদায় করেছিলেন। নামাজই হলো একমাত্র মাধ্যম যা একজন মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে আল্লাহর গোলাম। সে একমাত্র মহান আল্লাহরই দাসত্ব করে, অন্য কোন শক্তির সামনে সে মাথানত করে না। নামাজ মানুষের ভেতরে প্রবল আত্মশক্তি সৃষ্টি করে দেয়। মহান আল্লাহর সাহায্য লাভের যোগ্যতা মানুষের ভেতরে সৃষ্টি করে দেয়। এ কারণে ঈমান আনার পরে একজন মানুষের ওপরে সর্বপ্রথম ফরজ করে দেয়া হয়েছে, নামাজ আদায় করা। কেননা, যে মানুষ ঈমান এনেছে, তাকে এবার ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য ময়দানে দৃঢ়পদ থাকতে হবে।

সে ময়দান কুসুমাস্তীর্ণ নয়—কন্টকাকীর্ণ, উত্তপ্ত। এ ময়দানে টিকে থাকতে হলে, দৃঢ়পদ থাকতে হলে তাঁর আত্মশক্তি এবং মহান আল্লাহর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আর এ দুটো জিনিষের যোগ্যতা নামাজ সৃষ্টি করে দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপরে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হলো, সে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তাঁর ভেতরে সৃষ্টি করা হলো। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে সাথে নিয়ে তিনি গোপনে নামাজ আদায় করতে থাকেন। সেই সাথে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

আল্লাহর রাসূলের আহ্বানে সর্বপ্রথাম সাড়া দেন তাঁরই প্রাণপ্রিয় স্ত্রী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। যে মহিয়সী নারীর গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করা যাবেনা। হযরত খাদিজার পরে আরো তিনজন নবীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেন। সে তিন মহান ব্যক্তির নাম হলো হযরত আবু বকর, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন।

আপনারা এ কি করছেন?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদিজাকে সাথে করে গোপনে নামাজ আদায় করতেন তখন হযরত আলী তাদেরকে নামাজ আদায় করতে দেখেন। শিশু আলী অবাক বিস্ময়ে ইতোপূর্বে কোনদিন না দেখা দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থেকে আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনারা এ কি করছেন?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, আমরা যা করছি এটাই হলো মহান আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ আমাকে এই জীবন ব্যবস্থাসহ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমি তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি, তুমি এক আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর দ্বীন কবুল করে তাঁরই দাসত্ব করো এবং সমস্ত মূর্তি পরিত্যাগ করো। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আর কোন প্রশ্ন না করেই বিশ্বনবীর আহ্বান কবুল করে তাঁর কার্যক্রমের সাথী হয়ে যান। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে তিনি গোপনে নামাজ আদায় করতেন। যে সময়ে প্রকাশ্য আহ্বান করার আদেশ এলো তখন আল্লাহর রাসূল মুত্তালিব পরিবারের সবাইকে দাওয়াত দিলেন।

তাঁরা একত্রিত হলে আহারাদির পরে আল্লাহর রাসূল তাদেরকে আহ্বান জানালেন, আমি এমন এক আদর্শসহ প্রেরিত হয়েছি, যা এই পৃথিবী এবং আখিরাতের জন্য কল্যাণময়। আপনাদের মধ্য কে এই আদর্শ গ্রহণ করে আমার সাথী হবেন? আল্লাহর নবীর কথা শুনে উপস্থিত সবাই নীরব থাকলেও শিশু আলী নীরব থাকেননি। তিনি সর্বাগ্রে উঠে দাঁড়িয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি এখানে সবার থেকে বয়সে ছোট। আমার শরীর দুর্বল তারপরে আমি চোখের রোগে আক্রান্ত। তবুও আমি ঘোষনা করছি যে, আপনার আনিত আদর্শ গ্রহণ করে আমি আপনার সাথী হয়ে গেলাম।

হযরত আফীফ কিন্দী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বের একটা ঘটনা বর্ণনা করেন। তাঁর মামার বন্ধু ছিলেন নবীজীর চাচা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি ইয়েমেন থেকে সুগন্ধি ক্রয় করে হজ্জের মৌসুমে মক্কায় বিক্রি করতেন। তিনি বলেন, একবার হজ্জের মৌসুমে হযরত আব্বাসের সাথে মিনায় তাঁর দেখা হলো। তিনি দেখলেন একজন সম্মানিত ব্যক্তি সেখানে এলেন এবং উত্তম পদ্ধতিতে অজু করে নামাজ আদায় করার জন্য

দন্ডায়মান হলেন। তারপর একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক সেখানে এলো এবং পূর্বের ন্যায় সেও অজু করে নামাজ আদায়ে দাঁড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে একজন মহিলা সেখানে এলেন এবং তিনিও অজু করে নামাজে দন্ডায়মান হলেন। তিনি অবাক দৃষ্টিতে সে দৃশ্য দেখে হযরত আব্বাসকে প্রশ্ন করেছিলেন, হে আব্বাস! এরা এসব কি করছে? এরা কোন ধর্ম পালন করছে?

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রশ্নকর্তা আফীফ কিন্দীকে জানালেন, ঐটা আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, তাঁর দাবী হলো আল্লাহ তাঁকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। একদিন নাকি রোম ও পারস্যের সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর অধীনে আসবে। নাবালেগ যাকে দেখছো, সেও আমার ভাই আবু তালিবের সন্তান। আর ঐ মহিলা হলো আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী খাদিজা।

ইতিহাসের ধারাপরিক্রমায় আফিফ কিন্দী যখন ইসলাম কবুল করেন তখন তিনি আফসোস করে সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে বলতেন, আফসোস! সেদিন যদি আমি তাদের সাথে শামিল হয়ে চতুর্থ ব্যক্তি হতাম। মক্কার সেই দিনগুলোয় নামাজের সময় হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন নির্জন পাহাড়ের গুহায় চলে যেতেন। একদিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে তাঁর পিতা আবু তালিব নামাজ আদায় করতে দেখে অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন– বাবা, এ আবার কোন্ ধরণের ধর্ম পালন করছো? হযরত আলী তাঁর পিতাকে নিঃসংকোচে জবাব দিলেন– আব্বা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করছি।

আবু তালিব তাঁর সন্তানকে বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কল্যাণের দিক ব্যতীত অন্য দিকে আহ্বান জানাবে না। তুমি তাঁর অনুসরণ করতে থাকো। তোমার চাচাত ভাইয়ের সাথে থাকো এবং তাকে সহযোগিতা করো।

তিনি কোনো প্রশ্নই করেননি

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নাম ছিল আব্দুল্লাহ। তাঁর উপাধি ছিল আতিক এবং সিদ্দীক। তাকে ডাকা হত আবু বকর বলে। তাঁর পিতার নাম ছিল উসমান এবং তাকে ডাকা হত আবু কুহাফা বলে। তাঁর গর্ভধারিণী মাতার

নাম ছিল সালমা এবং তাকে বলা হত উম্মুল খায়ের। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামে জন্মগ্রহণের দুই বছর বা কিছু বেশী দিন পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নবীজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি। মহান আল্লাহর কি মহিমা, তাঁরা দু'জনে বয়সের যে ব্যবধানে পৃথিবীতে এসেছিলেন ঐ একই সময়ের ব্যবধানে ইন্তেকাল করেন।

তিনি দেখতে ছিলেন অপূর্ব সুন্দর। মদের সরোবরে বাস করেও তিনি কখনো মদ স্পর্শ করেননি। তাঁর সুন্দর চরিত্র, স্বভাব, জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার কারণে কুরাইশদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতা, বিশুদ্ধ আরবী ভাষা ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হবার কারণে মক্কায় তিনি ছিলেন সবার সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।

মক্কাবাসীদের রক্তের ক্ষতিপূরণের অর্থ তাঁর কাছে জমা থাকতো। আরববাসীর বংশ সংক্রান্ত জ্ঞানে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। উঁচুমানের কাব্য প্রতিভা ছিল তাঁর। বাগ্মিতায় ও বক্তৃতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। চরিত্রবান এবং দানশীলতার কারণে গোটা আরবে তাঁর সুনাম ছিল। বন্ধু বৎসল এবং তাঁর অমায়িক মেলামেশার কারণে তাঁর বাড়িতে প্রতিদিন মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকজন বৈঠকে মিলিত হতেন। তাঁর ব্যবসায়িক দক্ষতা ও মধুর ব্যবহারের কারণে অনেকেই তাঁর সাথে আগ্রহভরে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আগ্রহী হত।

হযরত আবু বকরের পিতা একজন বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সামাজিক মর্যাদা ও ধন-ঐশ্বর্যের কারণে সমাজে তাঁর মতামত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করা হত। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ না করলেও তিনি ইসলামের বিরোধিতা করেছেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ হযরত আবু বকরের মা উম্মুল খায়ের ইসলামী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বনবীর ইন্তেকালের পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন খলীফাতুর রাসূল সে সময়ে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের সেই গোপন দিনগুলোয় হযরত আবু বকর একদিন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার ভাতিজা হাকিম ইবনে হিজামের বাড়িতে বসে ছিলেন। এমন সময় হাকিমের দাসী এসে হাকিমকে জানালো, আপনার পিতার বোন আজ বলছিলেন যে, তাঁর স্বামীকে মহান আল্লাহ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন–হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে যেভাবে নবী করে প্রেরণ করেছিলেন।

এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত আবু বকর সেখান থেকে উঠে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে যেয়ে জানতে চাইলেন হাকিমের দাসী যা বললো তা সত্য কিনা। আল্লাহর রাসূল জানালেন হাকিমের দাসী যা বলেছে তা অবশ্যই সত্য। সিদ্দীকে আকবর কোন প্রশ্ন করলেন না। প্রশ্নাতীতভাবে নবীজীর হাতে হাত দিয়ে তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পরবর্তীতে নবীজী তাঁর এই মহান বন্ধু সম্পর্কে প্রশংসা করে বলেছেন, আমি যাকেই ইসলামের দিকে আহ্বান করেছি, সে-ই কিছু না কিছু প্রশ্ন করেছে, চিন্তা-ভাবনা করেছে। পক্ষান্তরে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আবু বকর। তিনি কোন প্রশ্ন না করে, কোন চিন্তা-ভাবনা না করে, সামান্য ইতস্তত না করে সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

দাওয়াতী কাজ

যারা ইসলাম কবুল করতেন আল্লাহর রাসূল স্বয়ং তাদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করতেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ব্যক্তিগণও অন্যদেরকে বিশেষ করে তাদের পরিচিত মহলে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিশ্বনবীর শেখানো পদ্ধতিতে দাওয়াত দিতেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতেন। এ সময়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে নামাজ আদায়ের জন্য চলে যেতে হত নির্জন কোন পাহাড়ে বা জনহীন প্রান্তরে। তাঁদেরকে নামাজ আদায় করতে দেখলেই দর্শকের মনে একটা কৌতুহল জেগে উঠতো এবং সে তা সর্বত্র প্রচার করতো। ফলে বিশ্বনবীর কার্যক্রমের পথে অসময়ে বাধার সৃষ্টি হত। এত গোপনীয়তার পরেও একবার মাত্র গুটি কয়েক মুসলমানের সাথে সংঘর্ষ বাধার উপক্রম হয়েছিল। একদিন বেশ কয়েকজন মুসলমান এক পাহাড়ের নির্জন স্থানে নামাজ আদায় করছিলেন এ সময়ে মূর্তিপূজকরা তাদেরকে দেখে ফেলে। তারা নামাজের দৃশ্য দেখে হৈ চৈ শুরু করে দেয়। মুসলমানদের সাথে তর্কবিতর্কের এক পর্যায়ে আক্রমণ করলো।

হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সে সময়ে ১৭ বা ১৯ বছরের পূর্ণ যুবক। তিনি সহ্য করতে না পেরে পড়ে থাকা উটের একটি হাড় উঠিয়ে ইসলামের এক দুশমনকে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দিলেন। ইসলামের ইতিহাসে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম রক্তপাত ঘটিয়ে ছিলেন। হযরত সায়াদ গোত্রীয় সম্পর্কের কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মামা হতেন।

তাওহীদের আওয়াজ তাঁর কানে পৌঁছা মাত্র তিনি কাল বিলম্ব না করে বিশ্বনবীর মহান আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। হিজরতের প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। শোষিত নিপিড়ীত ও নির্যাতিত মানবতার মুক্তির দিশারী সরওয়ারে দোআলম বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যাত প্রাপ্তির সময়কালে হযরত সায়াদ ছিলেন সুন্দর বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ১৭ অথবা ১৯ বছরের তরুণ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত সায়াদকে অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব ও প্রকৃতি দান করেছিলেন। তিনি যখনই শুনলেন মহাসত্যের আলো হেরা পর্বত থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, দেরী করলেন না। উল্কার বেগে ছুটে গেলেন দরবারে নববীতে।

সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী উচ্ছল তরুণ সায়াদ, আবেগ উচ্ছ্বাসে ভরা যার হৃদয়। তিনি আল্লাহর নবীর হাতে হাত রাখলেন। প্রথম দিকে যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন তাদেরকে সাবিকুনাল আওয়ালিন বলা হয়। ইসলাম গ্রহণকারীদের ক্রমিক নং অনুসারে তিনি ছিলেন তৃতীয়। আবার কেউ বলেছেন তাঁর পূর্বে আরো ছয় বা সাতজন মহামানব ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করার সাত দিনের মধ্যে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দ্বীনি আন্দোলনের কর্মী হয়েছিলেন। সে সময় ইসলাম কবুল করার অর্থই ছিল গোটা পৃথিবীকে নিজের শত্রুতে পরিণত করা। সমস্ত ধরণের বিপদ-মুসিবতকে নিজের ওপরে চাপিয়ে নেয়া। উন্মুক্ত তীক্ষ্ণধার যুক্ত তরবারীর নীচে মাথা পেতে দেয়া। হযরত সায়াদ ছিলেন সেই সাহসী যুবক–যিনি কোন ধরণের বিরোধিতার পরোয়া না করে নিজের প্রাণের মমতা ত্যাগ করে মহাসত্য ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তুমি তীর চালাও

হযরত সায়াদ এর বড় ভাইয়ের নাম ছিল উতবা। সেছিল কাফির আর এই জাহান্নামের কীটই ওহূদের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা মোবারকে পাথর নিক্ষেপ করে নবীর চেহারা মোবারক রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। এ কারণে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আজীবন তাঁর কাফির ভাইয়ের ওপরে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি উৎবার রক্তের চেয়ে বেশী অন্য কারোর রক্ত পিপাসু ছিলাম না।

ওহূদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যখন বিপর্যয়ের মুখে নিপতিত হয়েছিল তখন হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবীজীকে বেষ্টন করেছিলেন। বোখারী শরীফে এসেছে, যুদ্ধের ময়দানে চরম নাজুক অবস্থায় আল্লাহর নবী নিজের তুনির থেকে তীর বের করে হযরত সায়াদের হাতে দিতেন আর বলতেন, হে সায়াদ! আমার মাতা-পিতা তোমার ওপরে কোরবান হোক, তুমি তীর চালাও!

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি সায়াদ ব্যতীত অন্য কারোর পক্ষে এমন ধরণের বাক্য রাসূলের পবিত্র মুখ দিয়ে আর শুনিনি। হযরত সায়াদই সেই সৌভাগ্যবান সাহাবা, যিনি ইসলামের জন্য শত্রু পক্ষের দিকে প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। স্বয়ং তিনি বলেছেন, আমিই প্রথম আরব যে আল্লাহর পথে তীর চালিয়েছি। বদরের যুদ্ধে তাঁর ছোট ভাই হযরত উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। হযরত সায়াদ বলেন, যুদ্ধ শুরুর পূর্বে আমি দেখলাম উমায়ের এদিক ওদিক লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে উমায়ের, তুমি এমন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছো কেন?

আমার ভাই আমাকে বললো, ভাইয়া, আমার বয়স কম। আমার ভয় হচ্ছে আল্লাহর রাসূল আমাকে দেখে ফেললে তিনি হয়ত আমাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিবেন। কিন্তু আমি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করে শাহাদাতবরণ করতে চাই। আল্লাহ আমার নছীবে শাহাদাত লিখে রাখতে পারেন। হযরত সায়াদ তাঁর এই ছোট ভাইকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। নবীজী সত্যই হযরত উমায়েরকে দেখে বয়স অল্প হবার কারণে তাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফেরৎ পাঠালেন। তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে নবীজী তাঁকে পুনরায় অনুমতি দিলেন। তাঁর মনের কামনা অনুযায়ি মহান আল্লাহ তাকে শাহাদাত নছিব করলেন। হযরত সায়াদের জন্য তাঁর ছোট ভাইয়ের শাহাদাত ছিল বড়ই কষ্টের। কিন্তু তিনি ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলে নীরব হয়ে ছিলেন।

এভাবেই তিনি আত্মহত্যা করবেন

হযরত সায়াদের পিতার নাম ওয়াক্কাস, আর মায়ের নাম হামনা। হামনা তার নিজের বাপ-দাদার আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, তার সন্তান সায়াদ আল্লাহর নবীর হাতে হাত রেখে ইসলামী কার্যক্রমে শামিল হয়ে পড়েছে তখন তিনি এমনভাবে ভেঙ্গে পড়লেন যে, কোন ধরণের খাদ্য গ্রহণ করা,

পানি পান করা, কারো সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। এমন কি তিনি আরবের সেই মরুপ্রান্তরে প্রচন্ড রোদে বসে থাকলেন । শর্ত দিলেন যতক্ষণ সায়াদ ইসলাম ত্যাগ না করবে ততক্ষণ তিনি এই রোদ থেকে ছায়ায় যাবেন না। কারো সাথে কথা বলবেন না। কোন খাদ্য বা পানিয় গ্রহণ করবেননা। সায়াদ ইসলাম ত্যাগ না করলে তিনি এভাবেই আত্মহত্যা করবেন।

হযরত সায়াদ তাঁর মা'কে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তিনি জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় নিপতিত হলেন। একদিকে মায়ের জীবন রক্ষা অন্যদিকে ঈমান রক্ষা। কিন্তু বাতিলের সাথে তিনি আপোষ করলেন না। তিনি তাঁর মা'কে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, মা! তুমি আমার কাছে সবথেকে বেশী প্রিয়! কিন্তু তোমার শরীরে যদি এক হাজারটা প্রাণ থাকতো আর আমার সামনে তোমার প্রতিটি প্রাণ এক এক করে বের হয়ে যায় তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না।

তাঁর মা তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য বলতে থাকে আর তিনি সেই একই জবাব দিতে থাকেন। অবশেষে তাঁর মায়ের মিথ্যার প্রদীপ সত্যের মশালের সামনে নির্বাপিত হতে বাধ্য হলো। মহাপরীক্ষায় হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এমনভাবে উত্তীর্ণ হলেন যে, স্বয়ং আরশে আজিমের অধিপতি খুশী হয়ে সূরা লোকমানের আয়াত নাজিল করে মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিলেন–

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ–فَلاَ تُطِعْهُمَا–

কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কোন (মাবুদকে) শরীক বানানোর জন্য–যাকে তুমি (আমার শরীক বলে) জনো না–তোমার ওপর চাপ দেয়, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। (সূরা লোকমান-১৫)

তাঁর কথা যাদুর থেকে অধিক কার্যকরী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর এত নির্যাতন তবুও তাঁকে এ পথ থেকে বিরত করা গেল না, এ সম্পর্কে কাফির নেতাদের মনে ধারণা হলো নিশ্চয়ই মুহাম্মদ একটা কিছু অর্জন করতে চায় এ কারণে সে এবং তাঁর অনুসারীরা এত নির্যাতন সহ্য করেও তাদের কার্যক্রমে বিরতি দিচ্ছে না এবং আদর্শ ত্যাগ করছে না। এই অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে কাফের নেতা ওতবা

ইবনে রাবিয়া আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে প্রশ্ন করলো, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! বলো তো, প্রকৃত পক্ষে তোমার মনের ইচ্ছাটা কি? যদি মক্কার নেতৃত্ব কামনা করো তাহলে তা গ্রহণ করতো পারো। যদি আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মেয়ে কামনা করো তাহলে ব্যবস্থা করে দেব। গোটা মক্কার ধন রত্ন চাও আমরা তোমার সামনে এনে দিচ্ছি। তবুও তুমি যা বলছো তা থেকে বিরত হও। বিশ্বমানবতার মহান মুক্তির দূত নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা না বলে পবিত্র কোরআনের আহ্বান কাফির নেতাকে শুনিয়ে দিলেন–

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ–وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ–اَلَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ–اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ–قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا–ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ–وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ–سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ–ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا– قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ–فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا–وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ–وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ–

হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে মহান আল্লাহ ওহী অবতীর্ণ করেছেন যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবে না। তোমরা তাকেই অবলম্বন করো এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা করো। মুশরিকদের জন্য ধ্বংস, যারা যাকাত দেয়না এবং আখিরাত অস্বীকার করে। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, নিশ্চিতভাবে তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না। হে নবী এদের বলে দিন, তোমরা কি সেই আল্লাহর সাথে কুফরী করছো এবং অন্যদেরকে তাঁর

সাথে শরীক করছো যিনি দুদিন পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তিনিই হলেন গোটা পৃথিবীর প্রতিপালক। তিনি (পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর) ওপর থেকে তার ওপর পাহাড় স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত দান করেছেন। আর তার মধ্যে সব প্রার্থীর জন্য প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে সঠিক পরিমাপে খাদ্য সরবরাহ করেছেন। এসব কাজ চার দিনে হয়েছে। তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেছেন যা সেই সময় কেবল ধুয়া ছিলো। তিনি আকাশ ও যমীনকে বললেন, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তোমরা অস্তিত্ব ধারণ করো। উভয়ে বললো, আমরা আনুগতদের মতই অস্তিত্ব গ্রহণ করলাম। তারপর তিনি দুদিনের মধ্যে সাত আকাশ বানালেন এবং প্রত্যেক আকাশে তিনি তাঁর বিধান অহী করলেন। আর পৃথিবীর আকাশকে আমি উজ্জ্বল প্রদীপ দিয়ে সজ্জিত করলাম এবং ভালোভাবে সুরক্ষিত করে দিলাম। এসবই এক মহা পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার পরিকল্পনা। (সূরা হামিম আস সিজদা-৬-১২)

বিশ্বনবীর মুখে পবিত্র কোরআন শুনে কাফির নেতা ওতবা থরথর করে সেদিন কেঁপে উঠেছিল। তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বের হয়নি। দ্রুত সে বিশ্বনবীর সামনে থেকে সরে পড়েছিল। পবিত্র কোরআন শুনে ওতবা ইবনে রাবিয়ার ভেতরের জগৎ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল। সে কুরাইশদের অন্যান্য নেতাদের বলেছিল, আমি নিজের কানে শুনে এসেছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা পড়েছে তা কোন কবির কবিতা নয়। সে যে কি পড়লো তা আমার বুঝে আসছে না। তোমাদের কাছে আমার পরামর্শ হলো, সে যা করছে তাতে তোমরা তাকে বাধা দিওনা। যদি সে তাঁর কাজে সফল হয়ে গোটা আরবের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বিজয়ী হয় তাহলে তোমাদেরই সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আর তা করতে না পারলে সে নিজেই একদিন শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু ওতবার পরামর্শ কোন নেতা গ্রহণ না করে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ইতোমধ্যে হজ্জের সময় উপস্থিত হলো। কুরাইশ নেতারা প্রবীণ ব্যক্তি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার কাছে এলো পরামর্শের জন্য। সে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্য করে বললো, হজ্জের সময় এসেছে। চারদিক থেকে লোকজন এখানে আসবে। তাঁদের কানে এর মধ্যেই মুহাম্মাদের কথা পৌছেছে। এখন তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে

একমত হও। তাঁর সম্পর্কে সবাইকে একই কথা বলতে হবে। আমাদের পরস্পরের কথা যেন মানুষের কাছে দু'ধরণের হয়ে না যায়। তাহলে মানুষ আমাদের কথা মিথ্যা মনে করবে। আমরা সবাই তাঁর সম্পর্কে একই কথা বলবো।

সমবেত লোকজন ওয়ালিদকে জানালো, কি কথা তাঁর সম্পর্কে বলতে হবে তা আপনিই আমাদেরকে বলে দিন। আপনার শেখানো কথাই আমরা সবার সামনে বলবো। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে কি কথা যে বলতে হবে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টাতেও ওয়ালিদের মাথায় এলো না। অবশেষে সে উপস্থিত নেতাদেরকে জানালো, তোমরাই পরামর্শ দাও তাঁর সম্পর্কে কি কথা বলা যায়? কয়েকজন বললো, আমরা মানুষদের কাছে তাঁর সম্পর্কে জানাবো সে একজন গনক। ওয়ালিদ এ কথায় একমত না হয়ে বললো, মানুষ বহু গনককে দেখেছে, গনকদের কথা থাকে ইশারা ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। তাঁর কোন একটি কথাও গনকের মত নয়। এবার কয়েকজন পরামর্শ দিল, তাকে পাগল হিসেবে পরিচিত করা হোক।

ওয়ালিদ প্রতিবাদ করে বললো, অসম্ভব! তাঁকে পাগল বললে কেউ তা বিশ্বাস করবে না, বরং আমাদেরকেই মানুষ পাগল বলবে। মানুষ বহু পাগল দেখেছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোন একটি কথাও পাগলের মত নয়। পাগলদের একটা কথার সাথে আরেকটি কথার কোন সামঞ্জস্য থাকে না, কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথা একটির সাথে আরেকটির অদ্ভূত সামঞ্জস্য রয়েছে। এবার কয়েকজন পরামর্শ দিল, তাকে কবি হিসেবে পরিচিত করা যায়। ওয়ালিদ পুনরায় অস্বীকার করে বললো- না, তাকে কবি বলা যায় না। এদিকের মানুষ কবিদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ। নানা ধরণের কবিতার সাথে তাঁরা পরিচিত। মুহাম্মাদের একটি কথাও কোন কবির মত নয়। এবার অনেকে পরামর্শ দিল, তাঁকে যাদুকর হিসেবে সবার কাছে পরিচিত করা হোক।

ওয়ালিদ বললো, মানুষ নানা ধরণের যাদুকরের সাথে পরিচিত, যাদুর সাথে পরিচিত। যাদুকররা যেমন সুতার গিরায় ফুঁক দেয়, ঝাড়ফুঁক করে, তাবিজ কবজ দেয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে ধরণের কোন কাজ করে না। এবার সবাই বললো, তাহলে আপনি যা বলতে চান তাই বলুন। ওয়ালিদ বললো, তাঁর কথার মধ্যে যে মাধুর্যতা আছে এ সম্পর্কে কারো মনে কোন দ্বিধা নেই। তাঁর

কথার ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় এবং তাঁর মর্মার্থ অতি গভীরে প্রথিত। তোমরা তাঁর সম্পর্কে মানুষকে যা বলবে মানুষ তার কোনটিই বিশ্বাস করবে না। আমার মতে তাঁর সম্পর্কে যাদুকর কথাটা বেশী উপযুক্ত। যদিও সে যাদুকর নয় কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে যাদুর থেকেও বেশী প্রভাব রয়েছে। তাঁর কথায় সংসারে বিভেদ সৃষ্টি হয়। স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী পৃথক হয়ে যায়, পিতার কাছ থেকে সন্তান পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং তাঁর কথা যাদুর থেকে অধিক কার্যকরী। তাঁর কথার কারণেই আজ আমাদের গোটা জাতির মধ্যে বিভেদের রেখা সৃষ্টি হয়েছে।

মক্কার কাফির নেতৃবৃন্দ এই কথাই সর্বত্র প্রচার করতে থাকে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন যাদুকর। এ ধরণের নানা প্রলাপ উক্তি তারা নবীজী সম্পর্কে করেছিল। সে যুগে যদি বর্তমান যুগের মত প্রচার মাধ্যম থাকতো, রেডিও, টেলিভিশন, ডিস এ্যান্টিনা, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদী থাকলে এ সমস্ত প্রচার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে মানুষ কত অর্থহীন, ভিত্তিহীন কথাই না শোনার দুর্ভাগ্য লাভ করতো। কার্টুনিষ্ট আল্লাহর রাসূলের কত বিকৃত ছবি এঁকে গোটা দেশ ছেয়ে দিত। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যখন ভিত্তিহীন প্রচার প্রপাগান্ডা চালানো হয় তখন ঐ ব্যক্তির নগদ লাভ যেটা হয় তাহলো, তাঁর সম্পর্কে যাদের সামান্যতম কৌতুহল ছিল না তাঁরাও কৌতুহলী হয়ে ওঠে। তাঁর সম্পর্কে যারা কিছুই জানতো না, তাঁরাও তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাঁর নাম প্রতিটি মানুষের কানে পৌছে যায়, ঘরে ঘরে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে। তাদের এই অপপ্রচারের কারণে ব্যক্তি পরিচিতি লাভ করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না। তাঁর নাম এতদিন যারা শোনেনি, এবার তারাও নাম শুনলো। সর্বত্র তাঁর সম্পর্কে গুঞ্জন সৃষ্টি হলো। যাদের হৃদয় মৃত তাঁরা হয়তঃ অর্থহীন মন্তব্য করলো। কিন্তু যাদের হৃদয় জীবিত, যুক্তিতে যারা বিশ্বাসী, সত্য উদ্ঘাটনে যারা আগ্রহী তাঁরা নীরবে প্রকৃত সত্য অবগত হবার লক্ষ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে এগিয়ে এলো। প্রকৃত সত্য অবগত হলো এবং যারা সৌভাগ্যবান ছিল তাঁরা মহাসত্য ইসলাম কবুল করে আল্লাহর বান্দায় পরিণত হলো। আর যারা ছিল হতভাগা তাঁরা প্রকৃত সত্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হলো। ইতিহাসে দেখা যায় প্রতিটি যুগেই নবীদের সাথে, ইসলামের বাহকদের সাথে একই আচরণ করা হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের অপপ্রচার করা হয়েছে। কোন একজন নবীও বিরোধী শক্তির অপপ্রচারের কবল থেকে মুক্ত ছিলেন না। বর্তমানেও যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছেন তাঁরাও মিথ্যা অপবাদ মুক্ত নন। তাঁদেরকেও বিভিন্ন ধরণের অপপ্রচারের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীর ওপরে দুশমনরা যে অপবাদ দিয়েছিল, সে সবের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন।

এ বাণী সফল হবেই

একদিন কিছু সংখ্যক কোরাঈশ নেতা মসজিদে হারামের মধ্যে আসর জমিয়ে বসেছিল এবং মসজিদের অন্য এক কোণে আল্লাহর নবী একাকী বসেছিলেন। এটা এমন এক সময়ের ঘটনা যখন হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঈমান এনেছিলেন এবং কোরাইশরা প্রতিনিয়ত মুসলমানদের সাংগঠনিক উন্নতি দেখে অস্থির হয়ে উঠছিলো। এই সময় উতবা ইবনে রাবী'আ (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর) কোরাইশ নেতাদের বললেন, ভাইসব, আপনারা যদি ভালো মনে করেন তাহলে আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ করতে এবং তাঁর কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করতে পারি। সে হয়তো তার কোনটি মেনে নিতে পারে এবং আমাদের কাছেও তা গ্রহণ যোগ্য হতে পারে। আর এভাবে সে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। উপস্থিত সবাই তার সাথে একমত হলো এবং উতবা উঠে নবীজীর কাছে গিয়ে বসলো।

আল্লাহর রাসূল তার দিকে ফিরে বসলেন। উতবা বললো– ভাতিজা! বংশ ও গোত্রের বিচারে তোমার জাতির মধ্যে তোমার যে মর্যাদা তা তুমি অবগত আছো। কিন্তু তুমি তোমার জাতিকে এক মুসিবতের মধ্যে নিক্ষেপ করেছো। তুমি জাতির ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছো। গোটা জাতিকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছো। জাতীয় আদর্শ, ধর্ম ও তাদের উপাস্যদের সমালোচনা করেছো এবং এমন কথা বলতে শুরু করেছো যার সারবস্তু হলো, আমাদের সকলের বাপ দাদারা পথভ্রষ্ট ছিল। এখন আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শোন আমি তোমার কাছে কিছু প্রস্তাব রাখছি, প্রস্তাবগুলো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো। হয়তো তার কোনটি তুমি গ্রহণ করতে পারো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আবুল ওয়ালিদ! আপনি বলুন আমি শুনবো। সে বললো– ভাতিজা! তুমি যে কাজ শুরু করেছো এর মাধ্যমে

সম্পদ অর্জন যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা সবাই তোমাকে এতো সম্পদ দেব যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে সম্পদশালী হয়ে যাবে। এভাবে তুমি যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে থাকো তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নিচ্ছি, তোমাকে ছাড়া কোন বিষয়ে ফায়সালা করবো না। যদি তুমি বাদশাহী চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নিচ্ছি। আর যদি তোমার ওপর কোন জিন প্রভাব বিস্তার করে থাকে যাকে তুমি নিজে তাড়াতে সক্ষম নও তাহলে আমরা বিখ্যাত চিকিৎসক ডেকে নিজের খরচে তোমার চিকিৎসা করিয়ে দেই। উতবা এসব কথা বলছিলো আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরবে শুনছিলেন।

এরপর তিনি বললেন– আবুল ওয়ালীদ! আপনি কি আপনার সব কথা বলেছেন? সে বললো– হ্যাঁ। আল্লাহর রাসূল বললেন, তাহলে এখন আমার কথা শুনুন। এরপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে সূরা হা-মীম আস্ সিজ্দাহ্ তিলাওয়াত শুরু করলেন। উতবা তার দুই হাত পেছনের দিকে মাটিতে হেলান দিয়ে বসে গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে থাকলো। সেজদার আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তিনি সিজদা করলেন এবং মাথা তুলে বললেন, হে আবুল ওয়ালীদ, আমার জবাবও আপনি পেয়ে গেলেন। এখন যা ইচ্ছা করেন।

উতবা উঠে কুরাইশ নেতাদের আসরের দিকে অগ্রসর হলে লোকজন দূর থেকে তাকে দেখেই বললো. আল্লাহর শপথ! উতবার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল এটা সেই চেহারা নয়। সে এসে বসলে লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, কি শুনে এলে? সে বললো, আল্লাহর কসম! আমি এমন কথা শুনেছি যা এর আগে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম! এটা না কবিতা, না যাদু, না গণনা বিদ্যা। হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, আমার কথা শোন এবং তাকে তার কাজ করতে দাও। আমার বিশ্বাস, এ বাণী সফল হবেই। মনে করো আরবের লোকেরা যদি তার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে তাহলে নিজের ভাইয়ের গায়ে হাত তোলা থেকে তোমরা রক্ষা পেয়ে যাবে এবং অন্যরাই তাকে পরাভূত করবে। পক্ষান্তরে সে যদি আরবদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব এবং তার সম্মান ও মর্যাদা তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা হবে।

তার এই কথা শোনা মাত্র কোরাইশ নেতারা বলে উঠলো– ওয়ালীদের বাপ, শেষ পর্যন্ত তোমার ওপর তার যাদুর প্রভাব পড়লো? উতবা বললো–আমি আমার মতামত তোমাদের সামনে পেশ করলাম। এখন তোমাদের যা ইচ্ছা করতে থাকো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করতে করতে যে সময়–

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ–

এখন যদি এসব লোক মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এদেরকে বলে দাও আমি তোমাদেরকে আদ ও সামূদ জাতির আযাবের মত অকস্মাৎ আগমনকারী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। (সূরা হামীম সিজ্‌দাহ-১৩)

আয়াতটি পড়লেন তখন উতবা আপনা থেকেই তাঁর মুখের ওপর হাত চেপে ধরে বললো– আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের জাতির প্রতি সদয় ও হও। পরে সে কোরাইশ নেতাদের কাছে তার এ কাজের কারণ বর্ণনা করেছে এই বলে যে, আপনারা জানেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা সত্যে পরিণত হয়। তাই আমি আমাদের ওপর আযাব অবতীর্ণ না হয় এই ভেবে আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম।

আমার ভাতিজার শরীরে হাত তুলেছিস?

দুকূল প্লাবী প্রচন্ড গতি সম্পন্ন প্লাবনের গতি পতে যদি বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহলে পানি প্রবাহিত হবার জন্য নিজেই তার পথ সৃষ্টি করে নেয়। মহাসত্যের আন্দেলনের গতি পথে বাধার সৃষ্টি করা হলেও আন্দোলনই তার বিকল্প পথ সৃষ্টি করে নেয়। ইসলামের শত্রুরা যতগুলো পথ সৃষ্টি করে এই কার্যক্রম স্তব্ধ করে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর ইশারায় ততোধিক পথ প্রস্তুত করে তাঁর কার্যক্রম পরিচালিত করেছেন। ক্ষণিকের জন্যও বাতিল শক্তিকে ময়দান ছেড়ে দিয়ে তিনি ঘরে এসে বসেননি। তাঁর বিরুদ্ধে বাতিল শক্তিও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

কাফির নেতৃবৃন্দ মক্কার উচ্ছৃংখল এবং সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোকদেরকে আল্লাহর রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর লেলিয়ে দিয়েছে। তারা সত্যের বাহকদের পেছনে ঘুরেছে আর নানা ধরণের অপবাদ ছড়িয়েছে। মিথ্যাবাদী, জ্যোতিষী, পাগল, জ্বীনে

আক্রান্ত রোগী, যাদুকর, কবি, গনক ইত্যাদী বিশেষণে বিশেষিত করেছে। কিন্তু মহাসত্যের বাহক সামান্যতম মনভাঙ্গা হননি। একদিন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কা'বাঘরের কালো পাথরের কাছে সমবেত হয়ে আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের আপত্তিকর কথা বলছিল। এমন সময় নবীজী সেখানে এসে কা'বাঘর তাওয়াফ করতে লাগলেন। তাঁকে দেখে অনেকেই বিদ্রুপ করলো। ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলের চেহারায় প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের সময় তাদের কাছাকাছি হলেই তারা রাসূলকে লক্ষ্য করে প্রলাপ বকতে থাকে। বেশ কয়েকবার তারা বিদ্রুপ করার পরে আল্লাহর রাসূল সেখানে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে কুরাইশরা! তোমরা জেনে রাখো, যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি ঈমান না আনো, তাহলে আমি তোমাদের মহা সর্বনাশ বহন করে এনেছি।

বর্ণনাকারী বলেন, ক্ষণপূর্বেও যারা আল্লাহর রাসূলের সমালোচনায় মুখর ছিল তাঁরা নবীজীর কথায় হতবাক হয়ে গেল। একজন উঠে এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আবুল কাসিম! তুমি এদের কথায় কান দিও না। তুমি তো আর এদের মত মূর্খ নয়।

সেদিনের মত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেন। পরের দিন পুনরায় তারা ঐ একই স্থানে সমবেত হয়ে আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে সমালোচনা শুরু করে দিল। এ সময়ে নবীজী কা'বাঘর তাওয়াফ করতে এলেন। এবার তাঁরা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সবাই একত্রে আল্লাহর নবীকে ঘিরে বললো, তুমি আমাদের দেব-দেবতাদের সম্পর্কে বলো, এ সব নাকি মিথ্যা। তোমার এ কথা কি সত্য?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রশান্ত চেহারায় জবাব দিলেন- হ্যাঁ, আমি বলি দেব-দেবতা সব মিথ্যা এবং আমার কথা সত্য। এ কথা বলার সাথে সাথে তাঁরা একত্রে বিশ্বনবীর ওপরে আক্রমণ করলো। এক ব্যক্তি একটি কাপড় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের গলায় জড়িয়ে দু'দিক থেকে প্রচন্ড শক্তিতে টান দিল। ফলে শ্বাস বন্ধ হয়ে নবীজীর প্রাণ বের হবার উপক্রম হলো। এমন সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কোথা থেকে ছুটে এসে আল্লাহর রাসূলকে মুক্ত করলেন। তিনি কাফিরদের বললেন, একজন মানুষ প্রতিপালক

হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে গ্রহণ করেছে আর এই অপরাধে তাঁকে তোমরা মেরে ফেলবে? আল্লাহর নবীকে মুক্ত করতে গিয়ে তিনিও আহত হয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের আচরণের কারণে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি তাঁর দায়িত্ব এবং কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে চললেন। ইসলামী আন্দোলনের বয়স তখন মাত্র ছয় বছর। গোপন আন্দোলনের তিন বছর আর প্রকাশ্য তিন বছর। এই ছয় বছরে মহান আল্লাহ এমন দুটো ঘটনা ঘটিয়ে দিলেন যে, মক্কার শ্রেষ্ঠ দু'জন বীর সন্তান হযরত হামজা ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দুটো বাহুতে পরিণত হয়েছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আল্লাহর বান্দাদেরকে ইসলামী কাফেলায় শামিল হবার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এমন সময় ইসলামের শত্রু আবু জেহেল, আদী ইবনে হামরা ও ইবনে আসদা সেখানে এসে উপস্থিত হলো। নবীজী মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করছেন, এই দৃশ্য দেখে তাদের সমস্ত শরীরে শয়তান আগুন জ্বালিয়ে দিল। কাফিরের দল অকথ্য ভাষায় আল্লাহর নবীকে গালাগালি দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নীরবে তাদের গালাগালি সহ্য করলেন। নবীজীকে নীরব দেখে আবু জেহেল এবং তার সঙ্গীরা আল্লাহর নবীর পবিত্র শরীরে ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করলো। তবুও তিনি নীরব রইলেন। এবার আবু জেহেল তাঁর হেদায়েতের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়ে নিজের হাতে নিজের সৌভাগ্যের কবর রচিত করে দুর্ভাগ্যের সমস্ত দুয়ার উন্মুক্ত করে দিল। সে তার অপবিত্র হাত আল্লাহর নবীর পবিত্র শরীরে উঠালো।

বিশ্বমানবতার মহান মুক্তির দূত কাফির আবু জেহেলের হাতে প্রহৃত হলেন। ধৈর্যের প্রতিচ্ছবি আল্লাহর নবী নীরব রইলেন। আবু জেহেলকে শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহর ফেরেশতার সহযোগিতা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারকে মহান আল্লাহ যে শক্তি দিয়েছিলেন, তিনি তখন যদি সে শক্তিই প্রয়োগ করতেন, তাহলে আবু জেহেল এবং তাঁর সাথীদের দেহের হাড় আর গোস্ত পৃথক হয়ে যেত। গোটা আরবের শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী কুস্তিগীরও লড়াই করে মহানবীর হাতে আছাড় খেয়েছিল। সে তুলনায় আবু জেহেল আর তার সাথীরা ছিল ধূলি বরাবর। কিন্তু তাঁর নীরবতার ভেতরে মহান আল্লাহ সে

অনাগত দিনের জন্য কল্যাণ নিহিত রেখেছিলেন। সেই কল্যাণের দিকে তাকিয়ে তিনি নীরব ছিলেন। আবু জেহেল তাঁর মনের উত্তাপ আল্লাহর নবীর ওপর ঢেলে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করেছিল। কিন্তু ঘটনা মহান আল্লাহ গোপন রাখেননি। তৎক্ষণাৎ মহান আল্লাহ সে ঘটনার বিনিময় তাঁর নবীকে দিয়েছিলেন।

বনী তাইমের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআনের মুক্তি প্রাপ্ত দাসী সাফা পাহাড়ের ওপরে নিজের ঘরের জানালা দিয়ে সমস্ত ঘটনা অবলোকন করেছিল। সে সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও ঘটনা স্থল ত্যাগ করে নিজের অবস্থানে চলে গিয়েছিলেন। হযরত হামজা শিকার থেকে ঐ পাহাড়ের পাশ দিয়েই আসছিলেন। তাঁকে সেই দাসী ডেকে বলেছিল, তুমি এখন আসছো, একটু আগে তোমার ভাতিজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এখানে তাঁর আদর্শের কথা লোকদেরকে শুনাচ্ছিল। আর আবু জেহেল এসে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিল। তোমার ভাতিজা কোন জবাব দেয়নি। আবু জেহেল তোমার ভাতিজার শরীরে ময়লা ছুড়ে দিল। তবুও সে কিছু বলেনি। তারপর আবু জেহেল তোমার ভাতিজাকে আঘাত করলো তবুও সে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ না করে চলে গেল।

হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর গোটা দিনের কর্ম ক্লান্ত দেহে কথাগুলো যেন আগুন ধরিয়ে দিল। সে জীবিত থাকতে তাঁর ভাতিজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শরীরে আবু জেহেল হাত উঠিয়েছে! তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। শিকার থেকে এসেছেন, বাড়িতেও গেলেন না। কাঁধের অস্ত্র তীর ধনুকও ছাড়লেন না। ঐ অবস্থাতেই তিনি আবু জেহেলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। নরাধম আবু জেহেল কা'বার পাশে বসে আল্লাহর নবীর নামে কুৎসা ছড়াচ্ছিল। হযরত হামজা সোজা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে শয়তানের মাথায় ধনুক দিয়ে প্রচন্ড শক্তিতে আঘাত করলেন। আবু জেহেল রক্তাক্ত হয়ে পড়লো। হযরত হামজা ক্রোধে গর্জন করে তাকে বললেন, তোর এত বড় সাহস! তুই আমার ভাতিজার শরীরে হাত তুলেছিস! আমিও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শের ওপরে ঈমান এনেছি। সে যে কথা বলে আমিও ঐ একই কথা বলি। যদি তোর সাহস থেকে থাকে তাহলে আমার শরীরে হাত উঠিয়ে দেখ!

হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর হাতে আবু জেহেলকে রক্তাক্ত হতে দেখে তাঁর গোত্রের লোকজন হযরত হামজাকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হলো।

আবু জেহেল নিজের লোকদেরকে বাধা দিয়ে নিজের দোষের স্বীকৃতি দিয়ে বললো, হামজাকে তোমরা কেউ কিছু বলো না। সত্যই আমি তাঁর ভাতিজার সাথে অন্যায় ব্যবহার করেছি।

সে সময় আবু জেহেল নমনীয় ভূমিকা কেন গ্রহণ করেছিল এ সম্পর্কে গবেষকগণ বলেন, আবু জেহেল ছিল বনী মাখযুম গোত্রের আর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন বনী হাশিম গোত্রের। একবার সে আল্লাহর রাসূলের শরীরে হাত উঠিয়েছে, এবার যদি তার লোকজন হামজার শরীরে হাত উঠায় তাহলে এই দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে। ফলে তার নেতৃত্ব আর থাকবে না। হাশিম গোত্র এবং তাঁর মিত্র গোত্রসমূহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সহযোগিতা করবে। এ সমস্ত কথা ভেবেই নরাধম সে সময়ে নিজের লোকদেরকে হযরত হামজার ওপর হাত উঠানো থেকে বিরত রেখেছিল।

এরপর হযরত হামজা নবীজীর কাছে যেয়ে বললেন, বাবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! শুনে তুমি খুশী হবে যে, তোমার সাথে আবু জেহেল যা করেছে আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। আল্লাহর নবী শান্ত কণ্ঠে বললেন, আমার শ্রদ্ধেয় চাচা! এ সংবাদ আমার জন্য খুশীর নয়, আমার জন্য খুশীর সংবাদ হতো যদি আমি জানতে পারতাম আমার চাচা সমস্ত কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর দাসত্ব কবুল করেছেন।

হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মনের অন্ধকার দূর হয়ে গেল। তিনি আর এক মুহূর্ত দেরী না করে আল্লাহর নবীর হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ঘোষনা দিলেন, আমি সাক্ষী দিচ্ছি আপনি সত্যবাদী। আপনি চারদিকে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটান। আল্লাহর কছম! আমার মাথার ওপর আকাশ ছায়াদান করবে আর আমি আমার বাপ দাদার আদর্শ আঁকড়ে ধরে থাকবো, এটা আমি কোন ক্রমেই পছন্দ করি না।

এই সেই হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, যার তীব্র আক্রমণের মুখে বদরের যুদ্ধে বাতিল শক্তি পর্যদুস্ত হয়ে পড়েছিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর বাঘ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ওহূদের ময়দানে হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শাহাদাতবরণ করার পরে

কাফিরেরা তাঁর লাশ বিকৃত করেছিল। ওহুদের ময়দানেই তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি শহীদের জানাযা আদায় করার সময় প্রতি বারই হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর জানাযা আদায় করেছিলেন। এভাবে তাঁর জানাযা ৭০ বার আদায় করা হয়েছিল। এই মর্যাদা আর কোন সাহাবী লাভ করেননি। তাঁর শাহাদাতের ৩৭ বছর পরে আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আদেশে ওহুদের দিক থেকে একটা খাল খনন করা হচ্ছিল। খনন করার সময় বেশ কয়েকজন শহীদের লাশ এমন অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেল যে, তাঁরা যেন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ করে হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পায়েও খনন করার সময় আঘাত লেগেছিল। আঘাতের পরে এমনভাবে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছিল যে, তিনি যেন জীবন্ত মানুষ।

হে ওমর! তুমি কি বিরত হবে না

যে সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যাত লাভ করেন সে সময়ে গোটা কুরাইশদের মধ্যে মাত্র সতেরজন লোক লেখা পড়া জানতেন। তাঁর মধ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন একজন। সে সময়ের ইতিহাস থেকে জানা যায় হযরত ওমর ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বীর এবং বিখ্যাত কুস্তিগীর, পাহলোয়ান। উকাযের মেলায় তিনি কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। সমকালিন বিখ্যাত কবিদের কবিতা ছিল তাঁর মুখস্থ, এ থেকে ধারণা করা যায় তাঁর মধ্যে কাব্য প্রতিভা কি ধরণের ছিল। আরবী কাব্য সমালোচনার বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন তিনি। বংশ তালিকা বিদ্যায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। ঐতিহাসিকগণ বলেন তাঁর জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির সুনাম চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কোন গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তাকেই দূত হিসেবে প্রেরণ করা হত। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী এবং সে কারণে তাকে বিদেশ ভ্রমণ করতে হত। ফলে বিদেশের নেতৃবৃন্দ এবং শাসক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশার কারণে তাঁর জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি বিশেষ এক স্তরে উন্নিত হয়েছিল।

নেতৃত্বের যাবতীয় গুণাবলী ছিল তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। সেই মূর্খতার যুগেও তিনি ছিলেন নেতা আবার ইসলাম গ্রহণ করার পরে তিনিই ছিলেন নেতা। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তাঁর মত ব্যক্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ কারণেই নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর মত ব্যক্তিত্বের জন্য দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশামকে ইসলামে দাখিল করে তুমি ইসলামকে শক্তিশালী করো।

তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা ছিল বড় অপূর্ব। তিনি ছিলেন আদী গোত্রের লোক, তাঁর এই গোত্রে তাওহীদের আলো নতুন কিছু ছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বেই তাওহীদ বাদী ছিলেন হযরত যায়েদ, আর বিশ্বনবীর হাতে হাত দিয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন ঐ যায়েদেরই সৌভাগ্যবান সন্তান হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব। হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিকে ছিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চাচাত ভাই এবং আরেকদিকে ছিলেন তাঁর আপন বোনের স্বামী।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বংশের আরেকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল হযরত নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে তেমন কোন সংবাদ রাখতেন না। কেননা, ইসলামী দাওয়াতী কার্যক্রমের গোপনীয়তার কারণে অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে জানতেন না। তাছাড়া যারা শুনেছিল, তারা হয়তঃ ভেবেছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এই নতুন আদর্শ সমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করবে না। দু'চারজন লোকের কাছেই সে আদর্শ সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় কেউ যদি তা শুনেই থাকে ব্যাপারটাকে তাঁরা তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যে সময় ইসলামের কথা শুনলেন তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন যারা ইসলাম কবুল করেছিল, তিনি তাদের প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন।

তিনি যখন শুনলেন তাঁর এক দাসীও ইসলাম কবুল করেছে, তখন তিনি সেই দাসীর ওপরে চরম নির্যাতন করলেন। দাসীকে যখন ইসলাম ত্যাগ করলো না, তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ইসলাম যার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে তাকেই তিনি এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিবেন। তারপর শানিত তরবারী কাঁধে ঝুলিয়ে আল্লাহর রাসূলের সন্ধানে বের হলেন। পথে তাঁর সাথে কথা হয়েছিল হযরত নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে। সে হযরত ওমরকে জিজ্ঞাসা করলো, হে ওমর! তুমি এমন ক্রোধের সাথে কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে কোথায় যাচ্ছো?

লোকটির প্রশ্নের জবাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে একটা শেষ বুঝাপড়া করতে। লোকটি তাঁকে সাবধান করে দেয়ার জন্য বললো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোন ক্ষতি করলে তাঁর গোত্রের লোকজনের হাত থেকে তুমি নিস্তার পাবে কি করে? লোকটির একথায় হযরত ওমর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তুমি বোধহয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করেছো? লোকটি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য দ্রুত কণ্ঠে বললো, একটা সংবাদ শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে, তোমার বোন এবং তাঁর স্বামী ইসলাম কবুল করেছে। এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর ক্রোধে ফেটে পড়লেন। হিতাহিত জ্ঞান শুন্যের মত তিনি ছুটলেন তাঁর বোনের বাড়ির দিকে।

তাঁর বোন ভগ্নিপতি ঘরের দরোজা বন্ধ করে সে সময়ে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে কোরআনের সূরা ত্ব-হা শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। হযরত ওমর বোনের বন্ধ দরজার কাছে যেতেই তাঁর কানে কোরআনের মধুর বানী প্রবেশ করে তাঁর অন্তরের পূঞ্জিভূত বরফ গলানো শুরু করে দিয়েছিল। তিনি গর্জন করে বোনের দরজায় আঘাত করলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আভাস পেয়ে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আত্মগোপন করলেন। দরজা খুলে দেয়ার পরে হযরত ওমর ঘরে প্রবেশ করে তাদের কাছে ধমকের সুরে জানতে চাইলেন, তোমরা কি পড়ছিলে? আমি তাঁর শব্দ শুনেছি। তাঁরা জবাব দিলেন, আমরা পরস্পরের মধ্যে কথা বলছিলাম। হযরত ওমর বললেন, তোমরা নিজের আদর্শ ত্যাগ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করেছো? হযরত ওমরের ভগ্নিপতি বললেন, আমাদের আদর্শ থেকেও অন্য আদর্শ যদি উত্তম হয় তাহলে তুমি কি করবে ওমর?

তাঁর মুখের কথা শেষ না হতেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ভগ্নিপতির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে অমানবিকভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। স্বামীকে হেফাজত করতে এসে তাঁর বোনও ভাইয়ের হাতে রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। বোনের শরীরে রক্ত দেখে হযরত ওমর যেন চমকে উঠলেন। ইতোপূর্বেই তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, শত নির্যাতনের মুখেও তাঁর দাসী এই আদর্শ ত্যাগ করেনি। তাঁর বোন

এবং ভগ্নিপতির অবস্থাও তেমনি। তাহলে কি আছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শের মধ্যে? এই প্রশ্ন তাঁর ভেতরের পৃথিবীটা সম্পূর্ণ ওলট-পালট করেদিল। তিনি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অনুশোচনার কণ্ঠে তিনি তাঁর বোন ভগ্নিপতিকে বললেন, তোমরা কি পড়ছিলে আমাকে দেখাও!

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কণ্ঠের পরিবর্তন শুনেই তাঁরা অনুভব করেছিল, ওমরের ভেতরে পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছে। তাঁরা জানালো, আমরা যা পড়ছিলাম তা মহান আল্লাহর বাণী, অপবিত্র অবস্থায় তা স্পর্শ করা যায় না। সুবোধ বালকের মতই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পবিত্র হয়ে এসে আল্লাহর কোরআন পড়তে লাগলেন। মূহুর্তে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূরিভূত হয়ে সেখানে তাওহীদের আন্নাতি শিখা দেদিপ্যমান হয়ে উঠলো। কিছুটা পড়েই তিনি করুণ কণ্ঠে আবেদন জানালেন, কোথায় আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।

হযরত ওমরের এই কথা শুনে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গোপন স্থান থেকে বের হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আনন্দিত কণ্ঠে বললেন, হে ওমর! আনন্দের সংবাদ গ্রহণ করো, তোমার জন্য আল্লাহর রাসূল দোয়া করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের দোয়া কবুল করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এখন সাফা পাহাড়ের ওপরে আরকামের বাড়িতে অবস্থান করছেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এখন ভিন্ন এক জগতের মানুষ। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এই পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিরত করতে এসেছিলেন। এসেছিলেন তওহীদের জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে। এখন স্বয়ং তিনিই সে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। দারে আরকামের দিকে তিনি চলেছেন। আগের মতই তাঁর কাঁধে তরবারী ঝুলানো রয়েছে, তবে সে তরবারী এখন ব্যবহার হবে আল্লাহদ্রোহী বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শের পক্ষে।

হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সে সময়ে দারে আরকামের দরজায় কিছু সংখ্যক মুসলমানসহ প্রহরা দিচ্ছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে

আসতে দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, তাকে আসতে দাও। আল্লাহ যদি ওমরের কল্যাণ করেন তাহলে সে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করবে, আর যদি সে অন্য উদ্দেশ্যে আসে তাহলে তাঁর তরবারী দিয়েই তাকে হত্যা করা হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে সময়ে আরকামের বাড়ির ভেতরে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আগমনের কথা জানালে তিনি প্রশান্ত চিত্তে বলেছিলেন, তাকে আসতে দাও। এরপর হযরত ওমর এসে পৌছলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে তাঁর তরবারীর গোড়ার দিক এবং পরনের কাপড় নিজের হাতে ধরে মমতাভরা কণ্ঠে বললেন, হে ওমর! তুমি কি বিরত হবে না? হে আল্লাহ! ওমর আমার সামনে, হে আল্লাহ ওমরের মাধ্যমে তুমি তোমার ইসলামকে শক্তিশালী করো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর নবীর হাতে হাত রেখে ঘোষনা দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনার জন্য আপনার কাছে এসেছি।

হযরত ওমরের কণ্ঠে এমন ব্যাকুল আবেদন শুনে আল্লাহর নবীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে মুহূর্তে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহু আকবার বলে তাকবির দিয়েছিলেন। বর্তমান কালের গবেষকগণ যাকে বিজয়ের শ্লোগান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামও সেদিন নীরব ছিলেন না, তাঁরাও আল্লাহর নবীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সেদিন তাওহীদের বিজয় ঘোষনা করেছিলেন। নবী এবং সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত শ্লোগানে সেদিন পৃথিবীর সমস্ত বাতিল শক্তির ভিত্তি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়েছিল, যা শুধু ধ্বসে পড়ার অপেক্ষায় ছিল। ইসলামের বিপ্লবী কাফেলায় শামিল হয়েই আল্লাহর সৈনিক ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘোষনা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর লুকোচুরি নয়, আল্লাহ বিরোধী মিথ্যে শক্তি প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাবে, আল্লাহর ঘর তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করবে আর আমরা যারা মহান আল্লাহর দাসত্ব করি তাঁরা কা'বায় নামাজ আদায় করতে পারবো না, গোপনে নামাজ আদায় করবো তা হতে পারে না। চলুন আমারা প্রকাশ্যে কা'বায় মহান আল্লাহকে সিজদা করবো।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামী আন্দোলন শুরু করার ছয় বছরের সময়। সে সময়ে হযরত ওমরের বয়স ছিল ত্রিশ-এর ওপরে এবং তেত্রিশ-এর মধ্যে।

এত হৈ চৈ করছো কেন?

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছেন এ কারণে গোটা মক্কায় একটা শোরগোল সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিটি মানুষের মুখে ছিল সেই আলোচনা। ব্যাপারটা আল্লাহর সৈনিকদের কাছে পরম খুশীর হলেও আল্লাহদ্রোহীদের কাছে তা ছিল একেবারে অবিশ্বাস্য। তাঁরা হতবাক হয়ে পড়েছিল। এই শোরগোল শুনে বীর কেশরী আস ইবনে ওয়ায়ীল এসে সমবেত কুরাইশদের কাছে জানতে চাইলো, কি হয়েছে তোমাদের, এত হৈ চৈ করছো কেন? কুরাইশরা তাকে জানালো, সর্বনাশের সংবাদ হলো ওমর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দলে ভিড়েছে। এ সংবাদ শুনে আস ইবনে ওয়ায়ীল বললো, ওমর ঠিকই করেছে। আমি তাকে আশ্রয় দিলাম।

স্বয়ং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করে সে রাতেই চিন্তা করলাম মক্কায় ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু কে আছে, তাকেই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানাবো। আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়লো ইসলামের বড় শত্রু হলো আবু জেহেল। পরদিন সকালে আমি আবু জেহেলের বাড়িতে চলে গেলাম। তাঁর ঘরের দরজায় করাঘাত করে তাকে ডাকলাম। সে দরজা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ওমর! তুমি আমার কাছে কি মনে করে এসেছো? আমি তাকে বললাম, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। আমার কথা শুনে আবু জেহেল বললো, আল্লাহ তোকে কলঙ্কিত করুক এবং যে সংবাদ নিয়ে তুই এসেছিস তাকেও কলঙ্কিত করুক। এই কথাগুলো বলতে বলতে সে আমার মুখের ওপরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

সে সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণ ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণে একদিকে ইসলাম বিরোধী শক্তির ভীত যেমন কেঁপে উঠেছিল অপর দিকে ইসলামী কার্যক্রমের গতি কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এতদিন মুসলমানগণ তাদের তৎপরতা চালানোর ব্যাপারে শংকায় নিমজ্জিত থাকলেও তাঁরা এবারে শংকাহীন চিত্তে তাদের তৎপরতা শুরু করলো।

ইতোপূর্বে নিজেকে মুসলিম হিসেবে ঘোষনা দেয়া ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার, হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের পরে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। এতদিন ইসলামী আন্দোলনের কার্যক্রম ছিল মক্কার জনগোষ্ঠীর কাছে গুরুত্বহীন। কিন্তু তাঁরা এবার অনুভব করলো, এ আন্দোলন শুরু হয়েছে সমস্ত শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়ার লক্ষ্যে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কার্যক্রমকে লক্ষ্য স্থলে না পৌঁছে দিয়ে বিরত হবেন না। তাঁরা অনুভব করলো, এতদিন যাকে গুরুত্বহীন বলে কোন পাত্তা দেয়া হয়নি, আজ সেই গুরুত্বহীন শক্তি বিশাল এক পর্বতে পরিণত হয়েছে। যা অতিক্রম করা এখন তাদের কাছে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তির আহার নিদ্রা ত্যাগের উপক্রম হলো। যে কোন উপায়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মিশনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য তাঁরা একটা চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছলো।

কেনানা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণ করার পরে গোটা মক্কায় ইসলাম একটা আন্দোলন, একটা শক্তি, একটা সংগঠন, একটা অত্যাসন্ন বিপ্লব, একটা অপ্রতিরোধ্য প্রকাশ্য শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মুসলমানগণ প্রকাশ্যে কা'বায় নামাজ আদায় শুরু করেছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে তাঁরা উপযুক্ত জবাব দিতেন। কা'বার পাশে তাঁরা প্রকাশ্যে জমায়েত হতেন। তাঁদের ওপরে কেউ আক্রমণ করলে তাঁরা সে আক্রমণ প্রতিহত করতেন। প্রকাশ্যে তাঁরা কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতেন। বিশেষ করে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে কেউ কোন কথা বললে তিনিও কোন আপোষ করে কথা বলতেন না। উপযুক্ত জবাব দিয়ে তারপর স্থান ত্যাগ করতেন।

তোমাকে মৃত মানুষের মত দেখাচ্ছে কেন?

আবু জেহেল দম্ভভরে কুরাইশদের সামনে প্রতীজ্ঞা করলো– হে কুরাঈশগণ! আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমার শরীরে যত শক্তি আছে আমি সেই শক্তি দিয়ে যত বড় পাথর উঠাতে সক্ষম, তা আগামী কাল উঠাবো। তারপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন কা'বায় এসে নামাজে সিজদা দেবে তখন সে পাথর দিয়ে আমি তাঁর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো। এর জন্য যদি আমাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় আমি তাতেও প্রস্তুত আছি। এর জন্য আমার যা হয় হবে, আমি কোন কিছুর পরোয়া করবো না। তাঁকে আমি আর কিছুতেই সামনে

অগ্রসর হতে দেব না। আবু জাহিলের এ ধরণের প্রতীজ্ঞা শুনে উপস্থিত কুরাইশরা তাকে উৎসাহ দিয়ে বললো, তুমি যা বলেছো তাই তুমি করো। কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা তোমার সাথে আছি। আমরা দেখবো কে তোমার বিচার করতে আসে। তুমি তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করো।

কুরাইশদের উৎসাহ পেয়ে পরের দিন আবু জেহেল বিশাল একটা পাথর নিয়ে কা'বার কাছে বসে আল্লাহর রাসূলের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলো। কুরাইশদের অন্যান্য নেতারা অপর দিকে জমায়েত হলো। তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলো, এখুনি তাদের কানে আসবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আর নেই। তাঁকে হত্যা করার পরে কি ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে এবং সবদিক কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এ কথা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করতে থাকলো। প্রতিদিনের মতই আল্লাহর নবী কা'বাঘরে এলেন।

সমস্ত সৃষ্টির অধিপতি মহান আল্লাহর দরবারে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। চারদিকে তাঁর প্রাণের শত্রু। তাঁকে হুমকি দেয়া হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে তাঁর ওপর প্রচন্ড আঘাত আসতে পারে। কোন ধরণের কোন প্রতিক্রিয়া নেই তাঁর হৃদয়ে। শংকাহীন হৃদয়ে প্রশান্ত চিত্তে তিনি নামাজে দাঁড়িয়েছেন। মহান আল্লাহর সামনে তিনি সিজদায় অবনত হলেন। আবু জেহেল তাঁর প্রতীজ্ঞা অনুযায়ী বিশাল পাথর খন্ড হাতে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। আল্লাহর রাসূলের মাথা লক্ষ্য করে সে পাথর ছুড়বে। হঠাৎ একটা প্রকান্ড এবং ভয়ংকর দর্শন উট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও আবু জাহিলের মাঝে অবস্থান গ্রহণ করলো। উটের মুখ কাফির আবু জাহিলের দিকে। তাঁর দিকে উটটি রক্ত চক্ষু মেলে তাকিয়ে মুখ ব্যদন করে এগিয়ে এলো।

থরথর করে কেঁপে উঠলো কাফির আবু জেহেল। পাথর তাঁর হাতেই রইলো। আল্লাহর নবী নিবিষ্ট চিত্তে নামাজ আদায় করছেন। তাঁর পেছনে কি ঘটছে, মহান আল্লাহ তাঁকে কিভাবে রক্ষা করছেন, এসব দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, তিনি তাঁর রক্ষাকর্তা মহান আল্লাহকে সিজদা করতে নিমগ্ন হয়ে আছেন। আল্লাহ তাঁকে যে দায়িত্ব প্রদান করেছেন, তিনি তা পালন করছেন, আর মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দার জন্য যা করণীয় তাই করছেন। ভয়ে আবু জাহিলের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত সে স্পন্দনহীনের মতই ভয়ংকর উটটির দিকে তাকিয়ে থেকে দ্রুত

পায়ে স্থান ত্যাগ করলো। তারপর হাতের পাথর দূরে নিক্ষেপ করে তার সহযোগিদের কাছে গেল। প্রচন্ড ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে রক্তশূন্য চেহারায় আবু জেহেলকে আসতে দেখে কাফির নেতৃবৃন্দ দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, হে ইবনে হিশাম! কি হয়েছে তোমার? তোমাকে এমন মৃত মানুষের মত দেখাচ্ছে কেন?

ভীত-সন্ত্রস্ত আবু জেহেল কোন মতে শুকনো কণ্ঠে জানালো– মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য তাঁর দিকে অগ্রসর হতেই হঠাৎ আমি দেখলাম, একটা ভয়ংকর উট কোত্থেকে এসে তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ালো। আল্লাহর শপথ! এমন ভয়ংকর উট আমি জীবনে দেখিনি। সেই উট আমার দিকে তাঁর ভয়ংকর দাঁত বের করে আমাকে খাওয়ার জন্য এগিয়ে এলো। আমি আর কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করলে তোমরা আমাকে দেখতে পেতে না। আমাকে উটটা খেয়েই শেষ করে দিত। ভয়ে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত হীম হয়ে গেছে। আমার পক্ষে সম্ভব হলো না তাকে হত্যা করা।

মহান আল্লাহ্ এভাবেই তাঁর প্রিয় হাবিবকে সেদিন কাফিরদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই ঘটনার দ্বারা আবু জাহিলের ভাবমূর্তি বহুলাংশে ক্ষুন্ন হয়েছিল। কারণ তাঁর কথা অধিকাংশ কাফের নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করেনি। তাঁরা ধারণা করেছিল, আবু জেহেল তাঁর ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার জন্য এই মিথ্যা কাহিনী সাজিয়ে তাঁদের সামনে পরিবেশন করছে। কিছু সংখ্যক লোক যারা আবু জাহিলের অন্ধভক্ত ছিল, তাঁরা হয়তঃ তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিল। প্রতিটি যুগে কাফিরদের চক্রান্ত এভাবে ব্যর্থ করে দিয়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন।

দুশমনও সিজ্দা করতে বাধ্য হলো

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, সিজদার আয়াত সম্বলিত সূরা– সূরা আন্ নাজমই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকেই এই হাদীসের যেসব অংশসমূহ হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ, হযরত আবু ইসহাক ও হযরত জুবাইর ইবনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, এটা কোরআন মজীদের প্রথম সূরা যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের এক

সমাবেশে সর্বপ্রথম তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন। সমাবেশে কাফির ও মুমিন উভয় শ্রেণীর লোকজনই উপস্থিত ছিল। শেষের দিকে আল্লাহর রাসূল যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তখন উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সিজদায় চলে গেল। ইসলাম বিরোধিদের বড় বড় নেতারা পর্যন্ত–যারা অন্যদের অপেক্ষা বেশী বিরোধী ছিল–সিজদা না করে পারলো না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি কাফিরদের মধ্যে মাত্র একজন–উমাইয়া ইবনে খালফ্‌কে দেখলাম, সে সিজদা করার পরিবর্তে কিছুটা মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বললো, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। আর পরবর্তী সময়ে আমি এ দৃশ্যও দেখতে পেয়েছি যে, লোকটি কুফরি অবস্থায়ই নিহত হলো।

এ ঘটনার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হচ্ছেন হযরত মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদা'আ। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেননি। হাদীস গ্রন্থ নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদে তাঁর নিজের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সূরা নাজম তিলাওয়াত করে সিজদা করলেন এবং উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেল। কিন্তু আমি সিজদা করলাম না। বর্তমানে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ আমি এভাবে করি যে, এ সূরা তিলাওয়াত কালে আমি কক্ষণ-ই সিজদা না করে ছাড়ি না।

নবুয়্যাত লাভের পর পাঁচটি বছর পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলমাত্র গোপনে বৈঠক-মজলিসে ও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আল্লাহর কালাম শুনিয়ে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবান জানাচ্ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন সাধারণ জনসমাবেশে কোরআন মজীদ তিলাওয়াত করে শোনানোর কোন সুযোগই তাঁর হয়নি। ইসলাম বিরোধিদের প্রবল প্রতিরোধই ছিল এর প্রধান অন্তরায়। আল্লাহর রাসূলের ব্যক্তিত্বে, তাঁর প্রচারমূলক কার্যাবলী ও তৎপরতার কি তীব্র আকর্ষণ ছিল এবং কোরআন মজীদের আয়াতসমূহের কি অপ্রতিরোধ্য প্রভাব ছিল, সে বিষয়ে তারা ভালোভাবেই অবহিত ছিল। এ কারণেই তারা নিজেরাও এই কালাম না শুনার এবং অন্যরাও যেন শুনতে না পারে সে জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করতো না। কোরআন না শোনার ব্যাপারে তারা কি বলতো, আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে শোনাচ্ছেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ-

এসব কাফিররা বলে, এই কোরআন তোমরা কখনো শুনবে না। আর যখন তা শুনানো হবে তখন হট্টগোল বাধিয়ে দেবে। হয়তো এভাবে তোমরা বিজয়ী হবে। (সূরা হামীম সিজ্‌দা-২৬)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নানা ধরণের ভুল ধারণা প্রচার করে শুধুমাত্র নিজেদের মিথ্যা প্রচারণার বলে তাঁর ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতকে অবরুদ্ধ ও দমন করে দিতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে একদিকে তারা নানা স্থানে এ কথা রটিয়ে দিচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে এবং এখন অন্য লোকদেরকে বিভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। অপরদিকে তিনি যেখানেই কোরআন শুনানোর জন্য চেষ্টা করতেন সেখানেই হট্টগোল, কোলাহল ও চিৎকার করা তাদের একটা স্থায়ী নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ অবস্থায় একদিন আল্লাহর রাসূল হারাম শরীফের মধ্যে কুরাইশদের একটি বড় সমাবেশে আকস্মিকভাবে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এ সময় আল্লাহর পক্ষ তাঁর পবিত্র মুখে যে ভাষণটি পরিবেশিত হয়েছে, সেটাই হলো পবিত্র কোরআনের সূরা আন্ নাজ্‌ম। এই কালামের প্রভাব এত তীব্র ছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ সূরা তিলাওয়াত করছিলেন, তখন তার বিপরীতে ইসলাম বিরোধিরা এতটাই মোহিত হয়ে পড়েছিল যে, তারা হৈ-চৈ হট্টগোল করবে, এমন কোন চেতানই তাদের ছিল না। ভাষণ শেষে আল্লাহর নবী যখন সিজদায় গেলেন, তখন তাঁর সাথে সাথে উপস্থিত ইসলাম বিরোধী লোকজনও সিজদায় পড়ে গেল। এটা ছিল কোরআনের প্রতি তাদের বড় দুর্বলতা। তারা এ দুর্বলতা প্রদর্শন করে পরে বিব্রত বোধ করছিল। সাধারণ লোকজন তাদেরকে তিরস্কার করতে লাগলো, যে কালাম শুনতে তারাই নিষেধ করে আর সে কালাম শুনে স্বয়ং নিষেধকারী নেতারা সিজদায় পড়ে যায়। নেতারা শুধু মনোযোগ দিয়ে কোরআন শুনেনি তাই নয়– তারা সিজদাও করেছে। তখন ইসলাম বিরোধী নেতারা নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করলো। তারা মিথ্যা রটনা করতে থাকলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সে সূরার

মধ্যে আমাদের দেব-দেবীর প্রসংশা করেছে, এ কারণে আমরা মনে করেছিলাম যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আকীদা বিশ্বাসে ফিরে এসেছে, এ কারণে আমরা সিজদা করেছি। অথচ ইসলাম বিরোধী নেতারা যে কত বড় মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল, তা এই সূরা অধ্যয়ন করলেই বুঝা যায়।

কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

আরবের সন্নিহিত রোম অধিকৃত এলাকা ছিল জর্দান, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন। সেব এলাকায় রোমানদের ওপর ইরানীদের বিজয় ৬১৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণতা লাভ করেছিল। এ থেকে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, এ সূরাটি সে বছরই অবতীর্ণ হয় এবং হাবশায় হিজরাতও এ বছরই অনুষ্ঠিত হয়। এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলোয় যে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে তা কোরআন মজীদ আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য রাসূল হবার সুস্পষ্ট প্রমাণগুলোর অন্যতম। এটি অনুধাবন করার জন্য এ আয়াতগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়্যাত লাভের ৮ বছর আগের একটি ঘটনা। রোমের কায়সার মরিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। ফোকাস নামক এক ব্যক্তি রাজ সিংহাসন দখল করে। সে প্রথমে কায়সারের চোখের সামনে তাঁর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করায় তারপর নিজে কায়সারকে হত্যা করে পিতা ও পুত্রদের কর্তিত মস্তকগুলো কনস্ট্যান্টিনোপলে প্রকাশ্য রাজপথে ঝুলিয়ে দেয়। এর কয়েকদিন পর সে কায়সারের স্ত্রী ও তার তিন কন্যাকেও হত্যা করে। এ ঘটনার ফলে ইরানের বাদশাহ খসরু পারভেজ রোম আক্রমণ করার চমৎকার নৈতিক অজুহাত খুঁজে পান। কায়সার মরিস ছিলেন তাঁর অনুগ্রাহক। তাঁর সহায়তায় পারভেজ ইরানের সিংহাসন দখল করেন। তাই তিনি তাঁকে নিজের পিতা বলতেন। এ কারণে তিনি ঘোষণা করেন, বিশ্বাসঘাতক ফোকাস আমার পিতৃতুল্য ব্যক্তি ও তাঁর সন্তানদের প্রতি যে জুলুম করেছে আমি তার প্রতিশোধ নেবো।

৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে ফোকাসের সেনাবাহিনীকে একের পর এক পরাজিত করে একদিকে এশিয়া মাইনরের এডেসার (বর্তমান উরফা) এবং অন্যদিকে সিরিয়ার হাল্‌ব ও আন্তাকিয়ায় পৌঁছে যান। রোমের রাজ্য পরিষদ যখন দেখলো ফোকাস দেশ রক্ষা করতে পারছে

না তখন তারা আফ্রিকার গভর্নরের সাহায্য চাইলো। গভর্নর তার পুত্র হিরাক্লিয়াসকে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী সহকারে কনষ্টান্টিনোপলে পাঠান। হিরাক্লিয়াস সেখানে পৌছার সাথে সাথেই ফোকাসকে পদচ্যুত করা হয়। তার পরিবর্তে হিরাক্লিয়াসকে কায়সার পদে অভিষিক্ত করা হয়। তিনি ক্ষমতাসীন হয়েই ফোকাসের সাথে একই ব্যবহার করেন যা সে ইতোপূর্বে মরিসের সাথে করেছিল। এটি ছিল ৬১০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা এবং এ বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়্যাত লাভ করেন। খসরু পারভেজ যে নৈতিক বাহানাবাজীর ভিত্তিতে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন ফোকাসের পদচ্যুতি ও তার হত্যার পর তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। যদি সত্যিই বিশ্বাসঘাতক ফোকাসের থেকে তার জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকতো তাহলে তার নিহত হবার পর নতুন কায়সারের সাথে পারভেজের সন্ধি করে নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি এরপরও যুদ্ধ জারী রাখেন, বরং এরপর তিনি এ যুদ্ধকে অগ্নি উপাসক ও খৃষ্টবাদের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধের রূপ দেন। খৃস্টানদের যেসব সম্প্রদায়কে ধর্মচ্যুত ও নাস্তিক গণ্য করে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় গীর্জা বছরের পর বছর ধরে তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছিল (অর্থাৎ নাস্তুরী, ইয়াকূবী ইত্যাদি) তারাও আক্রমণকারী অগ্নি উপাসকদের প্রতি সর্বাত্মক সহানুভূতি দেখাতে থাকে। এদিকে ইয়াহূদীরা অগ্নি উপাসকদেরকে সমর্থন দেয়। এমন কি খসরু পারভেজের সোনাবাহিনীতে অংশ গ্রহণকারী ইয়াহূদী সৈন্যদের সংখ্যা ২৬ হাজারে পৌছে যায়।

হিরাক্লিয়াস এসে এ বাঁধ ভাংগা স্রোত রোধ করতে পারেননি। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই পূর্বদেশ থেকে প্রথম যে খবরটি তাঁর কাছে পৌছে সেটি ছিল ইরানীদের হাতে আন্তাকিয়ার পতন। তারপর ৬১৩ খৃষ্টাব্দে তারা দামেশক দখল করে। ৬১৪ খৃষ্টাব্দে বায়তুল মাকদিস দখল করে ইরানীরা সমগ্র খৃষ্টান জগতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ৯০ হাজার খৃষ্টানকে এই শহরে হত্যা করা হয়। তাদের সবচেয়ে পবিত্র আল কিয়ামাহ গীর্জা ধ্বংস করে দেয়া হয়। আসল ক্রুশ দণ্ডটি, যেটি সম্পর্কে খৃষ্টানদের বিশ্বাস হযরত মসীহকে তাতেই শূলীবিদ্ধ করা হয়েছিল, ইরানীরা ছিনিয়ে নিয়ে মাদায়েন পৌছিয়ে দেয়। আর্চবিশপ যাকারিয়াকেও পাকড়াও করা হয় এবং শহরের সমস্ত বড় বড় গীর্জা তারা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। খসরু পারভেজ বিজয়ের নেশায় যেভাবে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তা বায়তুল মাকদিস থেকে হিরাক্লিয়াসকে তিনি যে পত্রটি লিখেছিলেন তা থেকে আন্দাজ করা

যায়। তাতে তিনি বলেন– সকল খোদার বড় খোদা, সমগ্র পৃথিবীর অধিকারী খসরুর পক্ষ থেকে তার নীচ ও মূর্খ অজ্ঞ বান্দা হিরাক্লিয়াসের নামে- তুমি বলে থাকো, তোমার খোদার প্রতি তোমার আস্থা আছে। তোমার খোদা আমার হাত থেকে জেরুযালেম রক্ষা করলেন না কেন?

এ বিজয়ের পর এক বছরের মধ্যে ইরানী সেনাদল জর্দান, ফিলিস্তীন ও সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ দখল করে পারশ্য সাম্রাজ্যের সীমানা মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত করে। এটা এমন এক সময় ছিল যখন মক্কা মু'আযযমায় এর চাইতে আরো অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ চলছিল। এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বাধীনে তাওহীদের পতাকাবাহীরা কুরাইশদের নেতৃত্বে শিরকের পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধরত ছিল। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, ৬১৫ খৃষ্টাব্দে বিপুল সংখ্যক মুসলামনকে স্বদেশ ত্যাগ করে হাবশার খৃস্টান রাজ্যে (রোম সাম্রাজ্যের মিত্র দেশ) আশ্রয় নিতে হয়। এ সময় রোম সাম্রাজ্যে ইরানের বিজয় অভিযানের কথা ছিল সবার মুখে মুখে, মক্কার মুশরিকরা এসব কথায় আহলাদে আটখানা হয়ে উঠছিল। তারা মুসলমানদের বলতো– দেখো, ইরানের অগ্নি উপাসকরা বিজয়লাভ করেছে এবং অহী ও নবুয়্যাতের অনুসারী খৃস্টানরা একের পর এক পরাজিত হয়ে চলছে। অনুরূপভাবে আমরা আরবের মূর্তিপূজারীরাও তোমাদেরকে এবং তোমাদের দ্বীনকে ধ্বংস করে ছাড়বো। এ অবস্থায় সূরা রুম অবতীর্ণ হয় এবং এই সূরায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়–

غُلِبَتِ الرُّوْمُ-فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ ۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ-فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ-لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدِ-وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ-

রোমানরা নিকটবর্তী দেশে পরাজিত হয়েছে এবং নিজেদের এই পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয় লাভ করবে। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পূর্বেও আল্লাহর ছিল, পরেও তাঁরই থাকবে। আর সেদিনটি হবে এমন দিন যেদিন আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ে মুসলমানরা আনন্দে উৎফুল্ল হবে। (সূরা রুম-২-৪)

এই আয়াতে একটির পরিবর্তে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, রোমানরা জয় লাভ করবে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মুসলমানরাও একই সময় বিজয় লাভ করবে। আপাতদৃষ্টে এ দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর কোন একটিরও কয়েক বছরের

মধ্যে সত্য প্রমাণিত হবার কোন দুরতম সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। একদিকে ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান। তারা মক্কায় নির্যাতিত হচ্ছিলো। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরও আট বছর পর্যন্ত কোনদিক থেকে তাদের বিজয় লাভের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। একদিকে ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান। অন্যদিকে রোমের পরাজয়ের বহর দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল। ৬১৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র মিশর পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে এসেছিল। এশিয়া মাইনরে ইরানী সেনাদল রোমানদের বিতাড়িত ও বিধ্বস্ত করতে করতে বসফোরাস প্রণালীতে পৌছে গিয়েছিল। ৬১৭ সালে তারা কনস্ট্যান্টিনোপলের সামনে খিল্কদুন বর্তমানে কাযীকেই দখল করে নিয়েছিল। কায়সার খসরুর কাছে দূত পাঠিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও দীনতা সহকারে আবেদন করলেন– আমি যে কোন মূল্যে সন্ধি করতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন– এখন আমি কায়সারকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা দেবো না যতক্ষণ না তিনি শৃংখলিত অবস্থায় আমার সামনে হাজির হন এবং তাঁর শূলীবিদ্ধ ঈশ্বরকে ত্যাগ করে অগ্নি খোদার উপাসনা করেন। অবশেষে কায়সার এমনই পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন হয়ে পড়লেন যে, তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল ত্যাগ করে কার্থেজে (বর্তমান টিউনিস) চলে যাবার পরিকল্পনা করলেন। কোরআন মজীদের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরও সাত আট বছর পর্যন্ত অবস্থা এমন ছিল যার ফলে রোমানরা ইরানীদের ওপর বিজয় লাভ করবে এ ধরনের কোন কথা কোন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারতো না। বরং বিজয় তো দূরের কথা তখন সামনের দিকে এ সাম্রাজ্য আর টিকে থাকবে এ আশাও কারো ছিল না।

কোরআন মজীদের এই আয়াত অবতীর্ণ হলে মক্কার কাফিররা এ নিয়ে খুবই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে। উবাই ইবনে খাল্ফ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সাথে বাজী রাখে। সে বলে, যদি তিন বছরের মধ্যে রোমানরা জয়লাভ করে তাহলে আমি তোমাকে দশটি উট দেবো অন্যথায় তুমি আমাকে দশটি উট দেবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাজির কথা শুনে বললেন, দশ বছরের শর্ত রাখো এবং উটের সংখ্যা দশ থেকে বাড়িয়ে একশো করে দাও। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উবাইর সাথে আবার কথা বলেন এবং নতুনভাবে শর্ত দেয়া হয় যে, দশ বছরের মধ্যে উভয় পক্ষের যার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে সে অন্যপক্ষকে একশত উট দেবে।

৬২২ খৃষ্টাব্দে একদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরাত করে মদীনায় চলে যান অন্যদিকে কায়সার হিরাক্লিয়াস নীরবে কষ্ট্যান্টিনোপল থেকে বের হয়ে কৃষ্ণসাগরের পথে ত্রাবিজুনের দিকে রওয়ানা দেন। সেখানে গিয়ে তিনি পেছন দিক থেকে ইরানের ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এই প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য কায়সার গীর্জার কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। ফলে খৃষ্টীয় গীর্জার প্রধান বিশপ সারজিয়াস খৃষ্টবাদকে মাজুসীবাদের (অগ্নিপূজা) হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গীর্জাসমূহে ভক্তদের নজরানা বাবদ প্রদত্ত অর্থ সম্পদ সূদের ভিত্তিতে ঋণ দেন। হিরাক্লিয়াস ৬২৩ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়া থেকে নিজের আক্রমণ শুরু করেন। দ্বিতীয় বছর ৬২৪ সালে তিনি আজারবাইজানে প্রবেশ করে জরথুস্ত্রের জন্মস্থান আরমিয়াহ ধ্বংস করেন এবং ইরানীদের সর্ববৃহৎ অগ্নিকুন্ড বিধ্বস্ত করেন। আল্লাহর কুদরত দেখুন, এই বছরেই মুসলমানরা বদর নামক স্থানে মুশরিকদের মোকাবিলায় প্রথম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। এভাবে সূরা রূমে উল্লেখিত দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীই দশ বছরের সময়সীমা শেষ হবার পূর্বেই একই সাথে সত্য প্রমাণিত হয়।

এরপর রোমান সৈন্যরা প্রতি মুহূর্তে ইরানীদেরকে পর্যুদস্ত করতেই থাকে। ৬২৭ খৃষ্টাব্দে নিনেভার যুদ্ধে তারা পারস্য সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। এরপর পারস্য সম্রাটদের আবাসস্থল বিধ্বস্ত করে। হিরাক্লিয়াসের সৈন্যদল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং তারা তদানীন্তন ইরানের রাজধানী তায়াসফুনের দোরগোড়ায় পৌছে যায়। ৬২৮ সালে খসরু পারভেজের পরিবারে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাকে বন্দী করা হয়। তার চোখের সামনে তার ১৮ জন পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হয়। কয়েক দিনপরে কারাযন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরই হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়, যাকে কোরআন মহা বিজয় নামে আখ্যায়িত করেছে এবং এ বছরই খসরুর পুত্র দ্বিতীয় কুবাদ সমস্ত রোম অধিকৃত এলাকার ওপর থেকে অধিকার ত্যাগ করে এবং আসল ক্রুশ ফিরিয়ে দিয়ে রোমের সাথে সন্ধি করে। ৬২৯ সালে খৃষ্টানদের ক্রুশকে স্বস্থানে স্থাপন করার জন্য কায়সার নিজে বায়তুল মাকদিস যান এবং এ বছরই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা উমরাহ আদায় করার জন্য হিজরাতের পর প্রথম বার মক্কা মু'আযযমায় প্রবেশ করেন।

এরপর কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী যে সম্পূর্ণ সত্য ছিল এ ব্যাপারে কারো সামান্যতম সন্দেহের অবকাশই ছিল না। আরবের বিপুল সংখ্যাক মুশরিক এর প্রতি ঈমান আনে। উবাই ইবনে খালফের উত্তরাধিকারীদের পরাজয় মেনে নিয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বাজীর একশো উট দিয়ে দিতে হয়। তিনি সেগুলো নিয়ে আল্লাহর রাসূলের খেদমতে হাজির হন। তিনি দেন, এগুলো সাদকা করে দাও। কারণ বাজী যখন ধরা হয় তখন শরীয়াতে জুয়া হারাম হবার হুকুম নাযিল হয়নি। কিন্তু এখন তা হারাম হবার হুকুম এসে গেছে। তাই যুদ্ধের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকারকারী কাফিরদের থেকে বাজীর অর্থ নিয়ে নেয়ার অনুমতি তো দিয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু এই সংগে হুকুম দেয়া হয়, তা নিজে ভোগ না করে সাদকা করে দিতে হবে।

নবী-রাসূলদের মোযেযা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সমস্ত নবী এবং রাসূলদেরকে বিশেষ ক্ষমতা দান করেছিলেন। তাঁরা সে ক্ষমতার সংযত ব্যবহার করেছেন। সত্য প্রচারের স্বার্থে, সত্য প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে, সাধারণ মানুষ যেন মহাসত্য অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করে সত্যের অনুসারী হয়ে যায়, এই স্বার্থে তাঁরা মহান আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন। নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের স্বার্থে কোন একজন নবীও অলৌকিক ক্ষমতা এক মুহূর্তের জন্যও প্রদর্শন করেননি। সামান্য কোন কারণে বা ক্ষুদ্র কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন নবী-রাসূল অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেননি। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম কোন অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করে নমরুদের অনল কুন্ড নির্বাপিত করেননি।

কিন্তু তিনি তা জীবনের চরম মুহূর্তেও প্রদর্শন করেননি। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো তবুও তিনি কোন ক্ষমতা প্রদর্শন করেননি। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদর্শন করলেন তাঁর অসীম ক্ষমতা। আগুনকে রূপান্তরিত করলেন ফুল বাগানে। হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামকে নবুয়্যাত দান করেই বলে দেয়া হয়েছিল, তোমাকে দুটো নিদর্শন দেয়া হলো, প্রয়োজনে তা প্রদর্শন করবে। প্রয়োজনের সময় তিনি তা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর হাতের লাঠি ছেড়ে দিলেই বিশাল আকারের সাপ হয়ে যেত। তা আবার হাত দিয়ে ধরলেই পূর্বের ন্যায় লাঠিতে পরিণত হত। পক্ষান্তরে এসব দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা দেয়া

হয়েছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে। তিনি ইচ্ছা করলে দিনে শত সহস্রবার অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করে মক্কার কাফিরদেরকে সম্মোহিত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ ইসলামী কার্যক্রমের ধারা এ সমস্ত ব্যবস্থার বিপরীত।

মোযেযা প্রদর্শনের জন্য পাঁচটি শর্ত অপরিহার্য। এই পাঁচটি শর্ত পূরণ না হলে তা মোযেযা বলে বিবেচিত হবে না। তা হবে যাদু এবং তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়না। মোযেযা প্রদর্শনের প্রথম শর্ত হলো, মোযেযা এমন হতে হবে যে, তা একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো প্রদর্শনের সাধ্য নেই। দ্বিতীয়ত মোযেযা প্রচলিত নিয়ম বা অভ্যাসের বিপরীত হতে হবে। কেউ যদি দাবী করে যে, রাতের পরে দিন নিয়ে আসা আমার মোযেযা– তাহলে তা মোযেযা হবে না। যদিও মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তা পারে না। আর এটা মোযেযা এ কারণেও হবে না যে, তা প্রচলিত নিয়মের বিপরীত নয়। তৃতীয়ত নবী বা রাসূল পদের দাবীদার এ দাবী করবেন যে, তাঁর আবেদনে মহান আল্লাহ মোযেযা দেখাবেন। চতুর্থত নবী বা রাসূলের দাবীদার ব্যক্তির দাবীর সমর্থক হতে হবে যে, যেন তিনি তাঁর নবুয়্যাতের দাবীর প্রমাণ পেশ করতে পারেন। পঞ্চমত নবী এবং রাসূল যে মোযেযা প্রদর্শন করবেন, তাঁর অনুরূপ মোযেযা কিয়ামত পর্যন্ত সাধারণ কোন মানুষ প্রদর্শন করতে পারবে না এবং কি কারণে এমন ঘটলো তার ব্যাখ্যা কোন মানুষ করতে পারবে না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মোযেযা হতে হবে মহাসত্যের পক্ষে। অকারণে কোন মোযেযা প্রদর্শন করা হয়নি। মানুষ যখন সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়নি, তখনই মোযেযার প্রয়োজন হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবনের সবচেয়ে বড় মোযেযা হলো পবিত্র কোরআন। বর্তমান পৃথিবীতেও গবেষকগণ স্বীকার করেছেন, পবিত্র কোরআনের থেকে বড় অলৌকিক বস্তু দ্বিতীয়টি আর নেই। মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তি এ মোযযা গ্রহণ করে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। তাদের সামনে মোযেযা ছিল স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। একটা নোংরা পরিবেশে জীবনের ৪০ টি বছর অতিবাহিত করলেন, অথচ নোংরামীর সামান্য স্পর্শ তাঁর পবিত্র শরীর স্পর্শ করলো না। এটাই তো ছিল মক্কার কাফিরদের কাছে তাঁর বড় মোযেযা। এ মোযেযা গ্রহণ করলেই তো তাদের কাছে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা পরিষ্কার হয়ে যেত।

আল্লাহর রাসূলের কাছে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয় এবং সে কোরআন শুনলে তাদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, এটাই ছিল বড় মোযেযা। কিন্তু সন্দেহ আর অবিশ্বাস যদি মানুষের মন-মস্তিষ্ক গ্রাস করে রাখে, তাহলে সেখানে বিশ্বাস আপন ঘর কি করে প্রস্তুত করবে? সত্য গ্রহণ করতে হলে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির প্রয়োগ প্রয়োজন। এগুলো প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েই মানুষ অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর দাবী করে। মক্কার কিছু সংখ্যক কাফির ছিল, যারা ছিল অধিকাংশই সমাজের নেতা, তাঁরা জানতো যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর রাসূল। কিন্তু তাঁকে স্বীকৃতি দিলে নিজেদের নেতৃত্ব শেষ হয়ে যায়। এ কারণে তাঁরা সত্যকে স্বীকৃতি দেয়নি। আরেকটি শ্রেণী ছিল যারা তাদের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতো না, চিন্তা করে দেখতো না কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। তখনই তাঁরা দাবী করতো, তুমি যদি সত্যই নবী হও তাহলে অসম্ভব ধরণের একটা কিছু ঘটিয়ে দেখাও।

কিন্তু এই ধরণের দাবী উত্থাপনকারী দলটি ছিল সত্য অনুধাবনকারী নেতাদের অধীন। নেতারা মোযেযা দেখেও তাদেরকে বলতো, ওটা ছিল স্পষ্ট যাদু, সে একজন নবী নয়, যাদুকর। প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের দৃষ্টির সামনে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা ঘটছে, এসব দেখেও যারা সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাঁরা মোযেযা দেখেও ঈমান আনবে না। একটি মানুষের সৃষ্টি কি অলৌকিক বিষয় নয়? সামান্য এক কোটা অপবিত্র পানি থেকে কিভাবে একটা পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর জন্ম হচ্ছে। ভ্রূণ কি জিনিষ তা চোখে দেখাও যায় না কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া। ঐ ভ্রূণের ভেতরে কোথায় থাকে ভ্রূণের অধিকারীর স্বভাব চরিত্র, কথা বলার ভঙ্গী, হাঁটার ভঙ্গী, খাওয়ার অভ্যাস এক কথায় পিতা-মাতার সমস্ত কিছুই ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয় শিশুর মধ্যে। এসব কি অলৌকিক বিষয় নয়? এসব নিয়ে যারা চিন্তা গবেষণা করেও মহাসত্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তাঁরা কোন মোযেযা দেখেও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে না, তাঁরা রাসূলকে বিশ্বাস করবে না।

নবীজীর জীবনে মোযেযা বা অভিভূতকারী ঘটনা অসংখ্য ঘটেছে। তবে আকাশের চাঁদ দু'টুকরো করার ঘটনা ভিন্নধর্মী। এই ঘটনা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ করেছেন। সূরা আল ক্বামারে বলা হয়েছে–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ –وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا

وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ - وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ -

কিয়ামত অতি আসন্ন এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই লোকদের অবস্থা এই যে,- কোন স্পষ্ট প্রকট নিদর্শন দেখলেও এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো পূর্ব থেকেই চলে আসা যাদু। এরা (এই চাঁদ দ্বি-খন্ডিত করার ঘটনা) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে এবং নিজের নফসের দাসত্বে নিমজ্জিত রয়েছে। প্রতিটি ব্যাপারকে অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। (সূরা ক্বামার-১,২,৩)

এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহর দরবারে আদালতে আখিরাতে দন্ডায়মান হবে, এ কথা বর্তমানে যেমন কিছু মানুষ অবিশ্বাস করছে সে সময়েও কিছু মানুষ অবিশ্বাস করতো। কিয়ামত ঘটবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল এ সম্পর্কে কাফির নেতৃবৃন্দ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাবী করতো। কিয়ামত যে মুহূর্তের ভেতরে সংঘটিত হতে পারে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে প্রকৃতই রাসূল এ কথা তাদেরকে বুঝানোর জন্য চাঁদ দ্বি-খন্ডিত করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। বিভিন্ন ইতিহাসে এই ঘটনা প্রমাণসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরাইশরা তাদের প্রবর্তিত পদ্ধতিতে হজ্জ আদায়ের জন্য মিনায় অবস্থান করতো। চাঁদ দ্বি-খন্ডিত হবার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল জিলহজ্জ মাসের বার বা তের তারিখে। তখন নবুয়্যাতের সাত বছর চলছিল। সে সময় মক্কার কাফির নেতৃবৃন্দ সেখানে হজ্জ উপলক্ষে একত্রিত হত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই সময়ে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য মিনায় উপস্থিত হয়েছিলেন। ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দ তাঁর কাছে দাবী করেছিল কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাদের সামনে প্রদর্শন করার জন্য। তাঁকে চাঁদ দু'টুকরো করে তাদেরকে দেখাতে হবে। যদি তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে, এ আশায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের সে দাবী গ্রহণ করলেন। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন এবং নিজের ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলী দিয়ে আকাশের চাঁদের প্রতি ইশারা করেছিলেন। মুহূর্ত কাল বিলম্ব হলো না, চাঁদ দু'টুকরা হয়ে দু'দিকে সরে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকদেরকে বললেন– দেখে নাও।

কিন্তু যারা মহাসত্য গ্রহণ করবে না, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে যাদের নেতৃত্ব থাকবে না, এই আদর্শের ভেতরে যারা নিজেদের স্বার্থের মৃত্যু দেখতে পায়, তাঁরা শুধু চাঁদ নয়–গোটা আকাশ দ্বি-খন্ডিত হতে দেখলেও সত্য গ্রহণ করবে না। সেদিনও করেনি বর্তমানেও করবে না। বর্তমানে নবী নেই এবং কিয়ামত পর্যন্তও কোন নবী আর আসবে না। কিন্তু মোযেযা তো বন্ধ নেই। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতি মুহূর্তে অলৌকিক ঘটনা ঘটেই চলেছে। দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান জগৎ-আকাশ মন্ডলী, নদী মহাসাগর ইত্যাদীর দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই শত কোটি মোযেযা দেখা যায়। বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো মহান আল্লাহর মোযেযা পরিপূর্ণ। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের তো দৃষ্টি খুলছে না।

ইতিহাসে দেখা যায় সেদিন চাঁদের খন্ডিত দুটো অংশ দু'দিকে এতটা সরে গিয়েছিল যে, মাঝখান দিয়ে হেরার পাহাড় দৃষ্টি গোচর হচ্ছিল। কিছু সময় খন্ডিত থেকে পুনরায় চাঁদ একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রাসূলের সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদসহ আরো কয়েকজন সাহাবী তখন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং সে সমস্ত বর্ণনা হাদীস ও ইতিহাসে দেদিপ্যমান রয়েছে। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে অবিশ্বাসীর দল মন্তব্য করেছিল, আমাদের ওপর যাদু করা হয়েছে। ঘটনাটি সম্পর্কে কাফিরদের মধ্যেই দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছিল। তর্কবিতর্ক হয়েছিল, যাদুই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ভেতরে গুটি কয়েক মানুষের ওপরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যাদু করতে পারে। গোটা পৃথিবীর সমস্ত লোকগুলোর ওপর তো তিনি যাদু করতে পারেন না। সুতরাং মক্কার বাইরে যারা অবস্থান করছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হোক, তাঁরাও চাঁদ দ্বি-খন্ডিত হতে দেখেছে কিনা।

সে সময়ে পৃথিবীর অনেক স্থানের মানুষের চোখেই ঘটনাটি পরিলক্ষিত হয়েছিল বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। চাঁদ দ্বি-খন্ডিত হবার ঘটনা ভারতীয় উপমহাদেশেও দৃষ্টি গোচর হয়েছিল। এ ঘটনা মালাবারে দৃষ্টি গোচর হয়েছিল এবং তা সে সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। চাঁদের ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষ যে সমস্ত অভিযান পরিচালনা করেছে, চন্দ্র পৃষ্ঠের যে সমস্ত ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে, আড়াআড়িভাবে চাঁদকে পরিবেষ্টনকারী একটা অগভীর রেখা শুকনো সরোবরের রেখার মত দেখা যায়। এই রেখার আবিষ্কারকের নাম অনুসারে ঐ

রেখাটির নাম দেয়া হয়েছে, হেরিকস ক্যানাল। বর্তমান শতব্দীর বিখ্যাত গবেষক মরিস বুকাইলী কর্তৃক লিখিত কদণ ঈধঠফণ´দণ লৈরড্ডটভ টভঢ ওডধণভডণ নামক গ্রন্থে চন্দ্র মানবের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। নভোচারীদের অনেকেই চাঁদের সেই ফাটলকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সময়ে চাঁদ দ্বি-খন্ডিত করার পরে ঘটিত এবং মধ্যাকর্ষণ জনিত কারণে পুনরেকত্রিকরণের রেখা বলে বর্ণনা করেছেন। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় ইতিহাসের প্রফেসর ব্রুস লরেন্স ১৯৮৯ সালে Defenders of God the fundementalist revolt against the modern age নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, নীল আর্মষ্ট্রং চন্দ্রে অবতরণের পরে এক অশ্রুতপূর্ব ঋর্ডধড শব্দ শুনতে পান। সে শব্দের উৎস সম্পর্কে তিনি সামান্যতম ধারণা করতে সক্ষম হননি। পৃথিবীতে এসে অভিজ্ঞতা বর্ণনার সময়ও তিনি তা বর্ণনা করতে সক্ষম হননি। পক্ষান্তরে সে ঘটনাটি তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল। এরপর তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে বের হন। তিনি মিশরে কায়রো নগরীতে অবস্থান করার সময় ঐ শব্দ পুনরায় শুনতে পেয়ে সে শব্দের উৎস সম্পর্কে একজনকে জিজ্ঞাসা করেন। তাকে জানানো হয় এ শব্দ শোনা যাচ্ছে মসজিদ থেকে। এটা আজানের শব্দ। এ ঘটনার পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

চাঁদ দ্বি-খন্ডত হবার পরে তা গোটা বিশ্বের সব স্থান থেকে দেখতে পাবার কথা নয়। কেননা, সময়ের ব্যবধানের কারণেই তা সম্ভব ছিল না। গোটা পৃথিবীতে সূর্য যেমন একই সময়ে দেখা যায় না চাঁদও তেমনি একই সময়ে দেখা যায় না। পৃথিবীর এক দেশে যখন সকাল আটটা সে সময় আরেক দেশে সন্ধা ছয়টা। আর গোটা পৃথিবীতেই দেখা গিয়েছিল কিনা এবং তার নমুনা দেখে কোন নভোচারী মুসলমান হলো কিনা তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা এ সম্পর্কে স্পষ্ট কথা বলতে চাই যে, চাঁদ দ্বিখন্ডিত করার ঘটনা ছিল মক্কাবাসীদের প্রত্যাশিত চেতনার উত্তরে মহান আল্লাহর একটা স্পষ্ট নিদর্শন। যারা অস্বীকার করতো তাদের সামনে তাদেরই দাবী অনুযায়ী প্রামাণ্য নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা রয়েছে হাদীসে যে, দ্বি-খন্ডিত চাঁদ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছিল।

চাঁদ সত্যিকার অর্থে দ্বি-খন্ডিত হয়েছিল না অস্বীকারকারীদের চোখে দ্বি-খন্ডিত দেখা গিয়েছিল আমাদের কাছে প্রশ্ন সেটা নয়। আমাদের কাছে একটিই প্রশ্ন, রাসূলের এই মোযেযা সম্পর্কে অবিশ্বাস সৃষ্টি হবার কারণ কি? মানুষের সহজাত

স্বভাব বিরোধী কোন নিদর্শন মানুষের দৃষ্টিশক্তির সামনে উপস্থিত করতে বা কোন বস্তুর পরিবর্তন সাধন করতে মহান আল্লাহ সক্ষম এবং এই সক্ষমতার স্পষ্ট প্রমাণ স্বরূপ আকাশের চাঁদকে দ্বি-খন্ডিত করে অস্বীকারকারীদের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন। তখনকার পরিস্থিতিতে এটাই ছিল মক্কার অবিশ্বাসীদের জন্য উপযুক্ত প্রমাণ। হয়তঃ এ কারণে গোটা বিশ্বের সামনে চাঁদ দ্বি-খন্ডিত করে দেখানোর কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। তাছাড়া তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয়, মক্কা ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে দ্বি-খন্ডিত চাঁদ দেখা যায়নি, তাহলে সে কারণে এত গবেষণার তো প্রয়োজন নেই। মহা শূন্যের একটি গ্রহ পৃথিবীর একটি দেশ থেকে একখন্ড দেখাচ্ছে আর আরেকটি দেশ থেকে দ্বি-খন্ডিত দেখাচ্ছে, এমন অবস্থাও তো মহান আল্লাহর আরেকটি কুদরত।

চাঁদ দ্বি-খন্ডিত হলে শুধু মক্কা নয়, পৃথিবীর নানা দেশ থেকে দেখা যেত–তা যখন দেখা যায়নি অতএব চাঁদ দ্বি-খন্ডিত হবার ঘটনা সত্য নয়। এ মন্তব্য যারা করেন তাদের একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সাধারণভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যদি চাঁদকে সে সময়ে দ্বি-খন্ডিত দেখা যেত, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এই বিশাল মোযেযাকে মানুষ ভাবতো, এটা সৌর মন্ডলের পরিবর্তন এবং বিপ্লবাত্মক কর্মকান্ডের একটি ঘটনা। কেননা, পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে অগণিত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৌরজগতে ঘটেছে, বর্তমানে ঘটছে এবং আগামীতেও ঘটবে। সুতরাং ঘটনা এমনও হতে পারে যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর এই মোযেযাকে কোন মানুষের দৃষ্টিতে ছোট করতে আগ্রহী ছিলেন না। আর আল্লাহর রাসূল ও গোটা পৃথিবীর মানুষের সাথে সেই একই সময়ে তাঁর নবুয়্যাতের সততা এবং ইসলাম নিয়ে বিতর্কও অনুষ্ঠিত হচ্ছিল না এবং গোটা পৃথিবীর মানুষও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে চাঁদ দ্বি-খন্ডিত অবস্থায় দেখতে চায়নি। যাদের সাথে বিতর্ক হচ্ছিল এবং যারা সে মোযেযা দাবী করেছিল, তাদেরকে দেখানোই ছিল যুক্তিযুক্ত।

অবরোধ আরোপ-অবরুদ্ধ জীবন

রাত যত গভীর হয় প্রজ্জ্বলিত সূর্যের আগমন তত দ্রুত হয়। বন্ধন যত দৃঢ় হয় বন্ধন ছেঁড়ার তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পায়। মহাসত্যের সম্মুখে বাধার বিন্ধ্যাচল দাঁড় করিয়ে দিলে সত্যের প্রচন্ড স্রোতে তা বালিয়াড়ীর মতই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। স্বৈরাচারীর

প্রচন্ড দাপটে আন্দোলন সাময়িকভাবে থমকে দাঁড়ায় কিন্তু তার বিস্তৃতি রোধ করা যায় না। সময়ান্তরে অধিক শক্তিসহ আবির্ভূত হয়ে মুহূর্তে মিথ্যার সমাধী দিয়ে তার ওপরে সে বিজয় কেতন উড়িয়ে দেয়। গোটা পৃথিবীর এটাই চিরন্তন নীতি। গোটা পৃথিবীর এটাই ইতিহাস। শক্তি প্রয়োগ করে কোথাও সত্য অবদমিত করা যায়নি। আপন প্রভায় সে প্রোজ্জল হয়ে উঠেছে। মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর ধারণা ছিল শক্তি প্রয়োগ করে তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আন্দোলনকে ধরা পৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সত্যের চিরন্তন নীতি হলো শক্তি প্রয়োগ করা হলে তা বিস্ফোরিত হয়। মক্কাতেও তাই ঘটলো, শক্তি প্রয়োগ করার সাথে সাথেই আলোর দ্যুতির মতই দিন মজুরের জীর্ণ কুটির থেকে মহাসত্য আরবের দুর্দান্ত প্রতাপশালী নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় দূর্গ পর্যন্ত পৌছে গেল।

মক্কার ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দের আপন ঘরেই ইসলামের রক্ষক প্রস্তুত হলো। বড়বড় নেতাদের আপন সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। শুরু থেকে এত বাধা এত প্রতিরোধ, লোমহর্ষক নির্যাতনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রবল গতিতে ইসলাম তার আপন লক্ষ্য পানে দুর্বার বেগে অগ্রসর হচ্ছিল। মক্কার দুই প্রধান বীর হযরত হামজা ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম ইসলাম কবুল করে ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁরা মিথ্যার ভ্রুকুটির মাথায় ঘৃণাভরে পদাঘাত করে বজ্রনিনাদে মহাসত্যের ধ্বনি দূলোক-ভূলোকে পৌছে দিয়ে মিছিল করে আল্লাহর ঘর কা'বায় উপস্থিত হয়ে মহান আল্লাহর কুদরতির পদপ্রান্তে সিজদায় অবনত হয়েছিল। মক্কার ঘরে ঘরে ইসলামী আদর্শের অনুশীলন হচ্ছে। মক্কার বাতাসে অনুরণিত হচ্ছে তাওহীদের অপরাজিত গুঞ্জন। আবিসিনিয়ার শাসক পর্যন্ত কোরআনের বাণীতে ও মুসলিম চরিত্রে মুগ্ধ। ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দের বদ্ধ ঘরের দরজায় মহাসত্যের প্রবল স্রোত আছড়ে পড়ছে। প্রতি মুহূর্তে বদ্ধ অর্গল উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য দরজায় করাঘাত করছে। মিথ্যা শক্তির জগতে অস্ত যাচ্ছে সূর্য, নেমে আসছে ঘন নিকষ কালো অন্ধকার।

সুতরাং প্রচন্ড আঘাত হানার এটাই উপযুক্ত সময়। আর মুহূর্তকাল দেরী করলেই তাঁরা মৃত্যুর ঘন্টা শুনতে বাধ্য হবে। সুতরাং এবার মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে হবে। তাঁরা দ্রুত একটা বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। মক্কার সমস্ত গোত্র সে বৈঠকে উপস্থিত হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রতি যারা সহানুভূতিশীল তাদের বিরুদ্ধে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। বনী হাশিম এবং

বনী আবদিল মুত্তালিব বংশ ছিল আল্লাহর রাসূলের প্রতি সহানুভূতিশীল। সুতরাং এই দুই গোত্রের মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই অন্যান্য গোত্রের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। কারণ অন্যান্য গোত্র এই দুই গোত্রের কাছে দাবী করেছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আমাদের হাতে উঠিয়ে দেয়া হোক, আকে আমরা হত্যা করি। তাহলে তাঁর ইসলামের বিপ্লবী কার্যক্রম এমনিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সে দাবী ঐ দুই গোত্র গ্রহণ করেনি। করলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মিশন আজ এতদূর বিস্তৃতি লাভ করতে পারতোনা।

তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ঐ দুই গোত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক ঘৃণ্য চুক্তিনামা প্রস্তুত করলো। সে চুক্তিতে লিখিত ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বনী হাশিম এবং বনী আবদিল মুত্তালিবের সাহায্য সহযোগিতায় কুরাশদেরই শুধু নয়–গোটা মক্কার জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে। পক্ষান্তরে তাকে হত্যাও করা যায়নি। ইসলামী আদর্শ বিজয়ী হলে মক্কার সমস্ত গোত্রের সম্মান মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হবে। এই ধরণের অনাকাংখিত অবস্থায় তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, বনী হাশিম এবং বনী আবদিল মুত্তালিবের মুসলিম এবং অমুসলিম কারো সাথেই কোন রূপ সম্পর্ক রক্ষা করা যাবে না। তাদের সাথে বিয়ে, ব্যবসা, ধার দেনা, কোন রূপ সাহায্য সহযোগিতার সম্পর্ক, কথা-বার্তার সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক তথা কোন ধরণের সম্পর্ক তাদের সাথে রক্ষা করা যাবে না। কেউ তাদেরকে খাদ্য বা পানীয় দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না। কেউ যদি তা করে, গোপনেও কেউ যদি তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে তাহলে তাকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সমস্ত গোত্রের পক্ষ থেকে এই চুক্তিপত্র লিখে তা কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। চুক্তিপত্র লিখেছিল মনসুর ইবনে আকরামা। যে হাত দিয়ে সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে চুক্তিপত্র লিখেছিল, মহান আল্লাহ সে হাতের শাস্তিও তাকে দিয়েছিলেন। তার হাতের আঙ্গুলে পক্ষাঘাত হয়েছিল। আল্লাহর রাসূলের বংশের আবু লাহাব ও তার পরিবার ছিল এই চুক্তির আওতার বাইরে। কারণ সে স্বয়ং ঐ ঘৃণ্য চুক্তি সম্পাদনকারীদের পক্ষে ছিল। যাদের বিরুদ্ধে চুক্তি করা হয়েছিল এই চুক্তির ফলে তাঁরা কি যে অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে মর্মান্তিক কাহিনী পাঠ করলে

পাষাণ হৃদয়েও করুণার জোয়ার জাগে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই চুক্তির কারণে শুধু আল্লাহর নবী এবং মুসলমানরাই দুঃসহ অবস্থার ভেতরে নিপতিত হয়নি। তখন পর্যন্ত ঐ দুই গোত্রের একটি বিরাট জনগোষ্ঠী ইসলাম কবুল করেনি, তাঁরাও বর্ণনাতীত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। মুসলমানদের সাথে সাথে তাঁরাও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অনাহারে থেকেছে, গাছের পাতা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের শিশুগণও মুসলিম শিশুদের সাথে ক্ষুধার যন্ত্রণায় আকাশ বাতাস দীর্ণ বিদীর্ণ করে আর্তনাদ করেছে। মহান আল্লাহর কি অসীম রহমত, তাঁরা তাদের দৃষ্টির সামনে দেখেছে, তাদেরই কলিজার টুকরা সন্তান প্রচন্ড ক্ষুধার যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আর্তচিৎকার করছে। চিকিৎসার অভাবে রোগ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। পানির অভাবে বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বস্ত্রের অভাবে উলঙ্গ থাকতে বাধ্য হচ্ছে। নিজেদের পেটেও ক্ষুধার দানব হুংকার দিচ্ছে। কষ্টার্জিত সহায়-সম্পদ বাড়ি ঘর পশুপাল সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ সব তাঁরা নিজ দৃষ্টির সামনে দেখছিল।

কিন্তু তাদের ভেতরে কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। যে মুসলমান, ইসলাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কেন্দ্র করে তাদের আজ এই দুরবস্থা, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। একটি বারও তাদের মনে এ কল্পনাও আসেনি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অন্যান্য গোত্রের হাতে সমর্পণ করলেই তাঁরা এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে। তাদের কলিজার টুকরা শিশু সন্তানগুলো পেট পুরে খাদ্য পেতে পারে। সমস্ত সহায় সম্পদ রক্ষা পেতে পারে। মহান আল্লাহর অসীম কুদরত যে, এই অমুসলিম জনগোষ্ঠী যে কোন ধরণের মর্মান্তিক যন্ত্রণা হাসি মুখে বরণ করেছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে। ইউরোপের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী লেখকদের অন্ধ দৃষ্টিতে এ সমস্ত বিবরণ পড়েনি পড়বেও না। তাঁরা পেঁচার মত অন্ধকারের অধিবাসী। আলোকচ্ছটা দেখলেই যারা অন্ধকার গুহায় বসে মরণ চিৎকার ছাড়ে। ইউরোপীয় ইসলাম বিদ্বেষী লেখকদের চোখে সত্যের আলো সহ্য হয়নি বোধ করি তাঁরা স্বয়ং ধ্বংস হবার পূর্ব পর্যন্ত সহ্য হবেও না।

আল্লাহর রাসূলের পক্ষের দুই গোত্র অবরোধের কবলে পতিত হবার পরে তাঁরা দ্রুত বৈঠক করলেন। সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, শহরে এই অবস্থায় বাস করতে থাকলে কোনক্রমেই তাঁরা পরিস্থিতির মোকাবেলা

করতে পারবেন না। সূতরাং অন্য কোথাও যেয়ে অবস্থান করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করা যাবে না, এতে কষ্ট বৃদ্ধি পাবে। ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁরা শিয়াবে আবি তালিবে গিয়ে অবস্থান করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলো। শিয়াবে আবি তালিব নামক জায়গাটা ছিল মক্কার একটা পাহাড়ের এলাকা। সেখানে বনী হাশিমের লোকজন বসবাস করতো। এলাকাটি ছিল সমস্ত দিক থেকে সুরক্ষিত পাহাড়ি দূর্গের মত। তাদের ধারণা ছিল, এখানে থাকলে তাঁরা বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এ ঘটনা ছিল নবুয়্যাত লাভের সাত বছরের সময় মহরম মাসে। ঐ দুই গোত্রের মুসলিম অমুসলিম সবাই আল্লাহর রাসূলের সাথে এই দুঃসহ অবস্থা হাসি মুখে বরণ করে নিলেন। এই ধরণের বিপদ যে আসবে তা ঐ দুই গোত্র উপলব্ধি করতে পারেনি। বিপদ ছিল আকস্মিক। এ কারণে তাঁরা প্রস্তুতি গ্রহণের কোন সুযোগ পায়নি। তাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য যা ছিল তাই নিয়ে তাঁরা পাহাড়ের ঐ দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সামান্য কয়েক দিনের ভেতরেই তাদের সমস্ত খাদ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর তখনই বিপদ মূর্তিমান আকার ধারণ করেছিল। একটি দুটো দিন নয়–দীর্ঘ তিনটি বছর অনাহারে চরম কষ্টের ভেতরে তাদেরকে ঐ শিয়াবে আবি তালিবে বন্দী জীবন-যাপন করতে হয়েছিল।

ইউরোপের ইসলাম বিদ্বেষী লেখকগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাতা-পিতাহারা বাল্য ও কিশোর জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, চাচা আবু তালিব তাঁকে চরম অবহেলায় অযত্নে রাখতেন। তাঁকে বাড়ির চাকরের মতই রাখতেন এবং তাঁর ওপরে নানা ধরণের অত্যাচার করতেন। তাদের কথা যে কতবড় মিথ্যা তা আল্লাহর রাসূলের বিপ্লবী জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আরেকবার প্রমাণীত হয়ে যায়। আল্লাহর নবীর কারণে আবু তালিব কি অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, শুধু তিনিই নয়–তাঁর সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আরো সাতজন চাচা, যারা নবীর আপন দাদীর সন্তান ছিলেন না, ফুফুগণ, চাচীগণ, চাচাত ফুফাত ভাইবোনগণ এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনগণ, তাঁরাও নবীর কারণে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তা কল্পনাও করা যায় না।

এদের মধ্যে একটি বিরাট জনগোষ্ঠী ছিল যারা ইসলামের কারণে কষ্ট স্বীকার করেননি, কষ্ট করেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর নবীর প্রতি মমতার কারণে। এ সমস্ত ঘটনা বর্তমানে ইতিহাসে জীবিত থাকার পরেও ইউরোপের ইসলাম বিদ্বেষী

লেখকরা কি করে লিখলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বাল্যকালে চাকরের মত রেখেছেন, ঠিকমত পেটভরে খেতে দেননি, তাঁর ওপরে সীমাহীন নির্যাতন চালিয়েছেন? ইউরোপের ইসলাম বিদ্বেষী লেখকরা তাদের দেহের লজ্জার আবরণ যখন ছুড়ে ফেলে মাতা, পিতা, সন্তান, ভাই, বোন একসাথে উলঙ্গ হয়ে সমুদ্র স্নান করতে পারেন, প্রকাশ্যে যৌনকর্ম করতে পারেন, তখন তাঁরা শুধু লেখনীর ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকেই যে লজ্জা নামক বৃক্ষকে সমূলে উপ্‌ড়ে ফেলবেন এতে অবাক হবার কিছুই নেই।

বন্দী জীবনের যে কি যন্ত্রণা তা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সময়ে তাঁরা নিম গাছের পাতা খেয়ে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন। পশুর শুকনো চামড়া তাঁরা আগুনে সিদ্ধ করে খেয়েছেন। মা খেতে পারেননি, ফলে তাদের বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছে, সন্তান দুধ না পেয়ে করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করেছে। গিরি দূর্গে শিশু কিশোরগণ প্রচন্ড ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আর্ত চিৎকার করেছে আর তাদের চিৎকার শুনে ইসলাম বিরোধিরা অট্টহাসি হেসেছে।

সাহাবায়ে কেরাম বলেন, গাছের পাতা তাঁরা খেয়েছেন। ফলে তাদের মল পশুর মলের মত হয়ে গিয়েছিল। হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আরোপিত অবরোধের আওতায় ছিলেন না। তবুও তিনি আল্লাহর রাসূলের মমতার খাতিরে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেন, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একদিন খাদ্যের সন্ধানে বের হলাম। কোথাও কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না। পশুর এক টুকরা চামড়া কুড়িয়ে পেলাম। তাই এনে আগুনে সিদ্ধ করে আমরা আহার করলাম।

কোন দিক থেকে কেউ যেন গিরিদূর্গে কোন সাহায্য প্রেরণ করতে না পারে এ জন্য ইসলাম বিরোধী শক্তি যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছিল। তারা পালা করে গিরিদূর্গের প্রবেশ পথসমূহে প্রহরার ব্যবস্থা করেছিল। কোন লোক যদি গিরিদূর্গ থেকে বাইরে এসে কোন জিনিস ক্রয় করার জন্য মূল্য নির্ধারণ করতো তাহলে ঠিক তখনই ইসলাম বিরোধিরা অধিক মূল্য প্রদান করে সে দ্রব্য ক্রয় করে নিত। কোন সময়ে দূর্গের ভেতর থেকে কোন ব্যক্তি বাইরে এলে তাকে প্রহার করে রক্তাক্ত করা হত। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা যিনি মায়ের গর্ভ হতে এই পৃথিবীতে

এসে কোনদিন অভাব শব্দের সাথে পরিচিত হননি। দিনের পর দিন তাঁকে অনাহারে থাকতে হয়েছে। ক্ষুধার যন্ত্রণা তিনি হাসি মুখে সহ্য করলেও তাঁর ভেতরটা নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। অবরোধ জীবনের অবসানের পরেই এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিবের ভেতরে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ক্ষুধার দানব আল্লাহর রাসূলের এই দুই পরম প্রিয়জন চাচা আবু তালিব আর জীবন সাথি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে নিঃশেষে কুরে কুরে খেয়ে মৃত্যুর ওপারে প্রেরণ করেছিল।

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার ভাইয়ের সন্তান আপন ফুফুর অবস্থার কথা চিন্তা করে একদিন গভীর রাতে এক বস্তা গম চাকরের মাথায় দিয়ে গোপনে গিরিদূর্গের দিকে গেলেন। কোন মতে এগুলো পৌঁছে দিতে পারলে তাঁরা পেটের ক্ষুধা কিছুটা নিবৃত্তি করতে পারবেন। গিরিদূর্গের কাছাকাছি পৌঁছতেই আবু জেহেল তাকে ঝাপটে ধরে চিৎকার করে বললো, বিশ্বাসঘাতক! তাহলে এই দেশদ্রোহীদের এইভাবেই সাহায্য করিস? তিনি বললেন, এই খাদ্য আমার ফুফু খাদিজার। তিনি আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। তাঁর খাদ্য তাঁকে ফেরৎ দিচ্ছি, এতে কার কি বলার থাকতে পারে? আবু জেহেলের চিৎকারে বেশ কিছু লোক জড় হলো। এদের ভেতর আবুল বাখতারী নামক একজন ছিল। তার মন ছিল নরম প্রকৃতির। সে প্রতিবাদ করে আবু জেহেলকে বললো, হাকিম তাঁর ফুফুর জিনিস ফেরৎ দিতে যাচ্ছে এতে তুমি তাকে বাধা দিচ্ছ কেন?

আবু জেহেল তখন আবুল বাখতারীকে অশালীন ভাষায় গালাগালি শুরু করলো। আবুল বাখতারী তা সহ্য করতে না পেরে উটের হাড় উঠিয়ে আবু জেহেলের মাথায় আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দিল। একটি মহৎ আদর্শের কারণে এতগুলো নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবককে এভাবে অমানবিক কষ্ট দেয়া হচ্ছে—ব্যাপারটা ক্রমশঃ অধিকাংশ মানুষের মনে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করলো। ফলে খোদ বিরোধিদের মধ্যেই ফাটল সৃষ্টি হলো। এদিকে আরবে যে চারটি মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ নরহত্যা বা কোন ধরণের ঝগড়া নিষিদ্ধ ছিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেই নিষিদ্ধ চার মাসকে কাজে লাগালেন। হজ্জের সময়ে তিনি বের হয়ে আগত মানুষের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দিতেন। ফলে আরবের বাইরের লোকজনের ভেতরে জানাজানি হয়ে গেল মক্কার গুটি কয়েক স্বৈরাচারী নেতা নির্দোষ মানুষদেরকে কিভাবে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য করছে।

সত্যের পক্ষে যারা কাজ করে; আন্দোলন করে তাদের এই একটা সুবিধা যে, তাদের ওপরে নির্যাতন যত তীব্র হয় ততই তাদের দিকে সাধারণ মানুষের সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে। মক্কাতেও তাই ঘটলো। যাদের ওপরে নির্যাতন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তাদের শুভাকাংখী এবং আত্মীয় পরিচিত মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। তাঁরা আত্মসমালোচনা করে দেখলো, গিরিদূর্গে যারা বন্দী অবস্থায় অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের অপরাধ কি? তাঁরা যখন অনুধাবন করলো এই মানুষগুলোর কোনই অপরাধ নেই, তখন তাঁরা ঐ চুক্তির প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। মহান আল্লাহ এমনই ব্যবস্থা করলেন যে, যারা এক সময় চুক্তির প্রতি সমর্থন করেছিল, তাঁরাই এই চুক্তি ভেঙ্গে দেয়ার লক্ষ্যে গোপনে আন্দোলন গড়ে তুললো।

তারা একসমাবেশে বললো, মক্কার অধিবাসীগণ ! আমরা পেটভরে আহার করছি, তৃষ্ণায় আকণ্ঠ পানি পান করছি। আমাদের সন্তান সন্ততিগণ ফূর্তিতে আছে। ওদিকে বনী হাশিম এবং বনী আবদিল মুত্তালিবগণ কি অবস্থায় তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করছে তা কি আমরা অনুভব করেছি? তাদের সাথে কেউ কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না এটা চলতে দেয়া হবে না। মহান আল্লাহর শপথ! আমরা এমন চুক্তি মানিনা, যে চুক্তির বলে মানুষ অত্যাচাচিত হয়। এই চুক্তি আমরা অবশ্যই ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলবো। আবু জেহেল প্রতিবাদ করে বললো, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, ঐ চুক্তি বাতিল করা হবে না। চুক্তির প্রতি বিদ্রোহী দল সমস্বরে তীব্র প্রতিবাদ করে বললো, মিথ্যাবাদী তুমি। এই চুক্তি আমরা মানিনা। আমরা আল্লাহর কাছে এই চুক্তির সাথে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে এই চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করছি।

দুই পক্ষে চুক্তি বাতিল বা বহাল রাখা নিয়ে ঝগড়ার সৃষ্টি হলো। ওদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবকে প্রেরণ করেছিলেন গোপন একটা কথা বলে। উভয় দলে যখন মারামারি হবার উপক্রম হলো তখন আবু তালিব এসে বললেন, তোমরা যে চুক্তি করেছো তা আল্লাহর পছন্দ নয়। আমার কথা সত্য না মিথ্যা তা তোমরা প্রমাণ করে দেখতে পারো। তোমরা ঐ চুক্তি পত্র দেখতে পারো। দেখো তা পোকায় খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। আমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কোনরূপ সহযোগিতা করবো না। আর আমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে সমস্ত অবরোধের

অবসান এখানেই ঘটবে। আবু তালিবের কথায় মুহূর্তে সমস্ত কোলাহল থেমে গেল। নেমে এলো অখন্ড নীরবতা। সমস্ত মানুষের বিস্মিত দৃষ্টি আবু তালিবের মুখের ওপরে নিবদ্ধ। ইসলাম বিরোধিদের চেহারায় আতংক দেখা দিল। আবু তালিবের কথা যদি সত্য প্রমাণীত হয় তাহলে এ কথাও প্রমাণ হয়ে যায় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতই আল্লাহর নির্বাচিত রাসূল এবং এতদিন যাবৎ তাঁর সাথে যা করা হয়েছে তা সবই ছিল অন্যায়। শুধু তাই নয়, যাদের ওপরে অত্যাচার করা হয়েছে, যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, যে সমস্ত ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা হয়েছে, যাদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে এখন এ সবের ক্ষতিপূরণও আদায় করতে হবে। ভয়ে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল।

শোক দুঃখের বছর

শিয়াবে আবি তালিবে অনাহারে বন্দী থাকা অবস্থাতেই নবীর চাচা আবু তালিবের ভেতরে জীবনী শক্তি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আরবের বড় ব্যবসায়ী ধনীর দুলাল ছিলেন তিনি। কোন দিন তাঁকে ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে হবে তা বুঝি তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। একদিকে তিনি ছিলেন বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, অপরদিকে অনাহার আর মানসিক যন্ত্রণা চরমভাবে রোগাক্রান্ত করে দিল। বন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়েই তিনি রোগ শয্যায় শায়িত হলেন। তাঁর রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। আরোগ্য হবার কোন আশাই ছিল না। শিয়াবে আবি তালিব থেকে বের হবার পরে মুসলমানদের ওপরে তেমন কোন অত্যাচার হয়নি। এই অত্যাচার না করার কারণ এটাই ছিল, ঝড়ের প্রাক্কালে সমুদ্র শান্ত থাকার মত। মক্কার ইসলামের দুশমনরা ছিল সুযোগের অপেক্ষোয়।

আল্লাহর রাসূলের চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করলেন। এই শোকের সাগর পার হতে না হতেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরেকটি প্রচন্ড ধাক্কা খেলেন। তাঁর দুর্দিনের সাথী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এই পৃথিবী ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। যে নারীর শরীরে অভাবের আঁচড় কোন দিন লাগেনি, সেই নারী তাঁকে স্বামী হিসেবে কবুল করার পরে কতদিনই না অনাহারে থেকেছেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করেছেন।

নেই– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়ার মত কোন মানুষ আর নেই। বড় একা হয়ে গেলেন তিনি। মা হারা ছোট্ট মেয়ে ফাতেমার করুণ মুখের দিকে তাকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বুকের ভেতরটা মর্মযন্ত্রণায় হাহাকার করে উঠতো। কাফিরদের হাতে অত্যাচার সহ্য করে তিনি বাড়িতে আসতেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার মমতাপূর্ণ সান্ত্বনায় তিনি কাফিরদের অত্যাচারের সব ব্যথা বেদনা মুহূর্তে ভুলে যেতেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ করতেন। তিনি নতুন উদ্যোমে তাঁর কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করতেন। এখন আর তাকে কে দেবে সান্ত্বনা! আবু তালিবের মত পরম মমতায় কে বলবে, বাবা, কোন ভয় নেই। কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, আমি আছি তোমার সাথে। এ কথা বলার আর কেউ রইলো না। আর মক্কার কাফিররা অতীতের যে কোন তুলনায় তাঁর ওপরে নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে ছিল এই দু'জন মানুষের অবর্তমানে। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এই বছরকে 'শোক দুঃখের বছর' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

ইতিহাসের কালো অধ্যায়

প্রতিবাদ করার যখন কেউ থাকে না বা প্রতিবাদ করার সাহস যখন কেউ করে না, তখন অপরাধীদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পাবে এটাই স্বাভাবিক। আবু তালিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপরে শারীরিকভাবে অতটা নির্যাতন কেউ করার সাহস পায়নি। আবু তালিব আর পৃথিবীতে নেই, প্রেমময়ী খাদিজাও নেই। কে ছুটে আসবে নবীর পাশে! মক্কার কাফিররা নির্ভীক চিত্তে নবীর ওপরে অত্যাচার শুরু করেদিল। ইসলাম বিরোধীদের ধারণা, এতদিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচার আশ্রয়ে ইসলামী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, এখন তাঁর আশ্রয়দাতা নেই। এবার তাঁর ওপরে নির্যাতন শুরু করলে সে বাধ্য হয়েই এই কার্যক্রম ত্যাগ করবে। এই অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অকারণে অমানবিক আচরণ শুরু করলো। নির্যাতনের নিত্য নতুন পদ্ধতি তাঁরা প্রয়োগ করতে থাকলো নবীজীর ওপর।

তিনি যে পথ দিয়ে কা'বায় আসবেন, সে পথে ময়লা আবর্জনা বা বিষাক্ত কাঁটা বিছিয়ে রাখতো কাফির গোষ্ঠী। তিনি কা'বায় নামাজ আদায় করছেন, তাকে নানাভাবে বিদ্রূপ করা হত। নামাজে সিজদায় গেছেন আল্লাহর নবী, এ সময় তাঁর পবিত্র মাথায় উটের পচা গলিত নাড়ি ভুড়ি চাপিয়ে দেয়া হত। ছোট্ট মেয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পিতার এই অবস্থা দেখে চিৎকার করে কাঁদতেন আর পিতার মাথার ওপর থেকে আবর্জনা সরিয়ে পিতার মাথার ভার মুক্ত করতেন। তিনি নামাজে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর পবিত্র গলায় কাপড় জড়িয়ে দু'দিক থেকে এমনভাবে টেনে ধরা হত যে, তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যেত, তাঁর পবিত্র কণ্ঠে দাগ হয়ে যেত। তিনি বাইরে বের হলেই মক্কার কাফির নেতৃবৃন্দ দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিত। তাঁরা নবীজীর পেছনে পেছনে যেত আর তাঁকে বিদ্রূপ করতো।

তিনি নামাজে উচ্চ কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করতেন আর আবু জেহেল তাঁর সাথিদের নিয়ে নবীকে গালাগালি দিতো। আল্লাহর নবী বাজারে গেলেন, সেখানে লোকজনের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আবু জেহেল সমস্ত মানুষকে ডেকে বললো, তোমরা এই লোকটির কথায় কান দিও না। এই লোকের প্রতারণায় তোমরা নিপতিত হবে না। এ লোক ধোকাবাজ যাদুকর। (নাউযুবিল্লাহ্) এসব কথা বলে কাফির আবু জেহেল সমস্ত লোকজনের সামনে আল্লাহর নবীর পবিত্র শরীরে নোংরা কাদা নিক্ষেপ করলো। একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'বায় নামাজ আদায় করছিলেন। কাফিরের দল দূরে বসে তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছিল। হঠাৎ আবু জেহেল বলে উঠলো, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজে সিজদা করে তখন তাঁর মাথার ওপরে উটের নাড়ি ভুড়ি চাপিয়ে দিলে ভালো হয়। তোমরা কি কেউ এ কাজ করতে পারবে?

কাফির ওকবা বললো, তোমরা দেখো, আমিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাথায় উটের নাড়ি ভুড়ি চাপিয়ে দিচ্ছি। এ কথা বলেই সে উটের নাড়ি ভুড়ি এনে বিশ্বনবীর মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। তিনি তখন নামাজে সিজদায় ছিলেন, মাথা উঠাতে পারলেন না। আল্লাহর নবীর এই কষ্ট দেখে কাফিরের দল হেসে হেসে একজনের শরীরে আরেকজন লুটিয়ে পড়ছিল। পাঁচ বছরের শিশু মেয়ে ফাতিমা পিতার এই দুরবস্থার সংবাদ পেয়ে করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে ছুটে এলেন। কচি হাত দুটো দিয়ে পরম মমতায় পিতার মাথা

থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করে কাফিরদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর দরবারে বিচার দিলেন। আল্লাহর রাসূলের প্রতিবেশী যারা ছিল তাদের ভেতরে একজন ব্যতীত আর কেউ ইসলাম কবুল করেনি। নবীজী যখন নিজের বাড়িতেই নামাজে দাঁড়াতেন তখন প্রতিবেশী উকবা, আদী এ ধরণের অনেকেই তাঁর ওপরে পশুর নাড়ি ভুড়ি ছুড়ে দিত। আল্লাহর নবী বাধ্য হয়ে দেয়ালের আড়ালে নামাজ আদায় করতেন। তিনি রান্নার জন্য চুলায় হাড়ি উঠাতেন আর তারা সেই হাড়ির ভেতরেও আবর্জনা ছুড়ে দিত। তিনি নিজ হাতে সেসব আবর্জনা পরিষ্কার করতেন। এভাবে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও আবু তালিবের অভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কাফিরের দল তাঁর নিজ বাড়ির ভেতরেও নির্যাতন করেছে। সে সমস্ত ঘটনা ইতিহাসের কালো অধ্যায় হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আছে।

পাওনা পরিশোধে বাধ্য হলো

আল্লাহর নবীকে নিজেরা তো ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতোই সেই সাথে মক্কায় নতুন যারা আসতো, তাদের সামনেও তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতো আবু জাহিলের অনুসারীরা। মক্কার বাইরের একজন লোক একটি উট নিয়ে মক্কায় এসেছিল। আবু জেহেল সে উট কিনে নিয়ে উটের মালিককে অর্থ না দিয়ে টালবাহানা করতে থাকে। লোকটি যখন বুঝলো, আবু জেহেল তাকে অর্থ না দিয়েই উট নিয়ে নেবে তখন সে কা'বাঘরে এসে চিৎকার করে বলতে থাকে, আবু জেহেল আমার উট নিয়ে তার মূল্য পরিশোধ করছে না। সে আমার ওপরে জুলুম করছে। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন, যিনি এই জুলুমের প্রতিকার করবেন? আমার অধিকার আমাকে আদায় করে দিবেন?

লোকটির কথা শুনে কাফিরের দল আল্লাহর নবীকে হাসির পাত্রে পরিণত করার আরেকটি সুযোগ পেলো। মক্কার বাইরের ঐ লোকটির সামনে আবু জেহেল যেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অপমান করে তার ব্যবস্থা করলো। লোকটিকে কাফিররা ডেকে আল্লাহর রাসূলকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে বললো, ঐ লোকটির কাছে যাও, সে তোমার অধিকার আদায় করে দেবে। আল্লাহর নবী সে সময় কা'বায় অবস্থান করছিলেন। লোকটি কাফিরদের কথায় বিশ্বাস করে তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বলে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর বান্দাহ! আপনার ওপরে আল্লাহ রহমত নাজিল করুন, আপনি আবু জাহিলের কাছ থেকে আমার অধিকার

আদায় করে দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আমার সাথে চলে এসো, আমি তোমার অধিকার আদায় করে দিচ্ছি।

একথা বলে তিনি উঠে আবু জাহিলের বাড়ির দিকে চললেন। লোকটি রাসূলের সাথে গেল। এ অবস্থা দেখে কাফিররা একজনকে নবীজীর পেছনে প্রেরণ করলো আবু জেহেল কিভাবে আল্লাহর নবীকে অপমান করে তা দেখার জন্য। আল্লাহর হাবীব জালিম আবু জাহিলের বাড়ির দরজায় আঘাত করলেন। সে ভেতর থেকে জানতে চাইলো আগন্তুকের পরিচয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, দরজা খুলে বাইরে এসো।

আবু জেহেল বাইরে এসে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তাঁর চেহারা আতঙ্কে এমন বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, সে যেন তাঁর সামনে মৃত্যুদূত দেখছে। আল্লাহর নবী গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন, এই লোকের যে অধিকার রয়েছে তোমার কাছে, তাঁর অধিকার তাকে বুঝিয়ে দাও। আবু জেহেল আতংক গ্রস্থ কণ্ঠে বললো, এখুনি দিচ্ছি। এ কথা বলেই সে তাঁর ঘরে গিয়ে দ্রুত অর্থ এনে লোকটিকে দিয়ে দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'বায় ফিরে এলেন।

সে লোকটি কা'বায় এসে কাফিরদেরকে বললো, মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপর রহমত নাজিল করুন, তিনি আমার অধিকার আদায় করে দিয়েছেন। কাফিররা ধারণা করেছিল আবু জেহেল লোকটির সামনে নবীজীকে অপমান করবে, তা না করে আবু জেহেল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথায় অর্থ প্রদান করলো, ব্যাপার কি? ইতোমধ্যে আবু জেহেল সেখানে এলো। তাঁর চেহারা থেকে তখন পর্যন্ত ভয়ের চিহ্ন মুছে যায়নি। অন্যরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, ঘটনা কি? তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথায় মূল্য দিয়ে দিলে? আবু জেহেল বললো, তাঁর কথায় মূল্য না দিলে সে ভয়ংকর উট আমাকে খেয়ে ফেলতো। আমি দরজা খোলার পরে দেখলাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পেছনে একটা বিরাট উট দাঁড়িয়ে আছে। খোদার শপথ! তেমন উট আমি কোথাও দেখিনি। উটের চেহারা বড় ভয়ংকর, আমি মূল্য প্রদান না করলে উট আমাকে খেয়ে ফেলতো।

এভাবেই আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অপমান করার কাফিরদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছিলেন। এ ধরণের অসংখ্য ঘটনা তাঁরা ঘটিয়েছে। যারা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর রাসূলের সাথে শত্রুতা করেছে, মহান আল্লাহ তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন। আবু লাহাব-এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে জামিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নানাভাবে অত্যাচার করেছে। তাদের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেছেন। আবু লাহাব যখন জানতে পারলো তাঁর পরিণতি সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তখন সে একটি পাথর নিয়ে আল্লাহর হাবীবকে আঘাত করার জন্য কা'বায় বসে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বক্র রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সাথে করে কা'বায় এলেন। মহান আল্লাহ আবু লাহাবের চোখ থেকে তাঁর হাবীবকে অদৃশ্য করে দিলেন। আবু লাহাব হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম? আমি জানতে পারলাম সে আমার সম্পর্কে শাস্তির কথা বলছে। তাকে এখন আমি কাছে পেলে এই পাথর দিয়ে আঘাত করতাম।

এ কথা বলে সে চলে গেল। হযরত আবু বকর আল্লাহর হাবীবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু লাহাব আপনাকে দেখতে পেল না কেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে আমাকে দেখতে পায়নি। আল্লাহ তাঁর চোখকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন সে আমাকে দেখতে না পায়।

তায়েফের মর্মান্তিক ঘটনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ইসলাম বিরোধিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। তিনি চিন্তা করলেন, তায়েফের আবদে ইয়ালিল, মাসউদ ও হাবিব এই তিনজন যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে মুসলমানদের ওপর মক্কার কাফিররা অত্যাচার করতে সাহস পাবে না। এই তিন ব্যক্তি ছিল তায়েফের সবচেয়ে প্রভাবশালী গোত্র সাকিফ গোত্রের তিন ভাই। তাঁরাই ছিল গোত্র প্রধান। এই তিনজন লোক যদি ইসলামের পক্ষে আসে তাহলে ইসলামী আন্দোলন শক্তিশালী হবে। তাদের মাধ্যমে আরো বড়বড় নেতাদের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌছে দেয়া যাবে। এ সবদিক চিন্তা করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সাথে করে পায়ে হেঁটে তায়েফে রওয়ানা দিলেন। তায়েফের তিন ভাইয়ের একজন মক্কার কুরাইশ বংশের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। আল্লাহর নবীও ছিলেন কুরাইশ বংশের, সুতরাং তাঁরা ছিল কুরাইশদের আত্মীয়। তাঁরা ইচ্ছা করলে নবীকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। আল্লাহর নবী তাদের সাহায্য পাবেন–বুকভরা আশা আর দুচোখে সাফল্যের স্বপ্ন নিয়ে তিনি তায়েফ গমন করলেন।

কিন্তু তাকদির ছিল ভিন্ন ধরণের। তিনি তাদের কাছে গেলেন। তাদের তিন ভাইকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝালেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। যারা যুক্তি মানে না, কুসংস্কারকে অন্ধ আবেগে আক্‌ড়ে ধরে রাখতে চায়, নিজের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেয়, কোনরূপ চিন্তা ভাবনা ব্যতীতই প্রচলিত সংস্কার ধরে রাখতে চায়, তাঁরা মহাসত্য গ্রহণ করতে পারে না।

তিনি তাদেরকে ইসলাম সম্পর্ক বুঝিয়ে অনুরোধ করলেন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করা দূরে থাক, আল্লাহর হাবীবকে অপমান করলো এবং এলাকার মূর্খ ও সন্ত্রাসীদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা আল্লাহর হাবীবকে বিদ্রুপ করতে লাগলো। তিনি যে পথেই যান সে পথেই তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে উৎপাত করতে থাকলো। আল্লাহর নবী দীর্ঘ দশ দিন যাবৎ তায়েফে অবস্থান করে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন। ইসলাম বিরোধিরা অবশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে রাস্তা দিয়ে যাবেন সে রাস্তার দু'দিকে পাথর হাতে দাঁড়িয়ে গেল।

ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, পাষন্ডের দল বৃষ্টির আকারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপরে পাথর বর্ষণ করতে থাকলো। আল্লাহর নবী রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়লেন। তায়েফের জালিমরা আল্লাহর হাবীবের পবিত্র পা দুটো লক্ষ্য করেই আঘাত করেছিল বেশী। আল্লাহর নবী যখন হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন তখন তিনি জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে গেলেন। এ অবস্থাতেও নিষ্ঠুর তায়েফবাসী পাথর বর্ষণ অব্যাহত রাখলো। আল্লাহর নবীর এই অবস্থা দেখে হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা নেমে এলো। তিনি আল্লাহর হাবীবের পবিত্র দেহের ওপর থেকে পাথর সরিয়ে আল্লাহর নবীকে উঠালেন।

আল্লাহর নবীকে সাহায্য করতে গিয়ে হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও মারাত্মকভাবে আহত হলেন। আল্লাহর হাবীব হাঁটতে পারছেন না। কোন মতে অবশ পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। আহা! যে পায়ে একবার চুমো দিলে সমস্ত জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ খুশী হয়ে যান আর আজ নরাধমেরা সেই পায়ে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।

তায়েফের মাটি আল্লাহর নবীর শরীরের পবিত্র রক্তধারায় রঞ্জিত হয়ে গেল। পাষন্ডরা তবুও নিবৃত হলো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তায়েফে কারো বাড়িতে একপাত্র পানি পর্যন্ত পাননি। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছলো যে, আল্লাহর হাবীবের জীবন নাশের আশংকা দেখা দিল। হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবীকে নিয়ে দেয়াল ঘেরা একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। আল্লাহর রাসূলের তখন জ্ঞানহীনের মত অবস্থা। হযরত যায়েদের সেবা-যত্নে তিনি জ্ঞান ফিরে পেতেই হযরত যায়েদকে বললেন নামাজের কথা। নামাজের প্রস্তুতির জন্য তিনি পায়ের জুতা খুলতে গেলেন– পারলেন না। পবিত্র রক্ত জুতায় প্রবেশ করে পায়ের সাথে জুতা এমনভাবে বসে গেছে যে জুতা মোবারক খুলতে কষ্ট করতে হলো।

মি'রাজুন্নবী

হাদীস ও সিরাতের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এটা বুঝা যায় যে, হিজরতের এক বছর পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। আর এই সময় মি'রাজ হওয়াটাও ছিল সময়ের দাবী। কারণ আর মাত্র এক বছর বাকী ছিল ইসলামকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার। রাষ্ট্র প্রধানের কি দায়িত্ব এবং কর্তব্য তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার মত লোক মক্কাতেই নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল। আল্লাহর রাসূল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইল এলাকা ব্যাপী বিস্তৃত একটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। মিরাজ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا

পবিত্র তিনি যিনি নিয়ে গেছেন এক রাতে নিজের বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্সা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে তিনি বরকতময় করছেন, যাতে তাকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখান। (সূরা বনী ইসরাইল-১)

হিজরতের পরপরই তাঁর গোটা জীবন ধারায় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে, দীর্ঘ তের বছর ধরে তিনি নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছেন, তাঁর চোখের সামনে তাঁরই প্রাণ প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হয়েছে, তিনি কোন প্রতিকার করতে পারেননি, এ সবের অবসান ঘটবে এবং এবার আঘাত করলে প্রতিঘাত করা হবে, বিশাল একটি রাষ্ট্রের, যে রাষ্ট্রে নানা রঙের, বর্ণের, ভাষার, ধর্মের, জাতির লোক বাস করবে, এমন একটি রাষ্ট্রের খুটিনাটি আইন-কানুনের প্রয়োজন। এ সমস্ত দিক সামনে রেখেই তাঁর মি'রাজ যথা সময়েই মহান আল্লাহ সংঘটিত করেছিলেন। বিশাল সে রাষ্ট্রের মূলনীতি কি কি, মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন।

আল্লাহর রাসূল এবং মুসলমানগণ যে চরম সমস্যার মোকাবেলা করছিলেন এবং সে সমস্যা অচিরেই দূরিভূত হয়ে সৌভাগ্য শশী উদিত হবে, তারই শুভ ইঙ্গিত ছিল পবিত্র মি'রাজ। হিজরতের পর হতে সার্বিক কল্যাণ এবং শান্তির ও নিরাপত্তার এক নতুন পৃথিবীর দ্বার উদ্ঘাটন হবে, ঠিক সে সময়েই এমন এক মহামান্বিত রাতের আগমন ঘটলো, যে রাত ছিল মহান আরশে আজীমে পৌছার গৌরবময় রাত। এ রাতে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে যত কার্যকরী উপাদান রয়েছে, সে সব উপাদনসমূহকে নির্দেশদান করলেন, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় নিয়ম পদ্ধতি যেন পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়।

জান্নাতের দ্বাররক্ষীকে আদেশ করা হলো, মহামান্য মেহমান আগমন করবেন, সমস্ত কিছুই নবসাজে সজ্জিত করা হোক। যে পথে মেহমান আগমন করবেন এবং যে সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করবেন, সে পথ ও এলাকাসমূহ সজ্জিত করা হোক। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে আদেশ করা হলো, দ্রুতগামী যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, এরচেয়েও দ্রুতগামী বাহন মেহমানের জন্য প্রস্তুত করে যথাস্থানে প্রস্তুত রাখা হোক।

মহামান্য অতিথিকে স্বাগত জানানোর জন্য উর্ধ্ব জগতের সমস্ত কিছু প্রস্তুত হয়ে গেল। যাত্রা পথে জান্নাতি সুরের তরঙ্গ সৃষ্টি করা হলো। সর্বত্র জান্নাতের আনন্দ

সমিরণ প্রবাহিত হতে থাকলো। মানুষ যে জগতের স্পর্শ সহ্য করতে সক্ষম সে শক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দান করার জন্য হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম মর্ত্যধামে পবিত্র মক্কায় উপস্থিত হয়ে সে ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করলেন। এরপর একটির পরে আরেকটি আকাশ পার হয়ে তিনি ষষ্ঠ আকাশে কতক নবীদের সাক্ষাৎ লাভ করলেন। সমস্ত নবী তাঁকে স্বাগত জানালেন। এবার জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তাকে আল্লাহর আরশে আজীমের কাছে পৌছে দিলেন।

একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মি'রাজের পূর্ণাঙ্গ ঘটনা কোন একটা হাদীসেও উল্লেখ করা হয়নি। অনেকগুলো হাদিস একত্রিত করলে তারপর সম্পূর্ণ ঘটনা একত্রিত করা যায়। এর কারণ হলো, বর্ণনাকারীদের ভেতরে যিনি ঘটনার যতটুকু শুনেছেন, ততটুকুই বর্ণনা করেছেন। আকাশের বিভিন্ন স্তরে মর্যাদাবান নবী রাসুলদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে উপস্থিত করা হয় সিদরাতুল মুনতাহায়। এখানে পৌছার পরে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তাঁকে বিনীতভাবে অবগত করেন, এই সীমা অতিক্রম করার অনুমতি আমাদের জন্য নেই।

প্রমাণ হয়ে গেল যেখানে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম যেতে পারেন না, সেখানে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অবাধ পদচারণা। তারপর তিনি বাইতুল মামুরে পৌছলেন। এই বাইতুল মামুর হলো কা'বার মৌলিক ভবন। এখান থেকে তাঁকে মহান আল্লাহ নিজের সান্নিধ্যে ডেকে নেন।

এরপর তাঁকে জান্নাত পরিদর্শন করানো হলো, জাহান্নাম দেখানো হলো, মহান আল্লাহর নানা কুদরত তাঁকে পরিদর্শন করানো হলো। কোন সৎ কর্মের কি পুরস্কার তা দেখানো হলো। আল্লাহর কোন নির্দেশ অমান্য করলে কি ধরণের শাস্তি ভোগ করতে হবে তা দেখানো হলো। মহান আল্লাহ যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে তাঁকে নিজের সান্নিধ্যে আহ্বান করেছিলেন তা পূর্ণ হবার পরে তাঁকে পুনরায় এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হলো। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল তা মহান আল্লাহই অবগত আছেন। তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, রাতের কিছু অংশে তা সংঘটিত হয়েছিল। অনেকের কাছে বিষয়টা বোধগম্য নয়, রাতের সামান্য অংশে এতকিছু পরিদর্শন করা কি করে সম্ভব?

প্রকৃত ব্যাপার হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মি'রাজে নেয়ার সময় যদি পৃথিবীর গতিহরণ করা হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই এটা সম্ভব। একটা ঘড়িকে যদি রাত বারোটার সময় বন্ধ করে দিয়ে রাত চারটার সময় পুনরায় চালু করা হয়, তাহলে ঘড়ির কাঁটা ঐ রাত বারটার স্থান থেকেই ঘুরতে থাকবে, রাত চারটার স্থান থেকে ঘুরবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিষয়টা যদি এমন হয় তাহলে তিনি কতদিন কত বছর যে উর্ধ্ব জগতে ছিলেন তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি যদি রাত একটার সময় যাত্রা আরম্ভ করে থাকেন, আর সে সময়েই যদি সমস্ত সৃষ্টির গতি মহান আল্লাহ বন্ধ করে দিয়ে থাকেন, তাহলে পৃথিবীর সময় তো স্থির হয়েছিল। সময় সামনের দিকে এগিয়ে যায়নি। তিনি যখন পৃথিবীতে পদার্পণ করেছেন তখন পুনরায় পৃথিবীকে গতি দেয়া হয়েছে, স্থির সময় পুনরায় সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। বিষয়টা যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে অবাক হবার কিছুই নেই। সে সময়ে কি ঘটেছিল মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

আজ থেকে শতকোটি বছর পূর্বে মহাকাশে, সাগরের অতল তলদেশে তথা পৃথিবীর কোথায় কি ঘটেছিল, গবেষণায় তা উদ্ঘাটন হচ্ছে। মি'রাজ সংঘটিত হবার কালে পৃথিবীর সময় স্থির হয়ে পড়েছিল কিনা তা হয়তঃ একদিন গবেষণায় জানাও যেতে পারে। চাঁদে কবে কোনদিন কোন সময়ে ফাটল ধরেছিল তা যদি বর্তমানে বলে দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে পৃথিবীর সময় কোন এক শুভ মুহূর্তে স্থির হয়েছিল কিনা তা বলে দেয়া অসম্ভবের কিছুই নেই।

আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন

প্রায় সমস্ত মুসলমানরাই মক্কা থেকে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম মক্কায় অবস্থান করছিলেন। আল্লাহর হাবীব মহান আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রায়ই হিজরত করার অনুমতি প্রার্থনা করতেন। তিনি বন্ধু আবু বকরের অন্তরের আশংকা অনুভব করতে পারতেন। আবু বকর নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে হিজরত করতে আগ্রহী নয়–স্বয়ং নবীর নিরাপত্তার জন্যই তিনি বারবার হিজরতের কথা বলতেন, এ কথা তিনি অনুভব

করে বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, তুমি এত ব্যকুল হয়ো না। আল্লাহ্ তোমাকে একজন সঙ্গী জুটিয়ে দিবেন। এদিকে দুশমনরা বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো তারা আল্লাহর নবীকে হত্যা করবে। তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাঈল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূলকে জানিয়ে হিজরত করতে বললেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে কম্বল ব্যবহার করতেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে তিনি বললেন, তাঁর সে কম্বলে আচ্ছাদিত হয়ে তাঁরই বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতে।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কোন ধরণের আপত্তি না করে নবীজীর আদেশ পালন করলেন। তিনি জানতেন, শত্রুরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে না পেয়ে তাঁকেই হত্যা করতে পারে। হত্যা না করলেও তাঁর ওপরে নির্মম অত্যাচার করতে পারে। নির্মম পরিণতির কথা নিশ্চিতভাবে জেনেও তিনি নবীজীর বিছানায় শুয়ে থাকলেন।

এরই নাম নেতার প্রতি মমতা, এরই নাম নেতৃ আদেশ পালন, একেই বলে নেতার আনুগত্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের আনুগত্যশীল কর্মী গঠন করেছিলেন বলেই ইসলাম অতিদ্রুত দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। শত্রুরা নবীর বিছানায় কম্বল আচ্ছাদিত শায়িত দেখে ধারণা করবে এই শায়িত ব্যক্তিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তারপর তরবারীর আঘাতে তাকে কেটে টুকরা টুকরা করবে, তাঁর জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর নবী এই পৃথিবীতে জীবিত থাকবেন। এ কথাটাই সে মুহূর্তে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

ইসলামের শত্রুরা রাতের সেই প্রথম প্রহর থেকেই আল্লাহর নবীর আবাসস্থল পরিবেষ্টন করে সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিল। এরপর আল্লাহর হাবীব শত্রুদের সামনেরই তাঁর ঘরের দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলেন। তারপর একমুষ্টি ধূলি হাতে উঠিয়ে তা শত্রুদের দিকে ছুড়ে দিলেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এ ঘটনা পবিত্র কোরআন এভাবে বর্ণনা করেছেন-

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى-

যখন আপনি বালুকণা নিক্ষেপ করেছিলেন আপনি শুধু নিক্ষেপ করছিলেন, আর ঐ বালুকণা কাফিরদের চোখে পৌছনোর দায়িত্ব আমার কুদরত গ্রহণ করেছিলো।

মহান আল্লাহর আদেশেই নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ধূলি নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সে ধূলি কুদরতি ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামের শত্রুদের চোখে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ফলে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পায়নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথে যে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সে পাহাড়ের কাছে শত্রুর দল এসে পড়েছিল। তারা এমন অবস্থানে এসে পড়েছিল যে, নিচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাদের চোখে পড়ার কথা। কিন্তু মহান আল্লাহর অসীম কুদরত যে, তারা কেউ নবীর সন্ধান করতে পারেনি। শত্রুপক্ষ এত কাছে এসে গেল যে, আর মুক্তির কোন আশা নেই। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বড় বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি শংকিত কণ্ঠে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! শত্রুপক্ষ এতকাছে যে, তারা আমাদেরকে দেখে ফেলবে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরম নিশ্চিন্তে জবাব দিলেন কোন দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। এ ঘটনা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا–

সে মাত্র দুইজনের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলো, যখন তারা দুইজন গুহায় অবস্থান করছিলো, যখন সে তার সঙ্গীকে বলছিলো, চিন্তা-ভাবনা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন। (সূরা তওবা-৪০)

এখানে একটা বিষয় গভীরভাবে অনুভব করার মত। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে এ কথা বললেন না যে, 'লা তাখাফ্' অর্থাৎ ভয় করো না। তিনি বললেন 'লা তাহ্যান' অর্থাৎ দুশ্চিন্তা করো না। কারণ তিনি জানতেন তাঁর সাথী আবু বকর ভীতগ্রস্থ হননি, তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়েছেন। মানুষ নিজের প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজের প্রাণের ভয়ে ভীত হননি। মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয় আরেকজনের কারণে। তিনিও আল্লাহর রাসূলের কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। ইসলামের শত্রুরা রাসূলের ওপর অত্যাচার করবে, এ কারণেই তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন।

জালিমের শেষ পরিণতি

বোখারী হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, বদরের ময়দানে আমি এক সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার দুই পাশে ছিল কিশোর দুইটি ছেলে। আমার কেমন যেন বিব্রত বোধ হচ্ছিল, আমার দুই পাশে দুটি কিশোর ছেলে, বয়স্ক কোন বীর নেই! এক পাশের একজন আমার কানের কাছে গোপন ভঙ্গীতে জানতে চাইলো, আবু জেহেল কোনটা। অপর পাশের কিশোরটিও একই ভঙ্গীতে আবু জেহেলের সন্ধান জানতে চাইলো। তখন আমার জড়তার ভাব কেটে গেল। আমার মনে হলো, আমি দুইজন বীরের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছি।

হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আবু জেহেলকে তোমাদের কি প্রয়োজন? তাঁরা জানালো, আমরা আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছি, আমরা আবু জেহেলকে হত্যা করবো অথবা শহাদাতবরণ করবো। এরপর হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাদের দুই ভাইকে ইশারা দিয়ে দেখিয়ে দিল, আবু জেহেল যেখানে অবস্থান করছিল। আবু জেহেলকে দেখার সাথে সাথে দুই ভাই উল্কার বেগে ছুটে গেল তার কাছে। দুই ভাই ঝাঁপিয়ে পড়লো আল্লাহর শত্রু আবু জেহেলের ওপরে। আবু জেহেল মাটিতে পড়ে গেল। তাকে রক্ষার জন্য তার সন্তান ইকরামা দ্রুত এগিয়ে এসে তরবারীর আঘাত করলো। হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাম হাতটা এমনভাবে কেটে গেল যে, সে হাতটা কাঁধের সাথে ঝুলতে লাগলো।

এই ঝুলন্ত হাত নিয়ে কিশোর এই সাহাবী আবু জেহেলের সন্তান ইকরামার সাথে যুদ্ধ করে তাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন। ইকরামা অবশ্য পরে ইসলাম কবুল করেছিল। ঝুলন্ত হাত যুদ্ধ করতে বড় অসুবিধার সৃষ্টি করছিল। কিশোর সাহাবী হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর ঝুলন্ত হাত পায়ের নীচে ফেলে আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার দিয়ে একটানে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বাচ্ছন্দে যুদ্ধ করতে থাকলেন। এই দুই সিংহ সাবক ছিলেন আফরা নামক এক বীরাঙ্গনা নারীর সন্তান।

বদরের প্রান্তরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে বিজয়ী করার পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকে বললেন, এমন কেউ

আছে কি, যে ব্যক্তি আবু জেহেলের পরিণতি দেখে আসবে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দ্রুত ছুটে গেলেন যুদ্ধের ময়দানে। তিনি দেখলেন, মৃতদেহের মধ্যে আবু জেহেল মারাত্মক আহত অবস্থায় পড়ে আছে। ঘনঘন নিশ্বাস ছাড়ছে আল্লাহর এই দুশমন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আবু জেহেলের দাড়ি ধরে জানতে চাইলেন, তুমিই কি আবু জেহেল? আল্লাহর দুশমন আবু জেহেল জবাব দিল, সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম আর কে আছে, যাকে তার বংশের লোকজন হত্যা করলো।

কোন একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে আবু জেহেল থাপ্পড় মেরেছিল। সে কথা তাঁর স্মরণে ছিল। তিনি আবু জেহেলের ঘাড়ে পা রাখলেন। আবু জেহেল বললো, এই ছাগলের রাখাল! দেখ তুই কোথায় তোর পা রেখেছিস? এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলামের এই শত্রুর মাথা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর সে মাথা আল্লাহর রাসূলের সামনে এনেছিলেন। তিনি বলেন, আফরার দুই সন্তান আবু জেহেলকে মারাত্মকভাবে আহত করে ফেলে রেখেছিল। আমারও প্রতীজ্ঞা ছিল আমি তাকে হত্যা করবো। আমি তার মাথা কেটে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সামনে এনে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আল্লাহর দুশমন আবু জেহেলের মাথা।পরবর্তীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ নেতৃবৃন্দের লাশ কুয়ায় নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন।

বন্দীর সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার

বদরের যুদ্ধে দুশমনদের যারা বন্দী হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলো সুহাইল ইবনে আমর। এই লোকটি ছিল উঁচু স্তরের বাগ্মী এবং কবি। সে জনসমাবেশ আহ্বান করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নানা ধরণের বাজে কথা বলতো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে দেখে প্রচন্ড রেগে গেলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ লোকটির নীচের মাড়ির দাঁত উপড়ে ফেলা হোক, যেন তার জিহ্বা বের হয়ে আসে এবং সে ভালোভাবে কথা বলতে না পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, আমি নবী– আমি নবী হবার পরেও যদি কারো চেহারা বিকৃত করে দিই, তাহলে আল্লাহ আমার চেহারা বিকৃত করে দিবেন।

ক্ষমার কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত ! পরম শত্রুকে হাতের ভেতর পেয়েও তিনি কিছুই বললেন না। আমার বিরুদ্ধে তুমি কেন কুৎসা ছড়াতে? সামান্য এই কথাটিও তিনি জিজ্ঞাসা করলেন না। ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করে তরবারীর জোরে আসেনি, ইসলাম এসেছে তার অনুপম আদর্শ দিয়ে, নিজের আপন বৈশিষ্টের কারণে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বসলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন ইসলামের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ব্যক্তি। তিনি ন্যায়ের খাতিরে সামান্যতম অনুকম্পা প্রদর্শন করতেন না। তিনি পরামর্শ দিলেন, সবাইকে হত্যা করা হোক। যার যে আত্মীয় সে তাকেই হত্যা করবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পরামর্শ দিলেন, বন্দীদের সবাই আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন। সুতরাং তাদের কাছে থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হোক।

তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যুদ্ধবন্দীদের ভাগ করে দিয়ে বললেন, এদের সাথে মমতাপূর্ণ ব্যবহার করবে। তাদেরকে আরামের সাথে রাখবে। আল্লাহর নবী হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুরই মতামত গ্রহণ করলেন। বন্দীদের কাছ থেকে এক হাজার দিনার থেকে চার হাজার দিনার পর্যন্ত গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হলো। যারা মুক্তিপণ দিতে অপারগ ছিল, তাদেরকে এমনিতেই মুক্তি দেয়া হয়েছিল। এই ধরণের অপারগ ব্যক্তিদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানতো, তাদেরকে শর্ত দেয়া হয়েছিল, তারা দশজন করে মুসলমানকে লেখাপড়া শিখাবে তারপর তারা মুক্তি লাভ করবে। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বদরের যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকেই লেখাপড়া শিখেছিলেন। গণশিক্ষার ধারণা ইসলামই সর্বপ্রথম দিয়েছে এবং সবার জন্য শিক্ষা– এর প্রচলন ইসলামই ঘটিয়েছে।

প্রথমে সমস্ত বন্দীদের এনে বেঁধে রাখা হয়েছিল। আল্লাহর রাসূলের চাচা বা আত্মীয় বলে কারো প্রতি কোন স্বজন প্রীতি দেখানো হয়নি। রাসূলের চাচা বাঁধনের কারণে যন্ত্রণায় বোধ হয় মাঝে মাঝে কাতর শব্দ করছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চাচার সে কষ্ট কাতর ধ্বনি শুনে রাতে ঘুমাতে পারলেন না। চাচার জন্য মনটা তাঁর ব্যথা কাতর হয়ে উঠলো। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর মনের অবস্থা অনুভব করতে পেরে হযরত আব্বাসের বাঁধন শিথিল করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ বন্দীদের

সাথে যে অপূর্ব ব্যবহার করেছিল মুসলমানগণ, ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। বন্দীদের মধ্যে হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আপন ভাই আবু আজীজও ছিলেন। তার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এক আনসারীর ওপর। তিনি বলেন, আমাকে যে আনসারের তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়েছিল, তার ব্যবহারে আমি নিজেই লজ্জিত হতাম। তিনি নিজে না খেয়ে আমাকে খাওয়াতেন। তিনি নিজে খেজুর খেতেন আর আমাকে রুটি খাওয়াতেন। আমি তাঁর হাতে রুটি দিলে তা তিনি আমাকে ফেরৎ দিতেন। কারণ নবী নবীজী নির্দেশ দিয়েছিলেন, বন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য।

আল্লাহর রাসূলের চাচার ব্যাপারে মদীনার আনসারেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চাচার মুক্তিপণ আমরা ত্যাগ করছি। আমরা এমনিতেই তাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাদের কথায় রাজী হননি। অন্যান্য বন্দীদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত ছিল, নবীর চাচা হবার কারণে হযরত আব্বাসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলো না। আইন সবার জন্যই ছিল সমান। তাঁর কাছে থেকেও মুক্তিপণ আদায় করে তবেই তাকে ছাড়া হয়েছিল। নবীজীর মেয়ের স্বামী অর্থাৎ নবীর জামাই আবুল আসকেও মুক্তিপণ ব্যতীত মুক্তি দেয়া হয়নি। তাঁর কাছে সে সময় মুক্তিপণের অর্থ ছিল না।

তিনি মক্কায় সংবাদ দিয়ে মুক্তিপণ নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মেয়ে যয়নাব তখন মক্কায়। তিনি তাঁর স্বামীর জন্য মুক্তিপণের যে অর্থ প্রেরণ করেছিলেন, তার ভেতরে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার গলার হার ছিল। তিনি মেয়ের বিয়ের সময় তাকে উপহার দিয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেই হার দেখে চিনতে পারলেন। এই হার তাঁর দুঃখের দিনের জীবন সাঙ্গিনী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার।

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় স্ত্রীর কথা স্মরণ করলেন। ইসলামের জন্য খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কি ত্যাগই না স্বীকার করেছেন। গোটা মক্কার সম্পদশালী নারী, ইসলামের জন্য শিয়াবে আবু তালিবে দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছেন। সমস্ত কথাই নবীজীর মনে পড়লো। তিনি চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। আজ খাদিজা তাঁর সামনে নেই, খাদিজার ব্যবহার করা

কণ্ঠহার তাঁর সামনে। শত সহস্র স্মৃতি নবীর বুকের ভেতরটা নাড়া দিয়ে গেল। অদম্য অশ্রুধারা বিশ্বনবীর দু'চোখ থেকে ঝরতে থাকলো। আল্লাহর নবী তাঁর সাহাবায়ে কেরামের কাছে আবেদন করলেন, যদি তোমাদের মনে চায় তাহলে যয়নাবের মায়ের এই স্মৃতি তাঁর কাছেই ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।

সাহাবয়ে কেরাম সন্তুষ্ট চিত্তে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সেই হার তাঁরই মেয়ে হযরত যয়নাবের কাছে ফেরৎ পাঠালেন। আবুল আস মুক্তি লাভ করে মক্কায় এসে হযরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাক মদীনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আবুল আস ছিলেন মক্কার বিখ্যাত ব্যবসায়ী। বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর কাছে অর্থ দিত সিরিয়া থেকে মালামাল নিয়ে আসার জন্য। যাওয়ার সময়ও তাঁর কাছে মালামাল দিয়ে দিত বিক্রি করার জন্য। একবার তিনি সিরিয়া থেকে নিজের এবং অন্যান্য লোকদের মালামাল নিয়ে আসার পথে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হলেন। তিনি কোন রকমে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে মদীনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত যয়নাবের শরণাপন্ন হলেন। হযরত যয়নাব তাকে আশ্রয় দিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত যয়নাবের কাছে তাঁর মালামাল ফেরৎ পাবার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলেন।

তাঁর ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন পর্যন্ত কিছুই জানতেন না। তিনি ফজরের নামাজে মসজিদে আগমন করলেন। নামাজ আদায় শেষ হলে নারীদের স্থান থেকে হযরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঘোষনা করলেন, উপস্থিত জনমন্ডলী! আমি আবুল আস ইবনে রাবীকে আশ্রয় দিয়েছি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি যে কথা শুনলাম তোমরা কি তা শুনতে পেয়েছো? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা শুনতে পেয়েছি। আল্লাহর নবী বললেন, মহান আল্লাহ সাক্ষী, এই ঘোষনা শোনার আগে আমি ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। চুক্তি অনুসারে যে কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। এরপর তিনি তাঁর মেয়ের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি তাকে যত্ন করে রাখো, কিন্তু সে যেন তোমার কাছে নির্জনে আসতে না পারে। কারণ, এখন তুমি তাঁর জন্য বৈধ নও।

এরপর আল্লাহর নবী মুসলিম বাহিনীর যে সদস্যদের জানালেন, আবুল আসের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক তোমরা তা জানো। তোমরা তাঁর মালামাল হস্তগত করেছো।

তোমরা যদি দয়া করে তাঁর সম্পদ ফেরৎ দাও তাহলে তা দিতে পারো। আর যদি না দাও তাহলে তা তোমাদের জন্য গণিমতের সম্পদ হিসেবে বৈধ। ঐ সমস্ত সম্পদের আইনগত অধিকার তোমাদের। তোমরা তা রেখে দিতে পারো। মুসলিম বাহিনীর সদস্যগণ জানালেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তা ফেরৎ দেব।

কুরাইশরা শুনেছিল তাদের মালামালসহ আবুল আস মদীনায় মুসলমানদের হাতে ধরা পড়েছে। তারা জানতো তাদের মালামাল ফেরৎ পাবার আর কোন আশা নেই। কিন্তু আবুল আস যখন তাদের সমস্ত মালামাল নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হলো তখন তারা হতবাক হয়ে গেল। আবুল আস যার যার মালামাল তার তার কাছে ফেরৎ দিয়ে জানতে চাইলো, তোমরা তোমাদের সবার জিনিষ বুঝে পেয়েছো? কুরাইশরা তাকে বললো, আমরা আমাদের সমস্ত সম্পদ বুঝে পেয়েছি। আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি আমাদের সাথে একজন প্রকৃত মহৎ এবং চরিত্রবান মানুষের মতই ব্যবহার করেছো।

আবুল আস বললেন, আমি যদি তোমাদের মালামাল তোমাদের কাছে পৌছানোর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করতাম তাহলে তোমরা ভাবতে আমি তোমাদের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আমি তোমাদের কাছে তোমাদের আমানত পৌছে দিয়েছি। আর শোন, আমি ঘোষনা করছি, আমি আজ থেকে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে গেলাম। এ কথা মক্কার কুরাইশদেরকে জানিয়ে হযরত আবুল আস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে মদীনায় চলে এলেন।

আমার জাতিকে ক্ষমা করুন

মুসলিম বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমনের মুখে ওহূদের যুদ্ধের এক পর্যায়ে মক্কার কুরাইশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের ফেলে যাওয়া সম্পদ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছে দেখে তীরান্দাজ বাহিনীর ভেতরে মতানৈক্য দেখা দিল। একদল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য ময়দানে চলে যাবার পক্ষে মতামত দিল। তীরান্দাজ বাহিনীর সেনাপতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাদেরকে বারবার নিষেধ করার পরেও তাঁরা নেতার আদেশ অমান্য করে গণিমতের মালামাল সংগ্রহ করার জন্য ময়দানে ছুটে গেল। মক্কার কুরাইশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও তারা সুযোগের

অপেক্ষায় ছিল। মুসলমানদের তীরান্দাজ বাহিনীকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেখানে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অবস্থান করতে আদেশ করেছিলেন, সে স্থান অরক্ষিত দেখে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তার বাহিনী নিয়ে সেদিক থেকেই ঝড়ের বেগে আক্রমন করেছিল।

নেতার আদেশ অমান্য করার ফল হাতে হাতেই মুসলিম বাহিনী লাভ করলো। চারদিক থেকে কুরাইশ বাহিনী একত্রিত হয়ে অপ্রস্তুত মুসলিম বাহিনীকে এমনভাবে আক্রমন করলো যে, তাঁরা যুদ্ধ করা দূরে থাক আত্মরক্ষা করার মত সুযোগ পেল না। অসহায়ের মত বড়বড় বীর যোদ্ধা শাহাদাতবরণ করতে লাগলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ়ের মতই অনেকে কি করবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। তীরান্দাজ বাহিনীর যে কয়জন গিরিপথে প্রহরা দিচ্ছিলেন, তাঁরা একে একে শাহাদাত বরণ করলেন। কুরাইশ বাহিনীর লক্ষ্য ছিল একটিই, ইসলামের মধ্যমনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা। ইসলাম বিরোধিদের আক্রমন এতই তীব্র ছিল যে, অধিকাংশ সাহাবা সে সময় জানতেন না, আল্লাহর রাসূলের ভাগ্যে কি ঘটেছে।

কুরাইশ বাহিনী আর মুসলিম বাহিনী এমনভাবে একাকার হয়ে গিয়েছিল যে, কে শত্রু আর কে মিত্র তা জানার উপায় ছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য কুরাইশ বাহিনী তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। চারদিক থেকে আল্লাহর রাসূলকে ঘেরাও করে কাফিরের দল আক্রমন করলো। বৃষ্টির মতই অস্ত্র বর্ষিত হচ্ছিল। সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের মাঝে রেখে নবীর চারদিকে তাঁরা মানববন্ধন তৈরী করলেন। অস্ত্রের সমস্ত আঘাত এসে তাদের ওপরেই নিপতিত হতে থাকলো। তাঁরা তাদের জীবনী শক্তির শেষ বিন্দু দিয়ে হলেও নবীকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। একের পরে আরেকজন শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করে জান্নাতের দিকে চলে যাচ্ছিলেন।

হযরত জিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গুরুতর আহত হয়ে পড়ে গেলেন। তখন পর্যন্ত তাঁর দেহে প্রাণ শক্তি অবশিষ্ট ছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদেশে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে ধরাধরি করে নবীর কাছে এনে শুইয়ে দিলেন। হযরত জিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর হাবিবের পবিত্র কদম মোবারকে

মুখ রেখে শাহাদাত বরণ করলেন। চারদিক থেকেই অস্ত্র ছুটে আসছে। সমস্ত অস্ত্রের আঘাত এসে সাহাবায়ে কেরামের দেহে পড়ছে। তাঁরা নিজের দেহকে ঢালের মতই ব্যবহার করছেন। তবুও কলিজার টুকরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অক্ষত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

মক্কার জালিম আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ সাহাবায়ে কেরামের বেষ্টনীর ওপর দিয়ে দোজাহানের বাদশাহকে আঘাত করার জন্য বারবার তরবারীর আঘাত হানছে। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শুধু হাতে সে তীক্ষ্ণধার তরবারীর আঘাত ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে তাঁর একটি হাত কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বেঁচে থাকার আর কোন আশা নেই, ঘাতকরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আঘাত করছে। আর করুণার সিন্ধু সেই চরম মুহূর্তেও মহান আল্লাহর কাছে ঘাতকদের জন্য বলছেন, 'রাব্বিগ্‌ফিরলি ক্বাওমি ফাইন্নাহুম লা ইয়া লামুন–হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা যে কিছুই বুঝে না।'

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁরা আবেদন করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি মাথা উঁচু করবেন না। তীর এসে বিদ্ধ হতে পারে। যত তীর আসে আসুক, আমাদের বুক আছে। আমাদের বুক দিয়েই আমরা তীর প্রতিরোধ করবো। রাসূল যাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করছেন, সেই জালিমের দলই রাসূলকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে এসে আঘাতের পরে আঘাত করছে। জালিম ইবনে কামিয়া তরবারী দিয়ে বিশ্বনবীর পবিত্র চেহারায় আঘাত করলো। তার তরবারীর আঘাতে আল্লাহর নবীর মাথার লোহার শিরস্ত্রাণের দুটো কড়া ভেঙ্গে চেহারা মোবারকে প্রবেশ করলো। মুসলমানদের নয়নের মনি, কলিজার টুকরা আল্লাহর নবী রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে বললেন, ঐ জাতি কি করে কল্যাণ লাভ করতে পারে, যারা তাদের নবীকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেয়! অথচ সে নবী তাদেরকে আল্লাহর দিকেই আহ্বান করছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীর এই সামান্য আক্ষেপ টুকুও পছন্দ করলেন না। সাথে সাথে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো। বলা হলো–

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَذِّ بَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ–

চূড়ান্তভাবে কোনো কিছুর ফয়সালা করার ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তোমার কোনোই ক্ষমতা নেই। আল্লাহরই ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন। কেননা তারা জালিম। (ইমরাণ-১২৮)

সীরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ করা হয়েছে, কাফেরদের আঘাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দান্দান মোবারক শাহাদাত বরণ করেছিল। তাঁর চেহারা মোবারকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। সে ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছিল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর ঢাল ভর্তি করে পানি আনছিলেন আর হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নবীর ক্ষত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। রক্ত যখন বন্ধ হলো না, তখন বিছানার একটা অংশ পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে দেয়ার পরে রক্ত বন্ধ হয়েছিল।

তুমি হবে শহীদদের নেতা

হক আর বাতিলের প্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘাতের দিনে অর্থাৎ বদরের প্রান্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর মাথার পাগড়ীর ভেতরে উট পাখির পালক লাগিয়ে ছিলেন। সেদিনও তিনি দু'হাতে তরবারী চালনা করে বাতিল শক্তির মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। মাথায় পাখির পালক থাকার কারণে তিনি যেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন, তাঁকে সহজেই চিহ্নিত করা যাচ্ছিল। নিহত হবার পূর্বে হযরত বিলালকে নির্যাতনকারী মক্কার কাফের নেতা উমাইয়া হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মাথায় উট পাখির পালক লাগানো লোকটি কে? হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছিলেন, তিনি বিশ্বনবীর চাচা হযরত হামজা। উমাইয়া আক্ষেপ করে বলেছিল, ঐ ব্যক্তি আজ আমদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে।

বদরের ময়দানে মক্কার জুবায়ের ইবনে মুতয়িমের চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর হাতে নিহত হয়েছিল। ওহুদের দিনে সে তার গোলাম ওয়াহশীকে শর্ত দিয়েছিল, তুমি যদি হামজাকে হত্যা করে আমার চাচাকে হত্যা করার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারো তাহলো আমি তোমাকে দাসত্বের এই ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তি দেবো। ওয়াহশী ওহূদের প্রান্তরে একটা বিশাল পাথর খন্ডের আড়ালে এমন একটা বর্শা হাতে ওৎপেতে বসেছিল, যে বর্শা দূর থেকে ছুড়ে প্রতিপক্ষকে

হত্যা করা যায়। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দু'হাতে তরবারী পরিচালনা করছেন আর কাফেরদের বুহ্য ভেঙ্গে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। শত্রুপক্ষ তাঁর সুতীক্ষ্ণধার তরবারীর সামনে ঝড়ের তান্ডবে পতিত কদলী বৃক্ষের মতই মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যে মুহূর্তে পাথর খন্ড অতিক্রম করছিলেন, পাথরের আড়ালে ওৎপেতে বসে থাকা ওয়াহশী তার হাতের বর্শা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নাভি লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলো।

তীক্ষ্ণ বর্শা নবীর প্রিয় চাচার নাভিমূলে বিদ্ধ হয়ে পৃষ্ঠদেশ পার হয়ে গেল। জীবনের এই শেষ মুহূর্তেও ইসলামের এই বীর সেনানী শত্রুকে আঘাত করার জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তাঁর জীবনী শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না। তিনি রক্তাক্ত দেহে ওহূদের রণপ্রান্তরে লুটিয়ে পড়লেন। মক্কায় আবু জেহেল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সামান্য আঘাত করেছিল, চাচা হামজা তা সহ্য করতে না পেরে আবু জেহেলকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওহূদের প্রান্তরে যখন আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ আল্লাহর নবীকে আঘাত করে রক্তাক্ত করেদিল, তখন হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে পারলেন না। ওয়াহশীর নিক্ষিপ্ত বর্শার আঘাত তাঁকে চিরদিনের মতই নিথর নিস্তব্দ স্পন্দনহীন করে দিয়েছে। তিনি আর কোনদিন আল্লাহর নবীর সামনে এসে দাঁড়াবেন না।

হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হত্যা করে ওয়াহশী যুদ্ধ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। সেদিন আর তার পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। দাসের জীবন থেকে সে মুক্তি লাভ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূলের সামনে এসে দাঁড়াতেই রাসূলের মানসপটে প্রিয় চাচা হামজার শত সহস্র স্মৃতি ভেসে উঠেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেদনা বিধুর হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বলেছিলে, ওয়াহশী! তুমি আমার সামনে এসো না। তোমাকে দেখলেই আমার চাচার কথা মনে পড়ে।

হযরত ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রতীজ্ঞা করেছিলেন, হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হত্যা করে যে পাপ তিনি করেছেন, জীবন দিয়ে

—৭

হলেও তিনি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খেলাফতের সময়ে হযরত ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ভন্ডনবী মুসাইলামাকে হত্যা করে তাঁর সে কৃতকর্মের কাফ্ফারা আদায় করেছিলেন।

কুরাইশদের নারী বাহিনী মুসলিম বাহিনীর শাহাদাত বরণকারীদের নিথর লাশের ওপরে শকুনের মতই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শহীদদের লাশের নাক কান ও বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে মালা বানিয়ে তাদের গলায় পরিধান করেছিল। আল্লাহর নবীর প্রিয় চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর স্পন্দনহীন লাশ নিয়ে মক্কার হিংস্র হায়েনার দল পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল। তাঁর পবিত্র নাক কান ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে মালা বানিয়ে তা গলায় পরিধান করে নগ্ন উল্লাস প্রকাশ করেছিল।

এতেও তাদের হিংস্র আক্রোশ চরিতার্থ হলো না, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পেট বুক চিরে ফেললো। রাসূলের চাচার বুকের ভেতর থেকে হিন্দা কলিজা বের করে আনলো। সে কলিজা হিন্দা চিবিয়ে খেয়ে ফেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা ছিল ভিন্ন ধরণের। হিন্দা সে কলিজা গিলতে না পেরে বমি করে ফেলে দিল। ইতিহাস মক্কার এই নারীকে 'কলিজা ভক্ষণকারিণী' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

যুদ্ধ অবসানে শহীদদের লাশ দাফন করা হচ্ছে। শাহাদাতের রক্তাক্ত ময়দানে আল্লাহর নবীর প্রিয় চাচার প্রাণহীন দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশের এ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কেরাম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। নবীজী অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, চাচা! তোমার ওপরে আল্লাহ্ রহম করুন। কিয়ামতের ময়দানে তুমি হবে শহীদদের নেতা। আমার মন চায় তোমাকে এভাবেই এখানে ফেলে রাখি। পশু পাখি তোমার লাশ ভক্ষণ করতো। কিয়ামতের দিন তোমাকে পশু পাখির পেট থেকে জীবন্ত বের করা হত। কিন্তু তোমার লাশ এভাবে ফেলে গেলে তোমার বোন শোকে অধির হয়ে পড়বে। চাচা! তুমি সৎ কাজে অগ্রগামী ছিলে। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি তোমার কতই না মমতা ছিল!

অদৃশ্য সেনাবাহিনী

দীর্ঘ অবরোধের কারণেও মুসলমানগণ যখন আত্মসমর্পণ দূরে থাক, বহাল তবিয়তে প্রতিরোধে প্রস্তুত, এ অবস্থা দেখে কুরাইশদেরকে হতাশা গ্রাস করেছিল। আবু সুফিয়ান ধারণা করেছিল, যতবড় বিশাল বাহিনী নিয়ে তারা মদীনা আক্রমন করতে যাচ্ছে, মাত্র কয়েক মুহূর্তের ভেতরে বিজয়ী হয়ে তারা মক্কায় ফিরে আসবে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা দেখে তার সে ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণ হলো। মুসলিম বাহিনীর কোন সমস্যাই তার চোখে পড়লো না। তাঁরা বীরের মতই পরিখার চারদিকে এবং মদীনা নগরীতে দাপটের সাথে প্রহরা দিচ্ছে। মুসলিম বাহিনীর আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মদীনার আকাশ বাতাস ছিল মুখরিত।

এতবড় একটা বিশাল বাহিনীর জন্য প্রতি দিন আহারের ব্যবস্থা করা মোটেও সহজ বিষয় ছিল না। শুধু সৈন্যবাহিনীর আহারের ব্যবস্থাই নয়, উট আর ঘোড়ার আহারের ব্যবস্থাও করতে হত। ইসলাম বিরোধী বাহিনী এবার সত্যই যেন এক মহা সমস্যার মুখোমুখি হলো। খায়বর থেকে তাদের জন্য মদীনা থেকে বহিষ্কৃত ইয়াহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব ২০ টি উট বোঝাই করে তাদের এবং যুদ্ধের উট ঘোড়ার খাদ্য প্রেরণ করেছিল। এ সমস্ত উট বোঝাই খাদ্য মুসলমানদের টহলদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হলো।

পবিত্র কোরআনে খন্দকের এই যুদ্ধকে 'আহযাব' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ সূরা আহযাবের ৯ নং আয়াতে বলেছেন−

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا−

হে ঈমানদারগণ! স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি করলেন তোমাদের প্রতি, যখন সেনাদল তোমাদের ওপর চড়াও হলো আমি পাঠালাম তাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ধূলিঝড় এবং এমন সেনাবাহিনী রওয়ানা করালাম যা তোমরা দেখোনি।

অর্থাৎ সময় মত আল্লাহর সাহায্য এসে উপস্থিত হয়েছিল। এবারের সাহায্য করার ধরণ ছিল পৃথক। একদিকে ছিল প্রচন্ড শীত। এই শীতের রাতে মহান আল্লাহ প্রচন্ড ঝড় সৃষ্টি করেছিলেন। সে ঝড়ের প্রলংকরী তান্ডবে ইসলাম বিরোধিদের সমস্ত কিছুই লন্ডভন্ড হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশ তাঁবু কোথায় যে উড়ে

গিয়েছিল, তার হদিস তারা বের করতে পারেনি। যুদ্ধের সমস্ত রসদ বিনষ্ট হয়েছিল এবং উট, ঘোড়া মারা পড়েছিল। ইয়াহূদীরা যখন কুরাইশদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন আবু সুফিয়ান তাদের ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। সে বারবার অনুরোধ করছিল, ঐক্যে যেন ভাঙ্গন না ধরে এবং সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করে। ইয়াহূদীরা বলেছিল, আমাদের ধর্মীয় দিনে আমরা কোনক্রমেই যুদ্ধ করতে পারবো না। কারণ একবার আমরা আমাদের ধর্মের নিষেধ অমান্য করে শুকর আর বানরে পরিণত হয়েছিলাম। অবশেষে আবু সুফিয়ান ঘৃণাভরে বলেছিল, এই শুকুর আর বানরের গোষ্ঠী আমাদের চরম সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়লো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রেরণ করেছিলেন ইসলাম বিরোধী বাহিনীর অবস্থা জানার জন্য। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তুমি শত্রুর শরীরে হাত উঠাবে না। তাদের অবস্থা সম্পর্কে জেনে আমার কাছে ফিরে আসবে। তিনি শীতের এক গভীর রাতে পরিখা পার হয়ে চুপিসারে বিরোধিদের শিবিরে প্রবেশ করলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, আমি দেখলাম তখনও ঝড় বইছে। তাদের রান্নার চুলাগুলো নিভে গেছে। উট আর ঘোড়াগুলো মরে পড়ে আছে। তাঁবুগুলো সব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। খাদ্য প্রস্তুতের সর ামাদি উল্টে পড়ে আছে। চারদিকে অন্ধকার। হঠাৎ আমি আবু সুফিয়ানের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সে তার বাহিনীর লোকদের লক্ষ্য করে বললো, তোমরা সাবধান! শত্রুদের কেউ তোমাদের মাঝে প্রবেশ করতে পারে। তোমাদের পাশে কে আছে লক্ষ্য রেখো।

আবু সুফিয়ানের কথা শুনে আমিই প্রথমে আমার পাশে যে ছিল তার শরীরে হাত দিয়ে বললাম, এই তুমি কে? সে তার পরিচয় দিল। আমি আরেকজনের শরীরে হাত দিয়ে বললাম তুমি কে? সে তার পরিচয় দিল। তারপর আমি আবু সুফিয়ানের হতাশা ব্যঞ্জক কথা শুনলাম। সে তার লোকদেরকে বলছে, আমাদের চরম সর্বনাশ ঘটেছে। সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে গেছে। আর আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, চলো আমরা ফিরে যাই। আমি ইচ্ছা করলে আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিষেধ ছিল, আমি যেন কোন ধরণের কিছু না ঘটাই। তারপর আমি ফিরে এসে আল্লাহর রাসূলকে তাদের সব ঘটনা অবগত করলাম। তারপরের দিন বিরোধিরা তাদের সমস্ত কিছু গুটিয়ে নিয়ে মদীনা ত্যাগ করেছিল।

এমন দৃশ্য আমি কোথাও দেখিনি

হুদায়বিয়া সন্ধির সময় কুরাইশদের প্রেরিত ওরউয়া ইবনে মাসুদ সাকাফীর সাথে আল্লাহর রাসূলের আলোচনা শুরু হলো। তদানীন্তন আরবের প্রথা ছিল যে, কথা বলার সময় প্রতিপক্ষের দাড়িতে হাত স্পর্শ করে কথা বলা। ওরউয়া ইবনে মাসুদ সাকাফী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দাড়িতে তার হাত স্পর্শ করে কথা বলছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পেছনে হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শানিত তরবারী হাতে ওরউয়া ইবনে মাসুদ সাকাফীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। লোকটি বারবার তার হাত নবীর পবিত্র দাড়িতে স্পর্শ করছিল।

এটা আরবের চিরন্তন প্রথা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি। কিন্তু প্রিয় সাহাবী মুগিরা ইবনে শো'বা তা সহ্য করতে পারলেন না। একজন কাফির মুশরিক নবীর পবিত্র দাড়িতে হাত দিবে, বর্তমান চৌদ্দশত সাহাবী তাঁর সাথে থাকতে। হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা সিংহের মতই গর্জন করে উঠলেন। তিনি সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'ওরউয়া! তোমার হাত সরিয়ে নাও! আর একবার যদি তোমার হাত আল্লাহর রাসূলের দাড়ি স্পর্শ করে, তাহলে আমার তরবারী তোমার হাতকে ফিরিয়ে দেবে।

একজন অমুসলিম আরবের প্রথা অনুসরণ করেছে, এটা সে সময়ে কোন মর্যাদাহানীকর বিষয়ও ছিল না। তখন মুসলমানদের সংখ্যাও মাত্র কয়েক হাজার। সেই কঠিন মুহূর্তেও তাঁরা নবীর প্রতি সামান্য অমর্যাদা সহ্য করেননি। আর বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় দেড়শত কোটির ওপরে। তাদের সামনে নবীকে গালি দেয়া হয়, মুসলমানদের মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া হয়, নবীর বিরুদ্ধে চরম আপত্তিকর বই প্রকাশ করা হয় অথচ মুসলমানরা নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এই জাতি পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ভোগ করবে না তো কি ভিন্ন কোন জাতি করবে?

ওরউয়া ইবনে মাসুদ সাকাফী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে যতক্ষণ আলোচনা করছিল, ততক্ষণ সে সমস্ত সাহাবীর ব্যবহার এবং তাদের চলাফিরার প্রতি দৃষ্টি রাখছিল। রাসূলের প্রতি সাহাবাদের ব্যবহার দেখে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিল। মানুষ যে আরেকজন মানুষকে এতটা ভক্তি শ্রদ্ধা করতে

পারে অকৃত্রিমভাবে, এটা ছিল তার কল্পনার অতীত। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে সাহাবায়ে কেরামের আচরণ লক্ষ্য করছিল। সে তার বিস্ময় চেপে রাখতে পারেনি। কুরাইশদের কাছে ফিরে এসে বলেছিল, আমি পারস্য সম্রাটের দরবার দেখেছি, রোম সম্রাটের দরবার দেখেছি, নাজ্জাশীর দরবার দেখেছি। কিন্তু কোন মানুষকে অন্য কোন মানুষ যে এত ভক্তি করতে পারে, এত শ্রদ্ধা করতে পারে, হৃদয় দিয়ে যে এভাবে আদেশ পালন করতে পারে, এভাবে আনুগত্য করতে পারে আমি তা কোন দিন কোন দরবারে দেখিনি।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর অনুসারীরা কি যে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাঁর আদেশ যে কিভাবে তাঁরা প্রতিযোগিতামূলকভাবে পালন করে, তা তোমরা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন অজু করেন, তখন অজুর সেই পরিত্যক্ত পানি শরীরে স্পর্শ করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর মুখ থেকে কফ বা থুথু নিক্ষেপ করেন, সাহাবায়ে কেরাম সে থুথু কার আগে কে নিবে, প্রতিযোগিতা করতে থাকে। সেই থুথু তাঁরা তাঁদের শরীরে মাখে। আমি ভক্তি শ্রদ্ধার এই ধরণের দৃষ্টান্ত কোথাও দেখিনি। তবে তোমরা যদি এ ধারণা করে থাকো যে, তোমাদের আক্রমনের মুখে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামে সাথীরা তাঁকে ত্যাগ করে পালাবে, তাহলে মনে রেখো, পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়েও তাঁরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ত্যাগ করবে না।

হোদায়বিয়ার সন্ধি-বিজয়ের প্রকাশ্য নিদর্শন

কুরাঈশদের প্রতিনিধি সুহায়েল ইবনে আমর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদায়বিয়া সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা শুরু করলো। দীঘক্ষণ যাবৎ আলোচনা চললো। তারপর উভয় পক্ষের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। সন্ধির শর্তের ভেতরে এমন কিছু শর্ত ছিল, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অবমাননাকর। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামএ সমস্ত শর্ত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। পক্ষান্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা পেয়েছিলেন, এই অসম্মানজনক শর্তের ভেতরেই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তিনি কুরাইশদের এসব শর্ত গ্রহণ করেই সন্ধি স্থাপন করলেন। আল্লাহর রাসূল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা

আনহুকে সন্ধির বিষয় বস্তু লিখতে বললেন। সে সময়ে আরবে প্রথা ছিল, কোন কিছু লিখতে তারা শুরুতে লিখতো, 'বিইছমিকা আল্লাহুম্মা'। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সন্ধি পত্রের শুরুতেই লিখলেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। এই ধরণের লিখার সাথে মক্কার পৌত্তলিকরা অপরিচিত ছিল। কুরাইশদের প্রতিনিধি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখা দেখে আপত্তি জানিয়ে বললো, 'বিইছমিকা আল্লাহুম্মা' লিখতে হবে।

আল্লাহর নবী তাদের দাবীই গ্রহণ করলেন। এরপর লিখা হয়েছিল, এই চুক্তিনামা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মেনে নিয়েছেন। কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহায়েল ইবনে আমর 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দ লিখা দেখে তীব্র আপত্তি জানিয়ে বললো, আমরা যদি আপনাকে রাসূল হিসেবেই স্বীকৃতি দিতাম তহালে তো এত কিছুর প্রয়োজনই হত না। এই 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দ আমরা গ্রহণ করতে পারি না। এখানে লিখতে হবে, 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সুহায়েল! তুমি অবিশ্বাস করছো? আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহই আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

এ কথা বলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে আদেশ দিলেন, 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ'-এর পরিবর্তে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আল্লাহর নবীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দটা তিনি নিজে হাতে মুছে দিবেন! এটা কি সম্ভব! তাঁর শরীরে প্রাণের স্পন্দন থাকা পর্যন্ত 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দ তিনি নিজের হাতে মুছে ফেলতে পারবেন না। বিনয়ে বিগলিত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মৃদু কণ্ঠে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নাম মুছে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আল্লাহর রাসূল তাঁর প্রিয় সাহাবীর মনের অবস্থা অনুভব করলেন। তিনি হযরত আলীকে বললেন, কোথায় 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দটি আমাকে দেখিয়ে দাও, আমিই মুছে দিচ্ছি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সন্ধি পত্রের ওপরে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দটির ওপরে নিজের হাতের আঙ্গুল রেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর নামের সাথে

'রাসুলুল্লাহ' শব্দটি মুছে দিলেন এবং পরবর্তীতে ইবনে আব্দুল্লাহ' শব্দ দুটো সংযোজন করা হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার কুরাইশদের লিখিত সন্ধি হলো। চলতি বছর মুসলমানগণ হজ্জ না করেই মদীনায় ফিরে যাবে। দশ বছরের জন্য পরস্পরের ভেতরে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। পরের বছর মুসলমানগণ ইচ্ছা করলে হজ্জ করতে আসতে পারবে। তবে কোন ধরণের অস্ত্র বহন করতে পারবে না। আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানগণ যে অস্ত্র বহন করবে, সে অস্ত্রও কোষবদ্ধ থাকবে। মুসলমানগণ হজ্জের তিনদিন মক্কায় অবস্থান করবে। এই তিনদিন কুরাইশরা মক্কার বাইরে অবস্থান করবে। হজ্জের সময় মুসলমানদের প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদে থাকবে। মক্কার ব্যবসায়ীগণ মদীনার পথে নিরাপদে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করবে। তাদেরকে আক্রমন করা যাবে না।

আরবের যে কোন গোত্র কুরাইশ বা মুসলমানদের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হতে পারবে। এ ব্যাপারে কোন পক্ষই কোন আপত্তি করতে পারবে না। মক্কার কোন লোক তাঁর অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মদীনায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে তাকে মক্কার কুরাইশদের কাছে প্রত্যার্পণ করতে হবে। কিন্তু মদীনার কোন মুসলিম মক্কায় চলে এলে তাকে প্রত্যার্পণ করা হবে না। প্রথম থেকেই যে সমস্ত মুসলমান মক্কায় বাস করছে, তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং মক্কায় যারা থেকে যেতে চায় তাদেরকে বাধা দান করা যাবে না। সন্ধির শর্ত সকল পক্ষ অনুসরণ করে চলবে।

এ সময়টি ছিল সাহাবায়ে কেরামের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার সময়। এই ধরণের অবমাননাকর চুক্তি আল্লাহর রাসূল কেন করলেন, তা তাদের বোধগম্য হলো না। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিনদিন হোদায়বিয়াতে অবস্থান করে মদীনার দিকে অগ্রসর হলেন। সাহাবায়ে কেরাম মদীনা থেকে যে আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস নিয়ে মক্কার দিকে এসেছিলেন, এখন আর তাদের ভেতরে সে আনন্দের লেশ মাত্র নেই। তার পরিবর্তে তাদের ভেতরে জমা হয়েছে হতাশা আর অভিমান। মনে বড় আশা ছিল, মাতৃভূমি মক্কাতে থাকতে না পারলেও অন্তত দীর্ঘ দিন পরে প্রাণ ভরে মক্কাকে দেখবেন। সে ভাগ্য তো হলোই না, এমন এক ধরণের সন্ধির কাছে নতি স্বীকার করে যেতে হচ্ছে, যে সন্ধি পরাজয়মূলক। ভগ্ন হৃদয়ে তাঁরা মদীনার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আহ্বান জানিয়ে মহান আল্লাহর ঘোষণা শুনিয়ে দিলেন। যে কারণে মুসলমানদের মন খারাপ ছিল, আল্লাহ সেদিকেই ইঙ্গিত করে জানিয়ে দিলেন–

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا-لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَه عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا- وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا-هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ-وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا-

হে রাসূল! আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। যেন আল্লাহ তোমার পূর্বের এবং পরের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তোমার ওপর তাঁর নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দেন ও তোমাকে নির্ভুল ঋজু পথ দেখান। আর তোমাকে প্রবল পরাক্রান্ত সাহায্য করেন। সেই আল্লাহই মুমিনদের অন্তরসমূহে শান্তি-প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন, যেন তাদের ঈমানের সাথে আরো একটি ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়। আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৈন্য সামন্ত আল্লাহর কুদরতের আয়ত্বের মধ্যে রয়েছে এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞানী। (সূরা ফাতাহ-১-৪)

তার সাম্রাজ্যও টুকরা টুকরা হবে

পারস্যে সম্রাটের কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হোজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। পারস্যের দরবারের নিয়ম ছিল সম্রাট যতক্ষণ আদেশ না দিতেন, ততক্ষণ কোন ব্যক্তি মাথা উঠাতো না। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দরবারে প্রবেশের সময় এই নিয়ম তাঁকে একজন শিখিয়ে দিল। তিনি বললেন, 'আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, কারণ আমরা এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছে মাথানত করি না।' প্রহরী তাকে জানালো, এই নিয়ম পালন না করলে সম্রাট কারো পত্র গ্রহণ করেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হোজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দরবারে প্রবেশ করলেন। সম্রাট দরবারে প্রবেশ করে সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। সবাই মাথা নিচু করে আছে আর একজন লোক মাথা উঁচু করে

গর্বিত ভঙ্গীতে বসে আছে। তিনি লোকটির পরিচয় জানতে চাইলেন। তাকে বলা হলো, লোকটি এসেছে সেই আরব থেকে। আপনার জন্য সে একটি বার্তা এনেছে। সম্রাট তাঁকে কাছে আসতে বললেন। নবীর সাহাবী কাছে এসে তাকে সালাম জানিয়ে আল্লাহর রাসূলের পত্র তার কাছে হস্তান্তর করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্রাটের কাছে লিখেছিলেন–

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহান আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট খসরুর কাছে। যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে তাদের প্রতি সালাম। আমি সাক্ষ্য দান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ দাসত্ব লাভের উপযোগী নয় এবং আমি তাঁর প্রেরিত রাসূল। জীবিত মানুষকে সতর্ক করার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। তোমার প্রতি আমার আহ্বান, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। তোমার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হবে। যদি না করো তাহলো তোমার শাসিত প্রজাদের যাবতীয় অন্যায় কাজের জন্য তুমি দায়ী হবে।

পত্রের শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম মোবারক সীল মোহর করা ছিল। অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শব্দ সীল মোহর করা ছিল। পারস্যের সম্রাট খসরু ছিল চরম পাপাচারী ব্যক্তি। পৃথিবীর কোন মানুষ তার সমপর্যায়ের হতে পারে, এটা সে মানতো না। আল্লাহর নবীর পত্র পাঠ করার সাথে সাথে সে অহংকারে গর্জে উঠলো। চিৎকার করে বললো, এতবড় সাহস কার! আরবের সামান্য একজন মানুষ আমাকে বলে আমার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য? সে আমার নামের পূর্বে নিজের নাম লিখেছে?

চরম অহংকারের বশবর্তী হয়ে সে আল্লাহর রাসূলের পত্র ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেললো। তার ধৃষ্টতার এখানেই শেষ হলো না। ইয়েমেনের গভর্ণর বাজানকে আদেশ দিল, আরবের নবী সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতার করে তার দরবারে প্রেরণ করা হোক। পারস্য সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী বাজান দুইজন রাজ কর্মচারীকে মদীনায় প্রেরণ করলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার জন্য। আল্লাহর নবীর দরবারে তারা গমন করে জানালো, আমরা পারস্য সম্রাটের আদেশ মত আপনাকে গ্রেফতার

করতে এসেছি। আপনি স্বেচ্ছায় যদি আমাদের সাথে না যান তাহলে সৈন্য বাহিনী আগমন করতে বাধ্য হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সমাদর করে তাদের মেহমানদারী করলেন। আল্লাহর রাসূলের সাথে সাহাবায়ে কেরামের ব্যবহার দেখে পারস্য রাজের কর্মচারীবৃন্দ অবাক হয়ে গেল। তারা পুনরায় জানালো, আপনি যদি আদেশ অনুসারে উপস্থিত হন, তাহলে ইয়েমেনের গভর্ণর আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারেন। আর তা যদি না করেন তাহলে আপনার শহর তিনি মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জানালেন, আপনাদের প্রশ্নের জবাব আমি আগামীকাল দেব।

তাদেরকে রাষ্ট্রীয় মেহমান খানায় রাখা হলো। তারা অবাক হলো, পারস্যের সম্রাটের আদেশে মানুষ থরথর করে কাঁপে। অথচ এই মানুষটির ভেতরে কোন ধরণের প্রতিক্রিয়া নেই। পরের দিন তারা নবীর দরবারে এলেন। আল্লাহর রাসূল তাদেরকে জানালেন, তোমাদের সম্রাট আর এই পৃথিবীতে জীবিত নেই। তার সন্তান তাকে গতরাতে হত্যা করেছে। তোমাদের গভর্ণর বাজানকে বলবে, পারস্য সম্রাট যেমন আমার পত্রকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করেছে, মহান আল্লাহ পারস্য সাম্রাজ্যকে তেমনি টুকরা টুকরা করে দেবেন। বাজানকে বলবে, সে যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে তাকে আমি তার পদেই বহাল রাখবো। কারণ, অচিরেই ইসলাম পারস্যের সিংহাসনে বসবে।

পারস্যের দূতগণ অবাক হয়ে ইয়েমেনে ফিরে গেল। সেখানেই তারা জানতে পারলো, সম্রাট খসরুর সন্তান সিরওয়াহ পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছে। সে বাজানের কাছে সংবাদ প্রেরণ করেছে, দ্বিতীয় আদেশ না দেয়া পর্যন্ত আরবের সেই নবীর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেন না হয়। ইয়েমেনের গভর্ণর তার দূতের মুখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ অবগত হলেন। তারপরই সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাঁর সাথে দরবারের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

কামুস দুর্গ বিজয়ী বীর

খায়বরে বিশাল আকৃতির ছয়টি দূর্গ ছিল। মারবাত্বাহ দুর্গ, সালেম দুর্গ, নাত্বাত দুর্গ, শাক্ক দুর্গ, কামারাহ দুর্গ, ও কামুস দুর্গ। এ সমস্ত দুর্গে প্রায় বিশহাজার সৈন্য ছিল। সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ ছিল কামুস দুর্গ। মদীনা হতে বহিষ্কৃত ইহুদীরা এই দুর্গেই

বাস করতো। এই দুর্গে অধিপতি ছিল মারহাব নামক এক বিখ্যাত বীর। তদানীন্তন আরবে যাকে এক হাজার যোদ্ধার সাথে তুলনা করা হত। যুদ্ধে প্রায় দুর্গই মুসলমানদের দখলে চলে এসেছিল। কিন্তু কামুস দুর্গ দখল করা গেল না। এই দুর্গেই অবস্থান করছিল তাদের বিখ্যাত বীর মারহাব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সেনাপতি করে এই কামুস দুর্গ জয় করার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি জয় করতে পারলেন না। এবার প্রেরণ করা হলো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে। তিনিও পারলেন না।

আল্লাহর নবী করলেন, আমি আগামী কাল এমন একজনের হাতে পতাকা অর্পণ করবো, মহান আল্লাহ তাঁকে বিজয়ী করবেন। সেই ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসে।

আল্লাহর নবীর এই ঘোষনা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এক অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। কে সেই সৌভগ্যবান ব্যক্তি, যাকে স্বয়ং আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তাঁর রাসূলও ভালোবাসেন। পরের দিন সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সকল জল্পনা কল্পনার অবসান করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নাম ঘোষনা করলেন। সাহাবায়ে কেরামের কাছে হযরত আলীর নামটি অপ্রত্যাশিত ছিল। কারণ, তাঁরা জানতেন হযরত আলী চোখের পীড়ায় অসুস্থ হয়ে আছেন। এ অবস্থায় তাকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। অসুস্থ হযরত আলীকে ডেকে আনা হলো। আল্লাহর নবী তাঁর চোখে পবিত্র মুখের লালা দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীর হাতে পতাকা উঠিয়ে দিলেন। বললেন, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করবে। তাদের একজনও যদি তোমার প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সেটা মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যুদ্ধে গমন করলেন। আরবের বিখ্যাত বীর মারহাব যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে দুর্গ থেকে বের হলো। তার মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ এবং তার ওপরে পাথরের খোল। তার সাথে হযরত আলীর প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হলো। এক পর্যায়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহু আকবর বলে গর্জন করে মারহাবের মাথার ওপরে নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দেয়া তরবারী দিয়ে আঘাত করলেন। হাদীস এবং ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, সে আঘাতে মারহাবের মাথার শিরস্ত্রাণের ওপরের পাথর দু'ভাগ হয়ে শিরস্ত্রাণ দু'ভাগ হলো, তারপর তার মাথা দু'ভাগ হয়ে মুখের দাঁত পর্যন্ত তরবারী পৌঁছে গেল।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম খুনের ঘটনা

পবিত্র কোরআনে হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের দুই সন্তানের নাম উল্লেখ না করেই তাদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে আদমের দুই পুত্র। কিন্তু কোনো নাম উল্লেখ করা হয় নি এবং প্রয়োজনও ছিল না। বাইবেলে এ সম্পর্কে বিশাল এক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের নাম কাবীল ও হাবীল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলের রচয়িতাগণ কোথা থেকে এই কাহিনী আবিষ্কার করেছে তা জানার কোনো উপায় নেই। ইবনে কাসীর হাদীসের বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত হাওয়ার গর্ভে জমজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করতো। প্রথম বারের জমজ ছেলে ও মেয়ের সাথে পরের বারের জমজ ছেলে ও মেয়ের বিয়ে দেয়া হতো।

এই নিয়ম অনুসারে উভয়ের বিয়ের সময় ঘনিয়ে এলো। প্রথম জনের সাথে যার বিয়ে হতে যাচ্ছিল সে ছিল ছোটজনের ভবিষ্যৎ স্ত্রীর তুলনায় সুন্দরী। এই ব্যাপার নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিলো। পিতা আদম এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন এভাবে যে, উভয়ে আল্লাহর নামে কোরবানী করবে, যার কোরবানী আল্লাহ কবুল করবেন, সে যাকে ইচ্ছা তাকে বিয়ে করতে পারবে। বাইবেলের বর্ণনায় দেখা যায়, সে সময়ে কোরবানীর অবস্থা এমন ছিল যে, কোরবানীর পরে তা কোনো পাহাড়ের ওপরে রেখে আসা হতো। আকাশ থেকে আগুন এসে সে কোরবানী পুড়িয়ে দিত। এতে বুঝা যেত যে, কোরবানী কুবল হয়েছে।

পিতার পরামর্শ অনুসারে ছোটজন নিজের পশু সম্পদ থেকে একটি উৎকৃষ্ট পশু কোরবানীর দিয়েছিলো। আর বড়জন তার শষ্য ভান্ডার থেকে নিম্ন মানের শষ্য কোরবানীর জন্য পেশ করেছিল। কোরবানীর ব্যাপারে বড়জন হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছিল। ফলে আকাশ থেকে আগুন এসে ছোটজনের কোরবানী পুড়িয়ে দিল। প্রমাণ হলো ছোটজনের কোরবানী কবুল হয়েছে। কিন্তু বড়জনের মনে হিংসা

জেগে উঠলো। সে স্পষ্ট ঘোষণা দিল, ছোটজনের আশা সে পূরণ হতে দিবে না এবং এ জন্য সে হত্যা করলো। তখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যে কয়জন মানুষ ছিল, তাদের কারোই মৃত্যু হয়নি। সুতরাং মৃত মানুষ সম্পর্কে কোনো বিধানের প্রয়োজন তখন পর্যন্ত প্রয়োজন হয়নি বিধায় তা অবতীর্ণ হয়নি। এ কারণে বড়জন জানতো না মৃত দেহ কি করতে হয়। মৃত দেহ কি করা যায়, এ চিন্তায় হত্যাকারী অস্থির হয়ে পড়েছিল। তারপর সে দেখলো একটি কাক গর্ত খুঁড়ে আরেকটি কাককে মাটি চাপা দিচ্ছে। এটা দেখে সে আক্ষেপ করলো, আমি কি ঐ বাকশক্তিহীন প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট? আমি আমার অপরাধ গোপন করতেও পারি না? তখন সে মাটি খুঁড়ে ছোট ভাইয়ের লাশ মাটি চাপা দিয়েছিল।

কিন্তু পবিত্র কোরআনে সুন্দরী মেয়েকে কে বিয়ে করবে এ নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে বড় ভাই ছোট ভাইকে হত্যা করেছিল এ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। সেখানে কোরবানীর কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ-قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ-قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ-لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ-اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ- اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓءَ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ-فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ-قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ-

তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের কাহিনীটিও সম্পূর্ণ শুনিয়ে দাও। তারা দুইজনই যখন কোরবানী করলো, তখন তাদের মধ্যে একজনের কোরবানী কবুল করা হলো ও অপরজনেরটা করা হলো না। সে বললো, আমি তোমাকে হত্যা করবো। উত্তরে সে বললো, আল্লাহ তো মুত্তাকীদেরই মানত কবুল করে থাকেন। তুমি যদি

আমাকে হত্যা করর জন্য হাত উঠাও তাহলে আমি তোমাকে হত্যার জন্য কখনো হাত তুলবো না। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি। আমি চাই, আমার এবং নিজের গোনাহ্ তুমি একাই নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও ও জাহান্নামী হয়ে থাকো। জালিমদের জুলুমের এটাই উপযুক্ত প্রতিফল। শেষ পর্যন্ত তার নফ্স নিজ ভাইয়ের হত্যাকান্ডকে তার জন্য সহজসাধ্য করে দিল এবং তাকে হত্যা করে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলো। এরপর আল্লাহ একটি কাক প্রেরণ করলেন। তা যমীন খুড়তে লাগলো। সে নিজ ভাইয়ের লাশ কিভাবে লুকাবে, তার পন্থা দেখিয়ে দিল। এটা দেখে সে বললো, আমার প্রতি ধিক! আমি এই কাকটির মতও হতে পারলাম না। নিজ ভাইয়ের লাশ লুকানোর পন্থাও বের করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত সে নিজের কৃতকর্মের জন্য খুবই অনুতপ্ত হলো। (সূরা মায়িদা)

পবিত্র কোরআনের এই বর্ণনা হতে জানা যায়, ছোটজনের বক্তব্য ছিল, আল্লাহ কোরবানী কবুল করেন আল্লাহভীতির কারণে। তোমার মধ্যে আল্লাহভীতি নেই এ কারণে তোমার কোরবানী কবুল হয়নি। আমাকে হত্যা করে তোমার মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবে না। হত্যার মতো পাপ করার পরিবর্তে তোমার মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টির সাধনা করা উচিত। ছোটজনের কথার উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, আমাকে তুমি হত্যা করবে আর আমি নিজেকে বাঁচানোর কোনো চেষ্টা করবো না। বরং তার কথার অর্থ হলো, আমাকে তুমি হত্যা করার কথা বলছো, কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করার কোন চেষ্টা করবো না। অর্থাৎ আমি জানি তুমি আমাকে হত্যা করবে, কিন্তু এ কারণে আমি তোমাকে প্রথমে আক্রমন করে পাপী হবো না। এই হত্যার উদ্দেশ্যে প্রথম আক্রমন তুমিই করো এবং যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তুমিই বহন করবে।

হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের এই দু'পুত্রের কাহিনী পবিত্র কোরআনে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট হয়ে যায় এই দু'জনের মধ্যে একজন ছিল আল্লাহভীরু। আরেকজন ছিল শয়তানের অনুসারী। যে শয়তানের অনুসারী ছিল, তার অজ্ঞানতা আর মূর্খতা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়ে ছিলো যে, একটি লাশের সৎগতি কিভাবে করবে, সেটাও তার জ্ঞানের বাইরে ছিল। মহান আল্লাহ এই পাপীষ্ঠের স্বভাবের সাথে সাদৃশ্য রেখে এমন একটি নিকৃষ্ট প্রাণী প্রেরণ করে তাকে শিক্ষা দিলেন, যে প্রাণীটি অত্যন্ত নোংরা-ধূর্ত, কলহ প্রিয় এবং প্রতারক স্বভাবের। এই হত্যাকান্ড সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীতে যখনই কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তখনই এর পাপ অবশ্যই আদমের প্রথম পুত্রের ওপরে যায়। কারণ, সে-ই প্রথম ব্যক্তি– যে অন্যায়ভাবে হত্যা আরম্ভ করে এই অপবিত্র প্রথার প্রবর্তন করেছে।

সর্বপ্রথম কলমের ব্যবহার

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পবিত্র কোরআন এবং কোরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীসসমূহ যে সমস্ত ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করেছে, তা নিছক ঐতিহাসিক কাহিনী হিসেবেই বর্ণনা করেনি। মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যই বর্ণনা করা হয়েছে। অতীত কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের দ্বারা মানব সভ্যতা উন্নয়নের জন্যই এ সব কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ-اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا-
وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا-

আর স্মরণ করুন এই কিতাবে ইদ্রিসের কথা। সে এক সত্যপন্থী মানুষ এবং নবী ছিল। আর তাকে আমি উচ্চতর স্থানে উন্নীত করেছি। (সূরা মারয়াম-৫৬-৫৭)

অর্থাৎ হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম একজন নবী ছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাঁকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। পবিত্র কোরআন হাদীস এবং সঠিক ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, এই পৃথিবীতে মানব সভ্যতা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়েছে নবীদের মাধ্যমে। নবী-রাসূলগণই মানুষকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়েছেন। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সামনে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করে না। কোন কোন দেশে তো এমন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে ক্লাবে প্রবেশের শর্তই হলো, ক্লাবের সদস্যদেরকে সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন হয়ে প্রবেশ করতে হবে। মানুষের ভেতরে লজ্জার অনুভূতি জাগ্রত করেছেন আল্লাহর নবীগণ। এ কারণে কোন একজন মুমিন বান্দাহ্কে পৃথিবীর সমস্ত কিছুর বিনিময়েই বস্ত্রহীন হতে রাজী করানো যাবে না। মানুষকে দাঁত পরিষ্কার করা, পরণের পোষাক পবিত্র রাখা, চুল দাড়ি সুন্দরভাবে রাখা, গোছল করা ইত্যাদী

শিক্ষা দিয়েছেন নবীগণ। মানুষের ব্যক্তিত্ব রুচি তথা একজন মানুষকে সার্বিক দিকে সুন্দর করে গড়েছেন নবী রাসূলগণ। সেই সাথে পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানও শিক্ষা দিয়েছেন, বস্তুর ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন।

ইবনে হাব্বানে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালামই সর্বপ্রথম কলম ব্যবহার করেছেন। এই বর্ণনা থেকেও প্রমাণ হয় যে, হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের পূর্বের নবী ছিলেন। একজন সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাম্‌লের নকশা বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই জ্ঞান একজন নবীকে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং কোন ব্যক্তির অঙ্কিত নকশা যদি সেই নকশার সাথে মিলে যায় তাহলে তাই সত্য হবে নতুবা সত্য হবে না। হাফেজ ইমাম উদ্দিন ইবনে কাসীর বিভিন্ন বর্ণনার সাথে এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, তাফসীর ও বিধি-বিধান সম্পর্কিত অভিজ্ঞ বহু আলিমের ধারণা যে, হযরত ইদ্রিস আলায় হিস্ সালামই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাম্‌লের নকশা সম্পর্কে পূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম ছিলেন পৃথিবীর প্রথম জ্যোতির্বিদ। এই বিজ্ঞানের তিনিই ছিলেন জনক।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষকগণ হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে, তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে অতীতে যেমন গবেষণা করেছেন, বর্তমানেও গবেষণা করছেন। তিনি পৃথিবীর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোথায় প্রতিপালিত হয়েছেন, নবুয়্যাত লাভ করার পূর্বে কার কাছে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন, এ সম্পর্কে পৃথিবীর গবেষকগণ ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেননি। একদল গবেষক বলেন, তাঁর নাম ছিল হারমাসুল হারামেসাহ্। তিনি মিশরের মানাফ নামক এক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইবনে কাসীর বলেছেন, তাকে হারমাসুল হারামেসাহ্ এ কারণে বলা হতো যে, তিনিই হলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রথম শিক্ষক।

হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ পৃথিবীর মানুষকে গণিত বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বস্তু বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। বিশাল দেশ একজন শাসকের অধীনে পরিচালিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ কারণে দেশকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতিতেই পৃথিবীর বিশাল দেশসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। এই শাসন পদ্ধতির কারণে উন্নয়নের ধারা গোটা দেশে ছড়িয়ে

পড়ে। এর সুফল সাধারণ মানুষ ভোগ করে। প্রাদেশিক সরকারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এই শাসন পদ্ধতির প্রবর্তক হলেন হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম। তিনি যখন বিশাল রাজ্যের শাসক ছিলেন তখন অনুভব করছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এতবড় একটি বিশাল সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা, গোটা সাম্রাজ্যে উন্নতি করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এ সময়ে তাঁর ওপরে আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী অবতীর্ণ করা হয়। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়। তিনি তাঁর সাম্রাজ্য চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে চারজন গভর্ণর নিযুক্ত করেন। বর্তমান পৃথিবীতে আমরা যেসব বিজ্ঞান দেখছি, এর অধিকাংশই হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালামের যুগে এসেছিল। হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম তাঁর জাতির জন্য ইসলামের হালাল হারামের বিধান পেশ করেছিলেন। তাদের দৈনন্দিন জীবন ধারা আল্লাহর বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। আল্লাহর নামে কিভাবে কোরবানী করতে হবে, কিভাবে রোজা পালন করতে হবে, তথা আল্লাহর বিধান পালনের মাধ্যমে মানুষ কিভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে, এ শিক্ষা তিনি তাঁর জাতিকে দিয়েছিলেন। তাঁর সে শিক্ষা পরবর্তীতে বিভ্রান্ত মানুষের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে পড়েছিল। হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালামের নেতৃত্বে ইসলামের ভিত্তিতে যে উন্নত সভ্যতার বিকাশ এক সময় আরবে ঘটেছিল, মহাকালের গর্ভে সে সভ্যতা বিলীন হয়ে গেলেও তার ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে আবিষ্কৃত হচ্ছে।

তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম এমন এক জাতির ভেতরে আগমন করেছিলেন, যারা ছিল সম্পূর্ণ রূপে অন্ধকারে নিমজ্জিত। আকাশের তারকা, সূর্য, চন্দ্র, বৃক্ষ, মাটির মূর্তি ইত্যাদীর পূজা করতো তারা। গোটা জাতি ছিল শিরকে পরিবেষ্টিত। এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো আইন মানা যাবে না। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সামনে মাথানত করা যাবে না। তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করতো হবে। আল্লাহর দেয়া বিধানই চূড়ান্ত বিধান, তাঁর বিধানের মোকাবেলায় অন্য সমস্ত বিধান বাতিল বলে গণ্য হবে, এ সমস্ত কথা যেন তারা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল।

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম তাঁর জাতির প্রতি আহ্বান জানালেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো। এখন যাদেরকে

তোমরা ইলাহ হিসেবে পূজা করছো, এদের কোন শক্তিই নেই। বরং এরা হলো মহান আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং কোন সৃষ্টির দাসত্ব না করে স্রষ্টার দাসত্ব করো। কিন্তু হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের জাতি তাঁর কথার প্রতি কোন গুরত্ব দিল না। তারা যে মত এবং পথের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে মত ও পথকে অভ্রান্ত মনে করে তারই অনুসরণ করতে থাকলো। আল্লাহর নবী বারবার তাদেরকে যুক্তির মাধ্যমে বুঝাতে থাকলেন, আল্লাহই হলেন মানব জাতির একমাত্র আইন দাতা, বিধান দাতা, রিজিক দাতা, তিনিই মানব জাতির পালন কর্তা, সুতরাং দাসত্ব লাভের একমাত্র অধিকারী তিনিই। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তোমরা যারা আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে নিজেদের তৈরী বিধান অনুসরণ করছো, তারা মারাত্মক ভুল করছে।

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের আহ্বানে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম কবুল করেছিল। মুসলমানদের এই শ্রেণীটি ছিল সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তিহীন গরীব শ্রেণী। কিন্তু তারা ছিল সমাজের ঐ সব ব্যক্তি, গোটা সমাজের ভেতরে যারা ছিল সুষ্ঠু চিন্তা ও বুদ্ধির অধিকারী। সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য করার মত জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি যাদের ছিল। মহাসত্য গ্রহণ করার জন্য যারা ছিল তৃষ্ণার্ত। তাদের অর্থ ছিল না, ফলে সমাজে তাদের কোন প্রভাব ছিল না। এ কারণে সমাজের নেতৃত্বও তাদের হাতে ছিল না।

ফলে সমাজে তাদের কোন গুরুত্বও ছিল না। অথচ মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা ছিল অসীম। এই সমস্ত লোককে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের অনুসারী হতে দেখে সমাজের প্রতিপত্তিশালী ধনিক শ্রেণী উপহাস করে বলতো, আমরা ঐ বোকা লোকগুলোর মত নই যে, তোমাকে নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তোমার অনুসরণ করবো। তোমাকে যারা নেতা হিসেবে গ্রহণ করে তোমার অনুসরণ করছে, তাদের সমাজে কোনই মূল্য নেই। তাদের অর্থ বিত্ত নেই, আমাদের মত তারা জ্ঞানী নয়, আমাদের মত তারা চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতাও রাখে না। আমরা ভালো মন্দ বুঝি, সে ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের কোন যোগ্যতাই নেই। এই জন্য তাদের মত মূর্খ লোকগুলো তোমাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রথমে তাদেরকে তুমি তোমার পাশে থেকে সরিয়ে দাও, তারপর তোমার সাথে আমরা বসতে পারি। কথা বলে দেখতে পারি তোমার কথাগুলো সত্য না মিথ্যা। আমরা

এমন লোকদের সাথে কখনো বসতে পারি না, যারা সম্মান ও মর্যাদায় আমাদের চেয়ে ছোট। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম তাদের কথার জাববে বলতেন, তোমাদের দাবী গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমি যখন ইসলামের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছি, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। এই লোকগুলো হতে পারে দারিদ্র, কিন্তু তাঁরা আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাস করে এই বিধান কবুল করেছে। কে ধনী আর কে দারিদ্র মহান আল্লাহ তা দেখবেন না। আল্লাহ দেখবেন, কে সত্য পথের পথিক আর কে ভ্রান্ত পথের পথিক। তোমাদের দাবী অনুসারে আমি যদি আজ এই লোকগুলোকে পরিত্যাগ করি, তাহলে আমার ওপরে আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হবে। আমি মহান আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহর দরবারে ধন সম্পদের বিনিময়ে মুক্তি পাওয়া যাবে না। তিনি শুধু সৎকাজই কবুল করবেন। মুক্তি পাওয়া যাবে শুধু সৎ কাজের মাধ্যমে। আমি তোমাদের কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রাসূল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। আমি তোমাদের কল্যাণের জন্যই প্রেরিত হয়েছি। তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি চেষ্টা করছি। তোমরা আমার প্রতি ঈমান আনো। তাহলে তোমরা আল্লাহর আযাব হতে বাঁচতে পারবে।

মহান আল্লাহ তেমাদের কর্মকান্ডের দিকে তাকাবেন। দেখো, আমি আমার সময় ব্যয় করে তোমাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছি। এ জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় বা কোন মূল্য চাচ্ছিনা। কারণ আমাকে মহান আল্লাহ এর বিনিময় দিবেন। তিনিই অধিক বিনিময় দান করে থাকেন। তোমরা ইসলাম কবুল করো, ইসলামের সাথে বিরোধিতা করো না। যদি এ ধরনের আচরণ করতে থাকো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ওপরে আযাব অবতীর্ণ করবেন।

কিন্তু সে জাতির অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌছেছিল যে, মাহসত্য গ্রহণ করার মত মন-মানসিকতা তাদের একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের অন্তরে সত্য প্রবেশ করতে পারেনি। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের জাতির বিস্তারিত ইতিহাস পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বর্ণনা করেছেন। আমরা সে বর্ণনা এখানে পেশ করছি।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ-اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ-اَنْ لاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ-اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ-فَقَالَ الْمَلَاُ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرٰكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ-وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ-

আমি নূহকে তাঁর জাতির প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবে না। অনথ্যায় আমার আশংকা হচ্ছে যে, তোমাদের ওপর একদিন পীড়াদায়ক আযাব আসবে। জবাবে তাঁর জাতির নেতৃবৃন্দ, যারা তাঁর পেশকৃত বিধান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল, বললো, আমাদের দৃষ্টিতে তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমরা আরো দেখছি যে, আমাদের মধ্যকার লোকদের ভেতরে কেবল হীন-নীচ লোকজন কোন রূপ চিন্তা-ভাবনা না করে তোমার পেশকৃত আদর্শ গ্রহণ করেছে। আর আমরা এমন কোন জিনিষ দেখছি না যে, যাতে তোমরা আমাদের থেকে কিছুমাত্র অগ্রসর। (অর্থাৎ আমাদের থেকে সম্মান ও বেশী মর্যাদার অধিকারী এমন আমরা তোমার ভেতরে কিছুই দেখছি না) (সূরা হূদ-২৫-২৭)

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা হতে জানা যায়, হযরত নুহ আলায়হিস্ সালামের জাতি মহান আল্লাহকে অস্বীকার করেনি। আল্লাহ সম্পর্কে তারা অজ্ঞাতও ছিল না। আল্লাহর অস্তিত্বে তারা বিশ্বাস করতো। মহান আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করতে হবে এ কথাও তারা বিশ্বাস করতো এবং ভিন্ন পন্থায় তারা তা করতো। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানালেন, তখনও তাদের অবস্থা এমনই ছিল। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের জাতি মহান আল্লাহ সম্পর্কে যেমন ধারণা পোষণ করতো এবং যে পন্থায় আল্লাহর ইবাদাত করতো, আরবের লোকগুলোর অবস্থাও তেমনই ছিল। নূহ আলায়হিস্ সালামের জাতি ও আরবের লোকগুলো আল্লাহ ছাড়াও আরো নানা ধরনের শক্তিকে ইলাহ এবং রব হিসেবে জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে হোক গ্রহণ করেছিল।

বর্তমান কালের মুসলমানদের অবস্থাও তার থেকে উন্নত কিছুই নয়। এ যুগের মুসলমানও আল্লাহকে বিশ্বাস করে। প্রয়োজনে নামাজ রোজা হজ্জ আদায় করে। হঠাৎ দেখলে এদেরকে বড় ঈমানদার বলেই মনে নয়। কিন্তু এদের জীবনের বিভিন্ন দিকে এরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য শক্তিকে ইলাহ বা রব বানিয়ে বসে

আছে। বর্তমানের কালের মুসলমানদের জীবন যে সময় টুকু মসজিদের চার দেয়ালের ভেতরে থাকে, সেই সময়টুকু এরা আল্লাহকে রব বা ইলাহ্ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর গোলামী করে। মসজিদের বাইরের বিস্তীর্ণ জীবনে আল্লাহ্ রব হিসেবেও নেই ইলাহ্ হিসেবেও নেই।

কোন ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই রব বা ইলাহ্ সেজে বসে আছে কোন ক্ষেত্রে অন্য কোন শক্তিকে ইলাহ্ বা রব হিসেবে বসিয়েছে। কামনা বাসনা পূরণের ক্ষেত্রে এরা রব বা ইলাহ্ বানিয়েছে কোন পীরকে, কোন মাজারকে অথবা আল্লাহর মৃত কোন অলীকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদের ইলাহ্ বা রব হলো কতকগুলো ভ্রান্ত মতবাদ মতাদর্শের আবিষ্কারক। ক্ষমতায় বসানো বা ক্ষমতা থেকে বিদায় করার ক্ষেত্রে এদের রব হলো কোন পরাশক্তি। এভাবে জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন হতে মহান আল্লাহকে রব বা ইলাহর আসন থেকে সরিয়ে দিয়ে দাবী করছে আমরাও মুসলমান এবং কোরআনের অনুসারী।

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের জাতির অবস্থা, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন কালে আরব জাতির অবস্থা ও বর্তমান কালের মুসলমানদের অবস্থা একই রূপ কিনা, ঐ জাতি সমূহের ইতিহাস পাঠ করে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থার সাথে তাদের অবস্থা মিলে যায় কিনা। যদি মিলেই যায়, তাহলে এ যুগের মুসলমানরা কি হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের জাতির মতই আযাবের উপযুক্ত হয়ে যায় নি? আল্লাহর আযাব কি এদের ওপরে আসছে না? পৃথিবীতে বিশাল একটি জাতি হবার পরেও তারা অন্য জাতির গোলামী করতে বাধ্য হচ্ছে, এটা কি আযাব নয়? বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তেল সম্পদ এদের হাতে থাকার পরেও এরা গোটা বিশ্বজুড়ে অন্য জাতির হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে, সতীত্ব সম্মান মর্যাদা হারাচ্ছে, এটা কি আযাব নয়?

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম তাদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে এমন সমস্ত শক্তিকে পূজা করতো, তাদের ধারণা ছিল, এসব শক্তি আমাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌছে দেবে। কতক মানুষের যেমন ধারণা, তাদের পীর বা মাজারে শায়িত ব্যক্তি তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে বা করবে, তেমনি তাদেরও ধারণা ছিল, তারা যেসব মূর্তির পূজা করছে, এসব মূর্তি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। আল্লাহর কাছে পৌছানোর মাধ্যম হলো এসব মূর্তি। এভাবে তারা তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী নানা ধরনের রব ও ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছিল। এক কথায় তারা

শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। নূহ আলায়হিস্ সালামের জাতির ভেতরে এমন একটি শ্রেণী বর্তমান কালের মতই গড়ে উঠেছিল, যারা জনগণের জীবন ধারা নিয়ন্ত্রণ করতো। গোটা জাতির ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের অধিপতি হয়ে বসেছিল একশ্রেণীর লোকজন। তারা মানুষের ভেতরে উচ্চ এবং নীচের পার্থক্য সূচিত করেছিল। সমাজের উচ্চ পর্যায়ের লোকজনের অপরাধকে অপরাধ হিসেবে তারা গণ্য করতো না। আরব জাতির ভেতরেও তা করা হত না। বর্তমান কালেও করা হয় না। যাদের অঢেল অর্থ আছে, বর্তমান কালের আদালত তাদের অপরাধের শাস্তি দিতে সক্ষম নয়। বর্তমানে কালেও অধিকাংশ মানুষের জীবন এমন এক শ্রেণীর ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশে পরিচালিত হয়, যারা প্রকৃত অর্থে ইসলামের নির্দেশিত পথে মানুষকে পরিচালিত করে না।

আর এভাবে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের জাতির ভেতরে কদর্যতা ও অন্যায় অত্যাচারের যাবতীয় উৎমুখ খুলে গিয়েছিল। গোটা জাতির ভেতরে অন্যায়কে আর অন্যায় বলে বিবেচিত হত না। ঘৃণিত কর্মসমূহ সমাজে সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করেছিল, বর্তমান কালে যেমন লাভ করেছে। এই অবস্থা থেকে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করলেন না। কিন্তু সমাজের নেতৃবৃন্দ অনুভব করতে পেরেছিল, নূহ যদি তাঁর কাজে সফল হয় তাহলে তাদের স্বার্থ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে। সুতরাং তারা সমাজের ধর্মীয় গোষ্ঠীকে হাত করে ইসলামী আদর্শের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল।

নৌকা বানানোর কাজ শুরু করো

আল্লাহর বিধানে সাথে যখন কোন জাতি বিদ্রোহ করে তখন মহান আল্লাহ্ সেই জাতিকে ধ্বংস করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু জাতির ভেতর থেকে সেই সমস্ত মানুষকে রক্ষা করেন, যারা আল্লাহর বিধান নিজেরা অনুসরণ করতো এবং গোটা জাতিকেও সেই বিধান অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানাতো। অন্য মানুষ যেন আল্লাহকে রব এবং ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে, এ জন্য তারা চেষ্টা সাধানা করতো। মানুষ তাদেরকে বাধা দিত, আঘাত করতো, উপহাস বিদ্রূপ করতো, তবুও তাঁরা মানুষকে আল্লাহর আইন কানুনের দিকে আকৃষ্ট করার এমন কোন বৈধ পথ নেই যা অবলম্বন করতো না। আর যারা আল্লাহর বিধানের কিছু অংশ পালন করে ভাবতো, আমরা তো নামাজ কালাম তসবীহ

তাহ্লীল আদায় করছি, সুতরাং আমরা হক পথে আছি। এই লোকগুলো সমাজে বা দেশে আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য কোন পথ অবলম্বন করতো না। মসজিদের ভেতরে, খানকার ভেতরে, মাদ্রাসার ভেতরে নীরবে বসে থাকতো। সমাজ থেকে আল্লাহ বিরোধী মতবাদ মতাদর্শ, যাবতীয় আইন কানুন উৎখাত করার কোন ধরনের চেষ্টা করতো না। এই শ্রেণীর স্বঘোষিত পরহেজগার লোকদেরও আল্লাহ্ অপরাধীদের সাথে সাথে ধ্বংস করে দেন।

সে সমাজের দ্বীনি আন্দোলনের নেতা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর কর্মীদের রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দান করলেন, নৌকা নির্মাণ করো। আমি প্লাবন দিয়ে এই অবাধ্য জাতিকে ধ্বংস করে দেব। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে নৌকা নির্মাণ করতে দেখে ইসলাম বিরোধিরা তাকে বিদ্রূপ করতো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِى فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا-اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ-وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ-وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ-قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ-فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ-مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ-

বরং আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার ওহী অনুসারে একটি নৌকা বানানোর কাজ শুরু করো। আর মনে রেখো, যারা জুলুম করেছে, তাদের অনুকূলে তুমি আমার কাছে কোন সুপারিশ করবে না। এরা সবাই এখন নিমজ্জিত হবে। নূহ কিশতী প্রস্তুত করছিল আর তাঁর জাতির নেতৃবৃন্দের মধ্য হতে যে-ই এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, সে এর ওপর বিদ্রূপ করছিল। সে বলেছিল, তোমরা যদি আমাদেরকে বিদ্রূপ করো, তাহলে আমরাও তোমাদেরকে বিদ্রূপ করবো। অতি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কার ওপরে অপমানকর আযাব আসে আর কার প্রতি আসে স্থায়ী আযাব। (সূরা হূদ-৩৭-৩৯)

তোমরা যদি আমাদেরকে বিদ্রূপ করো, তাহলে আমরাও তোমাদেরকে বিদ্রূপ করবো। এই কথাটার অর্থ ছিল, তোমরা আমাদেরকে বিদ্রূপ করছো করতে থাকো। কিছু দিনের ভেতরে বিদ্রূপ করার মজা বুঝবে। আমাদের আল্লাহ যখন আযাব অবতীর্ণ করবেন, তখন সেটাই হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিদ্রূপের জবাব।

চুলাটা উথলে উঠলো

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের নৌকা প্রস্তুত হয়ে গেল। মহান আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন, সে সময় ঘনিয়ে এলো। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে আল্লাহ জানিয়েছিলেন বিশেষ একটি নিদর্শনের কথা। যখন তিনি সেই নিদর্শন দেখেন, তখন তাকে বুঝতে হবে আল্লাহর আযাব আসবে। সেই নিদর্শনের কথা আমরা পবিত্র কোরআন হতে জানতে পারি যে, চুলার তলদেশ হতে পানি উদগীরণ হওয়া। এ সম্পর্কে সূরা হূদ-এর ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ–قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ–وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗ اِلاَّ قَلِيْلٌ–

এইভাবে যখন আমার আদেশ এলো আর সেই চুলাটা উথলে উঠলো। তখন আমি বললাম, প্রত্যেক ধরনের জন্তু-জানোয়ার এক-এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নাও। তোমার পরিবারের লোকদেরকেও–অবশ্য তাদের ব্যতীত যাদেরকে পূর্বেই চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে–এতে তুলে নাও। আর সেই লোকদেরকেও এতে বসাও যারা ঈমান এনেছে। তবে নূহের সাথে ঈমান এনেছে তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম।

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম তাঁর অনুসারীদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন নৌকায় উঠার জন্য। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا–اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

নূহ বললো, তোমরা এতে উঠে বসো। আল্লাহর নামেই এটা চলতে থাকবে এবং স্থিতি লাভ করবে। আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল এবং করুণাময়। (সূরা হূদ-৪১)

এই ধরনের ভয়ংকর-আযাব দু'চার দশ বছরে হঠাৎ করে আসেনি। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম কয়েক শতাব্দী ব্যাপী সেই মানুষগুলোকে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার জন্য চেষ্টা সাধনা করেছিলেন। মহান আল্লাহ সেই সময়ে মানুষকে অধিক হায়াত দান করেছিলেন। তবুও তারা ইসলাম কবুল করেনি। যে কয়জন মানুষ ইসলাম কবুল করেছিল, তাদের সাথে তারা শুধু বিরোধিতাই করেছে।

আযাবের ধরণটা কেমন ছিল, পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন-

فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ-وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ-

তখন আমি আকাশের দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত করে মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করিয়েছি। এবং যমীন দীর্ণ করে প্রস্রবনে পরিণত করেছি। আর এই সমস্ত পানি সেই কাজটি পূর্ণ করার কাজে লাগলো, যা পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। (সূরা ক্বামার-১১-১২)

আকাশের প্রতি আদেশ করা হলো, পানি বর্ষন করতে থাকো মুষল ধারায়। যমীনের প্রতি আদেশ করা হলো, তোমার বুকে যে প্রস্রবন রয়েছে, তা থেকে পানি উদগীরণ করতে থাকো। পানি যে কোন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল, তা বর্তমানে গবেষকগণও সঠিকভাবে আবিষ্কার করতে পারেনি। তারা শুধু এতটুকুই বলে যে, পৃথিবীর সুউচ্চ পর্বতসমূহ পানির নীচে তলিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর বিধানের সাথে যারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল, তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, তারা সবাই নিমজ্জিত হলো এবং তারা জাহান্নামের কঠিন আগুনে শাস্তি লাভ করতে থাকলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

مِمَّا خَطِيْئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا-فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا-

তাদের নিজেদের অপরাধের কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে এবং অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ অবস্থায় তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ হতে রক্ষা করতে রক্ষাকারী সাহায্যকারী হিসেবে কাউকে পেল না। (সূরা নূহ,-২৫)

পানির গভীরতা যত বেশী হয়, পানির ঢেউ ততবড় হয়। সে সময়ে মহাপ্লাবনের ফলে পানির গভীরতা যে কত অধিক ছিল, এ সম্পর্ক কোরআন সঠিক পরিমাপ না বললেও এ কথা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এক একটি ঢেউ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে আসছিল। এভাবেই সেই জাতি ধরাপৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, যারা আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রুপ করেছিল। শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে তাদেরকে ইসলাম বুঝানো হচ্ছিল। তবুও তারা ইসলাম বুঝলো না, এর সাথে বিদ্রোহীর মতই আচরণ করছিল।

ঈমানহারা সন্তানের করুণ পরিণতি

কোন নবীর ঘরে সন্তান জন্ম গ্রহণ করলেই সে সন্তান নবী হয়না বা ঈমানদারও হয়না, যতক্ষণ তাকে ঈমানদার হিসেবে গঠন করা না হয়। ইসলাম বিরোধী কোন ব্যক্তির ঘরেও তার সন্তান ইসলামের শত্রু হয়না, যতক্ষণ তাকে সেই ভাবে গঠন করা না হয়। ডাক্তারের সন্তান ডাক্তার হয়না। তাকে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে লেখা পড়া করে সে বিদ্যা অর্জন করেই তবে ডাক্তার হতে হয়। তেমনি মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করলে বা মুসলমানদের মত নাম রাখলেই মুসলমান হওয়া যায় না। মহান আল্লাহ্ কাফিরের ঘরে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে প্রেরণ করেছিলেন। অপর দিকে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম, যাকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়, এবং তিনিই ছিলেন হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের পরে পৃথিবীর বুকে প্রথম রাসূল। তার ঘরে ইসলামের শত্রু কাফির সৃষ্টি হয়েছিল।

সন্তান এবং নিজের স্ত্রীকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম চেষ্টার যত পথ ছিল, সবগুলোই তিনি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী ও রাসূল। তিনি মানব জাতিকে আল্লাহর পুরস্কার জান্নাতের কথা বলছিলেন। আল্লাহর শাস্তি জাহান্নামের কথা বলছিলেন। সুতরাং জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিয়েছিলেন, অথবা তাঁকে শাস্তি ও পুরস্কারের প্রতীকি দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। আল্লাহর বিধান অনুসরণ না করলে কি ধরনের শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও কলিজার টুকরা সন্তান সে শাস্তি ভোগ করবে, এ কারণে তিনি অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন। তিনি বারবার তাদেরকে বুঝিয়েছিলেন, ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে, আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হতে হবে।

কিন্তু শেষ মুহূর্তেও তারা ইসলামের পথে আসেনি। আল্লাহর শাস্তি যখন এসে গেল তখন নূহ আলায়হিস্ সালামের সন্তানের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ-وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ-

নৌকা এই লোকদের নিয়ে চলছিল আর এক একটি ঢেউ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে

আসছিল। নূহের পুত্র দূরবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল। নুহ ডেকে বললো, হে আমার পুত্র! আমার সাথে আরোহন করো। কাফিরদের সাথে থেকো না। (সূরা হুদ -৪২)

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর নবী ও রাসূল ছিলেন, এরপরেও তিনি ছিলেন একজন মানুষ। সন্তানের প্রতি তাঁরও মমতা ছিল। সন্তানের পরিণতির কথা ভেবেই তিনি তাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম বিরোধী হতভাগা সন্তান শেষ মুহূর্তেও আল্লাহর নবীর আদেশ পালন না করে জবাব দিয়েছিল, পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

قَالَ سَاوِىْ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَاءِ–قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ–وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ–

সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, আমি এখনই একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসবো। তা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ বললো, আজ কোন জিনিষই আল্লাহর আদেশ হতে রক্ষা করতে পারে না। তবে আল্লাহ কারো ওপরে রহম করলে অন্য কথা। ইতোমধ্যে একটি ঢেউ উভয়ের মাঝখানে আড়াল করে দাঁড়ালো আর সে-ও নিমজ্জিতদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (সূরা হূদ-৪৩)

মহান আল্লাহ ব্যাপারটা পছন্দ করলেন না। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, যে সন্তান আল্লাহর ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু, সে তোমার পরিবার ভূক্ত হতে পারে না। মহান আল্লাহ বললেন–

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ–قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ–اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ–فَلاَ تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ– اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ–قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ–وَاِلاَّ تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ–

নূহ তাঁর রবকে ডেকে বললো, হে আমার রব! আমার পুত্র তো আমারই ঘরের লোকদের একজন। ওদিকে তোমার অঙ্গিকারও সত্য। আর তুমি সব বিচারক

অপেক্ষা বড় ও উত্তম বিচারক। জবাবে বলা হলো, হে নূহ! সে তোমার ঘরের লোকদের একজন নয়। সে তো এক বিকৃতি ও দুষ্কৃতির প্রতীক। সুতরাং তুমি সেই ব্যাপারে আমার কাছে আবেদন করো না, যারা মূল ব্যাপার তোমার অজানা। আমি তোমাকে নসিহত করি, নিজেকে জাহিলদের মত বানিও না। নূহ সাথে সাথে আবেদন করলো, হে আমার রব! যে বিষয় আমার জানা নেই, সেই বিষয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করা হতে আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো ও দয়া না করো তা হলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। (সূরা হূদ, ৪৫-৪৭)

নৌকা যেখানে থেমে গেল

আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হয়ে যখন ইসলামের শত্রুগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তখন আযাবের এলাকা সমূহ পূর্বের ন্যায় হয়ে গেল। মহান আল্লাহ আদেশ দিলেন–

وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِىْ مَاءَكِ وَيٰسَمَاءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ-

নির্দেশ হলো, হে যমীন! তোমার সব পানি গিলে ফেল আর আকাশ থেমে যাও। তারপর পানি যমীনে বসে গেল এবং ফায়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেল। কিশতী জুদী পর্বতের গায়ে এসে ভিড়লো। তারপর বলে দেয়া হলো, জালিম লোকজন দূর হয়ে গেল। (সূরা হূদ-৪৪)

জুদী পাহাড় বর্তমান ইরাকের কুর্দিস্তান এলাকায় জাজীরায়ে ইবনে ওমর-এর উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। বাইবেলে এই কিশতীর অবতরণের স্থান বলা হয়েছে, আরারাত পর্বতকে। আরারাত পাহাড় আর্মেনিয়ার একটি পাহাড় এবং সেই সাথে একটি পর্বত মালার নাম। পর্বতমালা বলতে যে আরারাত পাহাড়কে মনে করা হয়, তা আর্মেনিয়ার উচ্চ মালভূমি হতে শুরু করে দক্ষিণে কুর্দিস্তান পর্যন্ত চলে গিয়েছে। আর জুদী পর্বত বা জাবালুল জুদী এরই একটি পাহাড়ের নাম। এখানে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মীয় একটা উপাসনালয় ছিল, যাকে বলা হত নৌকার উপাসনালয়। বর্তমানেও এই নামেই পর্বতটি পরিচিত এবং প্রখ্যাত। প্রাচীন ইতিহাসে এটাই কিশতী অবতরণের স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈসা মসীহের আড়াইশত বছর পূর্বে বেবিলনের বেরোসুস নামক এক ধর্মীয় নেতা প্রাচীন

কালদানীয় বর্ণনার ভিত্তিতে নিজ দেশের যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তাতেও তিনি কিশতী অবতরণের স্থান হিসেবে এই জুদী পর্বতের নামই উল্লেখ করেছেন। এরিষ্টটলের শিষ্য আবিডেনাসও স্বলিখিত ইতিহাসে একেই সত্য বলে স্বীকার করেছেন। হযরত নূহ পৃথিবীতে কত বছর জীবিত ছিলেন এবং কত বছর ব্যাপী মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তা এক মহাবিস্ময়। কেননা পবিত্র কোরআন বলছে—

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا-فَاَخَذَ هُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ-

আমি নূহকে তাঁর জাতির লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি এবং সে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর কাল তাদের ভেতরে অবস্থান করেছে। শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে ঘিরে ধরলো এমন অবস্থায় যে, তারা ছিল জালিম। (সূরা আনকাবুত-১৪)

কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সাড়ে নয় শতাব্দী যাবৎ এই পৃথিবীতে অবস্থান করেছেন। একজন মানুষ সাড়ে নয়শত বছর জীবিত ছিল, বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের। অনেকে ধারণা করেন, এত বছর একজন মানুষের জীবিত থাকা এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের গড় আয়ু এক ধরনের নয়। কোন দেশের মানুষ বেশী দিন জীবিত থাকে আবার কোন দেশের মানুষ অল্পদিন জীবিত থাকে।

এ ব্যবস্থা মহান আল্লাহই করেছেন। সৃষ্টি জগতের দিকে তাকালে সৃষ্টির ভারসাম্য কিভাবে রক্ষা করা হচ্ছে তা লক্ষ্য করা যায়। এই পৃথিবীতে যে প্রাণী বা বৃক্ষ তরু-লতার প্রয়োজন যত কম, মহান আল্লাহ তা কম সৃষ্টি করেছেন বা তার বংশ বৃদ্ধি একটা ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ রেখেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে বংশ বৃদ্ধি ঘটতে দিয়েও তা বিলুপ্তির ব্যবস্থা করেছেন। প্রাণী জগতের দিকে তাকিয়ে দেখুন, পৃথিবীতে যেসব দেশ বন্য প্রাণীর জন্য বিখ্যাত, সেসব দেশের প্রাণীসমূহের অবস্থা হলো, হরিণের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। অনেকটা গরুর মত দেখতে যাকে বলা হয় ওয়াল্ড বিষ্ট।

এই প্রাণীগুলো যে প্রান্তরে বিচরণ করে, সেই প্রান্তরের দিকে তাকালে মনে হয় যেন এদের সংখ্যা শতকোটি পার হয়ে যাবে। একই স্থানে বাঘ, সিংহ, হায়েনা, হিংস্র শিয়াল, সাপ আরো কত প্রাণী রয়েছে। এই ওয়াল্ড বিষ্ট-কে এবং হরিণকে

বাঘ ধরে খাচ্ছে, সিংহ ধরে খাচ্ছে, হায়েনা ধরে খাচ্ছে, শিয়াল ধরে খাচ্ছে, বন্য কুকুর ধরে খাচ্ছে। পানি পান করতে গেলে কুমির ধরে খাচ্ছে। সামান্য দুর্বল বা অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকলে শকুনের বিশাল দল এসে খেয়ে ফেলছে। নদী অতিক্রম করতে গিয়ে এসব প্রাণী যে ভঙ্গিতে লাফিয়ে নদীতে পড়ে, তাতে নদীর তলদেশের পাথরে আঘাত লেগে এদের বহু সংখ্যক মারাত্মক আহত হয়ে মারা পড়ে। প্রবল স্রোতের টানে মারা পড়ে।

অথচ এই ওয়াল্ড বিষ্ট-এর এবং হরিণের সংখ্যা কমছে না। এ প্রাণী দুটো মানুষের জন্যও মহান আল্লাহ হালাল করেছেন। এই প্রাণী দুটোর সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি লাভ করে, অথচ এই প্রাণী দুটোকে যেসব প্রাণী ধরে খায়, তাদের সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি লাভ করে না। মহান আল্লাহ এভাবেই তাঁর সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষা করেন। বৃক্ষ, তরু-লতার অবস্থা দেখুন, পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ মৌসুমে নানা ধরনের ফল, ফুলের গাছ সৃষ্টি হয়, দূর্বা ঘাস বিশেষ সময়ে মাটিকে ঢেকে ফেলে। মাস কয়েক পরেই তা আবার বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পানির জগতের অবস্থাও এমন। মাছ শতকোটি ডিম ছাড়ে। সমস্ত ডিমের বাচ্চা ফোটেনা। যেগুলো ফোটে সবগুলো বড় হবার সুযোগ পায় না। এই মাছগুলোকে খাবার জন্য মানুষসহ নানা প্রাণী প্রস্তুত হয়ে আছে। অর্থাৎ কোন কিছুকেই মহান আল্লাহ মাত্রার অধিক বৃদ্ধি লাভ করতে দিচ্ছেন না। এর কারণ হলো, কোন প্রাণী বা বৃক্ষ, তরু-লতা সীমার অতিরিক্ত যদি বৃদ্ধি লাভ করে, তাহলে তার আধিক্যে অন্যান্য সৃষ্টি নানা অসুবিধায় পতিত হবে। মানুষের অবস্থা দেখুন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে হাজার হাজার মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারপরে দাঙ্গায় শেষ হচ্ছে। দুর্ঘটনায় শেষ হচ্ছে। স্বাভাবিক মৃত্যুতো আছেই। অর্থাৎ সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ তাঁর বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুযায়ীই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই পৃথিবীতে যে সময়ে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের আগমন করেছিলেন, সে সময়ে এই পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কত ছিল তা বর্তমানে জানার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে নেই।

আযাব আসার আশঙ্কা করছি

আল্লাহ তা'য়ালা আদ জাতির ইতিহাস পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন, যারা ছিল যে কোন জাতির তুলনায় শক্তিশালী। সেই জাতির কাছেই হযরত হূদ আলাইহিস্ সালামকে প্রেরণ করা হয়েছিলো। তারা আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করেছিল। এ কারণে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। তারা যখন ধ্বংস হয়েছিল, তখন তাদের শক্তি তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারেনি। সেই জাতির তুলনায় কোরআন নাজিল হবার সময় হতে বর্তমান মানুষ কোন দিক থেকেই শাক্তিশালী নয়। তারা যখন ইসলামী আন্দোলনের সাথে বিরোধীতা করে টিকে থাকতে পারেনি, বর্তমান মানুষ কি করে টিকে থাকতে পারবে। এসব জাতির ইতিহাস বর্ণনা করে মহান আল্লাহ অতীত ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন। আল্লাহর বিধানের সাথে বেয়াদবি ও বিদ্রোহ করার পরিণতি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا–قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُه–اَفَلَا تَتَّقُوْنَ–قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ–

এবং আ'দ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছি। সে বলেছিল, হে জাতির লোকজন। তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই। এখন তোমরা কি ভ্রান্ত পথে চলা হতে বিরত হবে না? তারা জাতির নেতা এবং উচ্চ পর্যায়ের– যারা তাঁর আহ্বান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল, তারা উত্তর দিয়েছিল, আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত বলে মনে করি। আর আমাদের ধারণা এই যে, তুমি মিথ্যাবদী। (সূরা আ'রাফ- ৬৫-৬৬)

অতি সামান্য সংখ্যক মানুষই হযরত হূদ আলায়হিস্ সালামের আহ্বানে ইসলাম কবুল করেছিল। জাতির বৃহত্তর অংশই ছিল আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রতি বিদ্রোহী। তিনি অবশেষে বাধ্য হয়ে নিজ জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন–

اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ–

আমি তোমাদের ওপরে এক ভীষণ দিনের আযাব আসার আশঙ্কা করছি। (সূরা শু'আরা-১৩৫)

হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামের অবাধ্য জাতি এতদূর পর্যন্ত বিদ্রোহ করেছিল যে, আল্লাহ সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বলেছিল–

قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ–

হে হুদ! তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছো যে, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবো আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের দাসত্ব করেছে তাদেরকে ত্যাগ করবো? আচ্ছা তাহলে তুমি সেই আযাব নিয়ে এসো, যে আযাবের ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো। যদি তুমি তোমার দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে নিয়ে এসো সেই আযাব। (সূরা আ'রাফ-৭০)

হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম বুঝলেন, এই জাতি অবাধ্যতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সত্য পথে ফিরে আসার সমস্ত দরজা এই জাতি স্বহস্তে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন এরা আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে। তিনি তখন তাঁর জাতিকে বললেন–قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে গযব ও আযাব তোমাদের ওপরে এসে পড়বে। (সূরা আ'রাফ-৭১)

হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আল্লাহর করুণায় তোমরা জীবিত আছো, আর সেই আল্লাহর সাথেই তোমরা বিদ্রোহ করছো। ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো। আল্লাহ তোমাদের জন্য কি ধরনের ফয়সালা করে তার অপেক্ষা করতে থাকো। মহান আল্লাহ প্রথমে তাদের ওপরে দুর্ভিক্ষ নাজিল করলেন। একবারে গযব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস না করে তাদেরকে অবকাশ দিলেন। দুর্ভিক্ষের কবলে নিমজ্জিত হয়ে তারা যদি আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে। চরম দুর্ভিক্ষ যখন দেখা দিল তখন আ'দ জাতি ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম বুঝলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সহজ সরল পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর জাতিকে অবকাশ দান করছেন। তিনি পুনরায় তাদেরকে বুঝালেন।

এই দুর্ভিক্ষ তোমাদের ওপরে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে সতর্ক সংকেত হিসেবে আগমন করেছে। এখনও তোমরা সতর্ক হও। আল্লাহর কাছে তওবা করে তোমরা

তাঁর দ্বীনের পথে ফিরে এসো। আ'দ জাতি আল্লাহর নবীর কথায় কান দিল না। বরং পূর্বের তুলনায় প্রবল শক্তিতে আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করতে থাকলো। মহান আল্লাহ এবার এই অবাধ্য জাতিকে আর সুযোগ দিলেন না। তিনি এমন আযাব অবতীর্ণ করলেন যে, আ'দ জাতি ইতিহাসের কল্পকাহিনীতে পরিণত হলো।

ঝড় শুরু হলো, প্রচন্ড ঝড়। সে ঝড় আটদিন যাবৎ প্রবাহিত হয়েছিল। প্রথম দিন যখন ঝড় শুরু হলো তখন আ'দ জাতির লোকজন তাদের বাড়ি-ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ক্রমশঃ সে ঝড়ের গতি আল্লাহ বৃদ্ধি করতে থাকলেন। কোরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সে ঝড় আটদিন এবং সাত রাত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল। প্রচন্ড ঝড়ের তান্ডব লীলায় বিশাল আকৃতির মানুষগুলো পত্র-পল্লবের মতই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্প্রাণ অসাড় হয়ে পড়েছিল। মাত্র একদিন পূর্বে যারা তাদের দৈহিক শক্তির কারণে নিজেদেরকে অতুলনীয় ভেবে মহান আল্লাহর বিধানের সাথে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বলেছিল, কোথায় তোমার খোদার আযাব, যদি পারো তাহলে তা নিয়ে এসে আমাদেরকে দেখাও। আজ তারা আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হয়ে মৃত পশুর মতই পড়েছিল। তাদের গোটা জনপদের অবস্থা এমন আকার ধারণ করেছিল যে, মাত্র ঘন্টা কয়েক পূর্বেও যে এখানে কোন জনপদ ছিল, কোলাহল পূর্ণ মানব বসতী ছিল, তার আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রইলো না। গোটা নগরী এমনভাবে ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল যে, মানুষ বাসের কোন চিহ্ন ছিল না।

আমাদের সমকক্ষ আর কে আছে?

এই পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের সাথে বিরোধিতা করে যখন ধ্বংস হয়ে যায়, তখন যেমন তারা কোন সাহায্য পায়না, তেমনি কিয়ামতের দিনও তারা কোন সাহায্য পাবে না। এই পৃথিবীতে যেমন তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই জোটে না, পরকালেও তেমনি লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই জুটবে না। আ'দ জাতির অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً-اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً-وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ-فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا

فِيْ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا- وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَايُنْصَرُوْنَ-

আর ছিল আ'দ সম্প্রদায়। তারা দেশের ভেতরে অনর্থক অহংকার প্রদর্শন করছিল আর বলছিল, শক্তি ও ক্ষমতায় আমাদের সমকক্ষ আর কে আছে? তারা কি দেখে না যে, যে মহান শক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের থেকে অধিক শক্তিশালী? আর তারা আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করতো। তারপর আমি তাদেরকে পৃথিবীর জীবনে লাঞ্ছনামূলক শাস্তির স্বাদ অস্বাদন করানোর জন্য কয়েক দিন ব্যাপী তাদের ওপরে মহাশক্তিশালী প্রবল ঝড় প্রেরণ করলাম। আর আখেরাতের পূর্ণ লাঞ্ছনাজনক শাস্তি তো অবশিষ্ট রয়ে গেল। সেখানে তারা কোন ধরণের সাহায্য লাভ করবে না। (সূরা হা-মীম-সেজ্দাহ্-১৫-১৬)

পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় জানা যায়, আ'দ জাতির ওপরে ধ্বংস নেমে আসার পূর্বে আল্লাহর আযাব মেঘের রূপ ধারণ করে এসেছিল। গোটা আকাশ যখন ভয়ংকর মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল তখনও বোধহয় আল্লাহর নবী হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। তখন তাঁর জাতি উত্তর দিয়েছিল-

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ-قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا-بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ-رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ-تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ-كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ-

পরে যখন তারা সেই আযাবকে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখলো তখন বলাবলি করছিল, এটা সেই মেঘমালা, এই মেঘমালা আমাদেরকে সিক্ত করে দেবে। (আল্লাহ বলেন) না, এটা সেই জিনিষ যার জন্য তোমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে। (অর্থাৎ তারা তো চ্যালেঞ্জ করতো, কোথায় তোমার আযাব? পারলে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো) এটা বাতাসের ঝঞ্ঝা তুফান। এর মধ্যেই অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব চলে আসছে। তা তার আল্লাহর নির্দেশে প্রত্যেকটি জিনিষই ধ্বংস করে দেবে। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি এমন হলো যে, তাদের থাকার স্থানটুকু ব্যতীত (অর্থাৎ শুধু মাটি ব্যতীত) আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। বস্তুতঃ এভাবেই আমি অপরাধিদেরকে কর্মফল দিয়ে থাকি। (সূরা আহ্কাফ-২৪-২৫)

আল্লাহর ইসলামের সাথে বেয়াদবি করার কারণে মহান আল্লাহ তাদের যে পরিণতি করেছিলেন, তা পরবর্তী মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাদের দুর্দশা সম্পর্কে সূরা যারিয়ার ৪১-৪২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ-مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ-

আর (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) আ'দ জাতির ঘটনায়। আমি যখন তাদের ওপর এমন অকল্যাণময় বায়ু-প্রবাহ প্রেরণ করলাম তা যে জিনিষের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল, তাকেই পঁচা হাড়ের মতই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।

মহান আল্লাহ আ'দ জাতির ঘটনার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তোমরা লক্ষ্য করো। আমার দেয়া বিধানের সাথে বিদ্রোহ করলে পরিণতি হয় অত্যন্ত অশুভ। মহান আল্লাহ বলেন–

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ-اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ-تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ-فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ-

আ'দ মিথ্যা ধারণা করে অমান্য করেছে। তাদের প্রতি আমার আযাবটা কিরকম ছিল এবং আমার সাবধান সতর্ক বাণী তা লক্ষ্য করো। আমি এক বড় ও ক্রমাগত অশুভ দিনে প্রবল ঝড়ো বাতাস তাদের ওপর প্রেরণ করেছি। তা লোকদেরকে উপরে উঠিয়ে এমনভাবে নিক্ষেপ করছিল, যেন তারা মূল হতে উৎপাটিত খেজুর গাছের কান্ড। সুতরাং লক্ষ্য করো কেমন ছিল আমার আযাব আর কত তীব্র ছিল আমার সাবধান সতর্ক বাণী। (সূরা কামার-১৮-২১)

প্রচন্ড ঝড়ের দাপটে বিশাল আকারের বৃক্ষগুলো উপড়ে অসহায়ের মতই নেতিয়ে পড়ে থাকে। অথচ ক্ষণপূর্বেও সে বৃক্ষ স্বগৌরবে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দন্ডায়মান ছিল। অহংকারী আ'দ জাতির অবস্থাও তেমনি ছিল। মহান আল্লাহ বলেন–

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ-سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ-حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى-كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ-فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ-

আর আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝা বাতাসের আঘাতে। আল্লাহ তায়ালা তা ক্রমাগত সাতরাত ও আটদিন পর্যন্ত তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে দেখতে পেতে) দেখতে পেতে যে, তারা সেখানে এমনভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়েছিল যেমন পুরানো শুকনো খেজুর গাছের কান্ডসমূহ পড়ে থাকে। এরপর কি তুমি দেখতে পাও, তাদের ভেতরে কেউ কি জীবিত আছে? (সূরা হাক্কাহ-৬-৮)

আ'দ জাতি স্থাপত্য শিল্পে ছিল অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় পারদর্শী। বর্তমানে সভ্যতা গর্বী মানুষ যেমন ইসলামকে সেকেলে মনে করে ত্যাগ করার পক্ষপাতি। আল্লাহর বিধান সত্য বটে কিন্তু তা বর্তমান পৃথিবীর জন্য উপযোগী নয়–এই কথাগুলো তথাকথিত মুসলিমদের মুখেই শোনা যায়। আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে তারা মানুষের তৈরী করা আদর্শ দ্বারা জীবন অতিবাহিত করতে চায়। তাদের এই প্রয়াস অহংকারেরই ফলশ্রুতি। মহান আল্লাহ বলেন, আ'দ জাতিও সভ্যতাগর্বী ছিল। তাদের অহংকারের কারণে তোমাদের আল্লাহ তাদের পরিণতি কি করেছেন, তা ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখো। মহান আল্লাহ বলেন–

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ–اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ–اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ–الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ–

তুমি কি দেখনি তোমার রব উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণকারী আ'দ-ইরেমের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, যাদের মত কোন জাতি পৃথিবীর কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি?

যে জাতির একজনের দৈহিক শক্তি ছিল বর্তমান মানুষের কয়েক শতেরও শক্তির অধিক। সউদী আরবের বিস্তীর্ণ মরুভূমি আল রুবউল খালী এলাকায় ২০০৪ সনে জ্বালানী তেল অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ARAMCO নামক এক কোম্পানী খনন কাজ চালাতে গিয়ে আদ জাতীর নরকঙ্কালের সন্ধান পেয়েছে। সেই কঙ্কালের কপাল থেকে মুখের নিচে চিবুক পর্যন্ত যতটা দৈর্ঘ, বর্তমান কালের মানুষের পা থেকে মাথা পর্যন্তও ততটা দৈর্ঘ নয়। এ থেকেই বুঝায় যায়, তাদের গোটা দেহের দৈর্ঘ কি বিশাল আকৃতির ছিল। তারা পাহাড় খোদাই করে নানা ধরনের কিছু সৃষ্টিতে ছিল পারদর্শী। আল্লাহর আইনের সাথে অবাধ্যতা করার কারণে পৃথিবীর বুক থেকে তাদেরকে চরম লাঞ্ছনা দিয়ে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। তাদের মত জাতি আল্লাহর গযবের কাছে টিকে থাকতে পারেনি। বর্তমানেও বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর গযব

আসছে। মানব জাতিকে এ ধরনের গযব দিয়ে মহান আল্লাহ সংশোধন করতে চান। অথচ এই নির্বোধ মানুষ এই সমস্ত গযবকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়-প্রকৃতির খেয়াল ইত্যাদী নাম দেয়। তারপরে বলে বিপর্যয়ের মোকাবেলা করা হবে, কোন ভয় নেই, সরকার সবকিছু নিয়ে প্রস্তুত আছে। হতভাগা মানুষ, সাহস কত!

প্রচার মাধ্যমে যখন বারবার ঘোষনা করা হয়, ১০ বা ১২ নম্বর মহাবিপদ সংকেত, ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানবে। তখন সরকারের পক্ষ হতে আল্লাহর কাছে গোটা জাতিকে তওবা করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করার পরামর্শ দেয়ার পরিবর্তে সরকার ঘোষনা করেন, কোন ভয় নেই। আমরা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। এই ধরনের ঘোষনা চরম ধৃষ্টতার শামিল। অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, আল্লাহর আযাবের মোকাবেলায় কোনকিছুই টিকে থাকে না থাকতে পারে না। হযরত হূদ আলায়হিস্ সালামের জাতিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যে কারণে আল্লাহর গযবে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ঐ সমস্ত কারণসমূহ বর্তমান জাতির ভেতরে বিদ্যমান। আল্লাহর কাছে তওবা করে আল্লাহর বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ওসীলার প্রয়োজন নেই

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালাম তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা কেন আল্লাহর বিধান অনুসরণ করবে না। তোমরা যার আইন কানুন অনুসরণ করছো, তাদের তো কোনই শক্তি নেই। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যমীনের নিষ্প্রাণ জড়-বস্তুর সংমিশ্রণে এই মানবীয় অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে এই পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনিই তোমাদের জীবন ধারনের যাবতীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করছেন। তাহলে তাঁর আইন ব্যতীত আর কে এমন শক্তি আছে যে, তার আইন এই যমীনে কার্যকর হতে পারে? তিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের উপযুক্ত সত্ত্বা আর কে থাকতে পারে?

সুতরাং তোমরা এতদিন তাকে ত্যাগ করে অন্যান্য শক্তির দাসত্ব করেছো, এ কারণে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। তিনি অত্যন্ত মেহেরবান। তাঁর কাছে যে প্রার্থনা করে তিনি তাঁর প্রার্থনা শোনেন। তিনি প্রার্থনা শুনে নীরব থাকেন না। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় তিনি সাড়া দেন। সুতরাং তাঁর কাছে নিজেদের অতীত কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।

যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব না করে অন্যান্য শক্তিরও দাসত্ব করে আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ধারণা একটু ভিন্ন ধরণের। এই ভিন্ন ধারণাই তাদেরকে বিরাট এক ভুলের ভেতরে নিমজ্জিত করে রেখেছে এবং তারা শিরক-এ লিপ্ত রয়েছে। এই শ্রেণীর লোকগুলোর বিশ্বাস হলো, মহান আল্লাহ হলেন এই পৃথিবীর রাজা-বাদশা এবং সম্রাটদের মতই। পৃথিবীর শাসকরা যেমন দেশের সাধারণ জনগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বহুদূরে রাজ-প্রাসাদে অবস্থান করে ভোগ বিলাসে মাতোয়ারা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের পক্ষে যেমন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না। তাদের সামনে যাওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। তাদের কাছে কোন দরখাস্ত প্রেরণ করতে হলে তাদের সভাষদ, হোমড়া চোমড়া, শাসক বৃন্দের যারা প্রিয়জন, বা তাদের কোন নিকট আত্মীয়দের ধরতে হয়।

সৌভাগ্যবশতঃ কারো দরখাস্ত যদি শাসকদের কাছে পৌছে যায় তবুও শাসকগণ সে দরখাস্তের আবেদন সম্পর্কে স্বয়ং কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কোন কর্মচারীকে বা নিজের অধিনস্থ কাউকে দায়িত্ব প্রদান করেন যে, আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করা যায় কিনা, তা দেখা হোক। এক শ্রেণীর মানুষ মহান আল্লাহকেও পৃথিবীর এই শাসকদের মতই মনে করেছে। এর ফল হয়েছে অত্যন্ত মারাত্মক।

পৃথিবীর একশ্রেণীর চালাক মানুষ তখন উল্লেখিত ধারণা অনুসরণকারী মানুষদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে যে, সমস্ত শাসকের শাসক, সমস্ত সম্রাটের সম্রাট আল্লাহ মানুষের কাছে থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন। সাধারণ মানুষের নাগাল হতে তিনি বহুদূরে অবস্থান করেন। একজন সাধারণ মানুষের আবেদন সরাসরি আল্লাহর দরবারে কোন ক্রমেই পৌছতে পারে না। আল্লাহর কাছে সাধারণ মানুষের প্রার্থনা পৌছা এবং তার জবাব লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

আল্লাহর কাছে কোন প্রার্থনা পেশ করতে হলে এবং তার জবাব পেতে হলে কি করতে হবে? ওসীলা অনুসন্ধান করতে হবে। আল্লাহর কাছে কোন প্রার্থনা পৌছাতে হলে অবশ্যই কোন ওসীলা ধরতেই হবে। সে ওসীলা আবার কি? এই ওসীলার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নানাজন নানা ধরনের ওসীলা বের করে সাধারণ মানুষকে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রেখে শোষণ করা শুরু করে দিল। কেউ বললো, ওসীলা মানে হলো ঐ সমস্ত পবিত্র আত্মা যারা পৃথিবীতে আল্লাহর ওলী নামে, কামেল ব্যক্তি নামে

পরিচিত ছিল। তাদের মাজারই হলো সেই ওসীলা। মাজারে গিয়ে সিজদা দিয়ে হোক বা শুধু হাত তুলে হোক, মাজারে শায়িত ব্যক্তির কাছে আবেদন করতে হবে, তিনি যেন আল্লাহর কাছে তার দরখাস্ত পৌছে দেন। এখন মাজারে শায়িত ব্যক্তি তো আর খালি মুখে আল্লাহর কাছে তোমার দরখাস্ত পৌছাবেন না। পৃথিবীর কোন শাসকের কাছের কোন লোক শুধু হাতে কোন আবেদন যেমন পৌছায় না, ঘুষ দিতে হয়, তেমনি এই মাজারেও ঘুষ দিতে হবে। তাহলে তোমার আবেদন তিনি আল্লাহর কাছে পৌছে দিবেন।

সে ঘুষের ধরণ হলো, নগদ অর্থ থেকে শুরু করে পৃথিবীর কোন নিম্ন মূল্যের বস্তুও হতে পারে। হতে পারে তা মুরগীর বাচ্চা, উট, গরু, ছাগল, গাছের কোন ফল ইত্যাদী। এ ধরনের বস্তু বা নগদ অর্থ মাজারে মানত করতে হবে। তাহলে তিনি তোমাদের আবেদন আল্লাহর কাছে পৌছে দিবেন। এসব বস্তু এবং নগদ অর্থ মাজারের সেবক যারা আছেন, তারা ভোগ করবেন। মাজারের খাদেমগণ ভোগ করার অর্থই হলো মাজারে শায়িত ব্যক্তি ভোগ করা।

আরেক ধরনের চালাক লোক ওসীলা বলতে কি বুঝায় তা এভাবে বুঝিয়ে দিল যে, যারা ওসীলা বলতে মাজারে শায়িত ব্যক্তিকে বুঝিয়েছে, তারা আসলে ধান্দাবাজ। ওরা ধান্দাবাজি করে তোমাদের পকেটের টাকা নিজের পকেটে ঢোকাতে চায়। তোমাদের পশু সম্পদ ও গাছের ফলমূল খেতে চায়। কারণ মাজারে যিনি শুয়ে আছেন, তিনি মৃত। আর মৃত মানুষ কি কোন কিছু খেতে পারে? তাহলে তোমরা কেন মৃত মানুষের কবরে এসব জিনিষ দান করো? টাকাই বা কেন দাও? মৃত মানুষের তো টাকা দরকার হয় না। টাকা দরকার হয় জীবিত মানুষের। সুতরাং ওসীলা হলো তোমাদের চোখের সামনে নাদুস নুদুস নূরানী চেহারার অধিকারী পীর নামক ব্যক্তিগণ। এদের সাথে মহান আল্লাহর হট্ লাইন। তিনি তোমার যে কোন আবেদন আল্লাহর কাছে পৌছে দেবেন। পীরের মুরীদ হয়ে যাও এবং পীরকে সন্তুষ্ট রাখো। পীর সাহেব তোমার প্রতি আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখবেন।

এখন পীরকে সন্তুষ্ট রাখার পথ কি? পথ ঐ একটিই। এতদিন তোমরা মাজারে যা দিতে তা এখন পীর সাহেবকে দিতে হবে। তবে সাবধান! পীর সাহেবকে সরাসরি কিছুই দেয়া যাবে না। তার যারা লোকজন রয়েছে, তাদের মাধ্যম দিয়ে দাও, তিনি পীর সাহেবকে তোমার কথা জানাবেন, তারপর পীর সাহেব তোমার দরখাস্ত আল্লাহর কাছে পৌছে দিবেন।

আরেক দল চতুর লোক বললো, এসব পীর মাজার সব কিছুই বাতিল। এসব কোন ওসীলাই না। আসলে ওসীলা বলতে বুঝায় হলো, নিজের হাতে মাটি বা অন্য কিছু দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করতে হবে, বা কোন মূর্তির ছবি অঙ্কন করতে হবে। তারপর সেই মূর্তির সামনে দু'হাত ভরে দান করতে হবে। তবে এই দানের কাজও তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের কাছে কোন কিছু দান করার অধিকার হলো আমাদের। তোমরা আমাদের কাছে তোমাদের দান পৌছে দেবে, আমরা তা পৌছে দেবো মূর্তির সামনে। তিনি তা পৌছে দেবেন স্বয়ং স্রষ্টার কাছে।

এই অর্থেই মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছে। আল্লাহ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হবার ফলে বান্দা ও আল্লাহর মাঝখানে অসংখ্য ছোট বড় রব, ইলাহ্ আর মাবুদ ও সুপারিশকারীর এক বিশাল দল নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। সেই সাথে পাদ্রী ও পুরোহিত তন্ত্রের একটি বাহিনী দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যাদের মাধ্যম ব্যতীত জাহেলী ধর্মের অনুসারীরা তাদের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানও পালন করতে পারে না।

আল্লাহর নবী হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালাম জাহিলিয়াতের এই বিরাট গোলক ধাঁ-ধাঁকে মাত্র দুটো কথার আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, আল্লাহ তোমাদের অত্যন্ত কাছে অবস্থান করছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি তোমাদের আবেদনের জবাব দান করে থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহকে দূরে অবস্থিত মনে করা অত্যন্ত ভুল। তাঁকে সরাসরি ডেকে নিজের আবেদন পেশ করা যাবে না, এ ধারণাও ভুল। যদিও তিনি বিরাট উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তোমাদের অত্যন্ত কাছে।

তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তিই তাকে অত্যন্ত কাছেই পেতে পারে। তাঁর কাছে গোপনে, প্রকাশ্যে নীরবে, উচ্চকণ্ঠে, দলবদ্ধভাবে, একাকী, নির্জনে, যে কোন স্থানে নিজের আবেদন-নিবেদন পেশ করা যেতে পারে। তাঁর কাছে কোন আবেদন করতে হলে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয়না। তিনি সরাসরি আবেদন গ্রহণ করেন এবং জবাব দান করেন। এমনকি তাঁর কাছে যদি মনে মনে আবেদন পেশ করো, তবুও তিনি তা মঞ্জুর করেন। সুতরাং তিনিই তোমাদের ইলাহ এবং রব। তাঁরই দাসত্ব করো। তাঁর কাছেই সরাসরি আবেদন পেশ করো। তাঁর দাসত্ব ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করো না। কেন না, সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই।

এক বিস্ময়কর উট

সামূদ জাতি আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর ভেতরে দ্বিতীয় জাতি যা আ'দ জাতির পরে সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতিমান ও নামকরা ছিল। হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মিশর হতে বের হবার পূর্বেই সামূদ জাতি পৃথিবীর বুক হতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আ'দ জাতির পরপরই আল্লাহ্ সামূদ জাতির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, যেন মানুষ আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলে। মাতা-পিতা তাঁর কলিজার ফুল সন্তানদেরকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনার জন্য নানা পথ অবলম্বন করেন। বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্ত দেন, যেন সন্তান সৎ পথে ফিরে আসে। সন্তানকে তার মাতা-পিতা ঐ দৃষ্টান্ত পেশ করেন, যারা ভুল পথ অবলম্বন করে নিশ্চিত ধ্বংসে হয়ে গেছে। এই দৃষ্টান্ত পেশ করার পেছনে মাতা-পিতার এই উদ্দেশ্য থাকে না যে, তার সন্তান ভীতগ্রস্থ হয়ে যাক। বরং তাদের উদ্দেশ্য তাকে সন্তানের কল্যাণ হোক। সন্তান সৎ পথে প্রত্যাবর্তন করে কল্যাণ লাভ করুক।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহকে ঐ মাতা-পিতার থেকে অনেকগুণ বেশী ভালোবাসেন। তাঁর কোন একজন বান্দা শাস্তি ভোগ করুক আল্লাহ্ এটা চান না। এ কারণে তিনি তাঁর বান্দার সামনে অতীত জাতিসমূহের দৃষ্টান্ত পেশ করেন, বান্দাকে বুঝাতে থাকেন, এই পথ অবলম্বন করলে তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সুতরাং এই পথ ত্যাগ করে তোমরা নবীর প্রদর্শিত পথে ফিরে এসো। বান্দার কল্যাণের জন্যই আল্লাহ্ এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেন বান্দা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সহজ সরল পথে ফিরে আসে। আল্লাহর বিধানের সাথে বিরোধিতা করে যারা নিজেদের অকল্যাণ ডেকে এনেছে, তাদের ইতিহাস আল্লাহ্ মানুষকে শুনিয়েছেন। সামূদ জাতি কিভাবে নিজেদের জুলুমের কারণে ধ্বংস হলো আল্লাহ্ সেই ইতিহাস বর্ণনা করছেন–

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا–قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ–قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ–هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَاتَمَسُّوْهَا بِسُوْۤءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ–

এবং সামূদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই সালেহ্কে প্রেরণ করেছিলাম। সে তাঁর

জাতিকে আহ্বান জানিয়েছিল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ব্যতীত তেমাদের কোন ইলাহ্ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে পৌছেছে, এটা আল্লাহর উট, তোমাদের জন্য একটা নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং এই উটকে ছেড়ে দাও, আল্লাহর যমীনে বিচরণ করবে। কোন অসৎ উদ্দেশ্যে একে স্পর্শ করো না। যদি করো তাহলে এক কঠিন পীড়াদায়ক আযাব তোমাদেরকে গ্রাস করবে। (সূরা আ'রাফ-৭৩)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ যে প্রকাশ্য প্রমাণের কথা বলেছেন, সে প্রমাণ ছিল আল্লাহর উট। পবিত্র কোরআনে সূরা শু'আরায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামূদ জাতির লোকজন হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালামের কাছে তাঁর প্রকৃত নবী ও রাসূল হওয়ার অনুকূলে অকাট্য প্রমাণ ও দলীল স্বরূপ নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল। তাদের দাবীর প্ররিপেক্ষিতে মহান আল্লাহ হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালামকে এক বিস্ময়কর উট দান করেছিলেন।

হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালাম তাঁর জাতিকে বারবার ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহবান জানালেন। তাদের নিজেদের বানানো আদর্শ ত্যাগ করে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসারে তাদের জীবন পরিচালনা করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু সেই জাতির মূঢ় পরিচালকগণ জাতিকে নিষেধ করেছিল, তারা যেন আল্লাহর নবীর কথার প্রতি কোন মনোযোগ না দেয়। এরপরেও কিছু সংখ্যক মানুষ আল্লাহর নবীর আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করে নবীর সহযোগী হয়েছিল।

জাতির নেতা এবং তাদের অনুসারীগণ আল্লাহর নবীকে বিদ্রূপ করে বলতো, আমরা যদি আল্লাহর অপছন্দনীয় পথেই চলতাম এবং আল্লাহ যদি আমাদেরকে পছন্দ না-ই করতো, তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ এত উন্নতি দিতেন না। বরং আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার যে কয়জন অনুসারী আছে তাদেরকেই পছন্দ করে না। একারণেই তিনি তোমাদের কোন ধন-দৌলত দেননি। এই জাতির ভেতরে তোমরা সবচেয়ে গরীব। এই সমাজে তোমাদের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি নেই। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, কে সত্য পথে আছে আর কে মিথ্যার অনুসারী।

হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালাম সমাজের এই নেতৃস্থানীয় লোকগুলোর কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন, এসব ধন-দৌলতের সাথে আল্লাহর পছন্দ অপছন্দের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ কাকে সম্পদ দান করবেন

আর কাকে দান করবেন না, এটা সম্পূর্ণ তাঁর এখতিয়ারে। তেমাদেরকে আল্লাহ সম্পদ এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, এ কারণে তোমাদের তো উচিত হলো, শোকর হিসেবে আল্লাহর দাসত্ব করা। তোমরা তা না করে আল্লাহর আইনের সাথে বিদ্রোহ করছো।

তারা অবশেষে দাবী করলো, তুমি যদি সত্যই আল্লাহর নবী হয়ে থাকো তাহলে মুজিযা দেখাও। তাদের দাবী অনুসারে হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ এমন এক পদ্ধতিতে একটি উট প্রেরণ করেছিলেন, যা করা কোন মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালাম তাঁর জাতিকে বললেন, তোমাদের দাবীকৃত নিদর্শন এই যে তোমাদের সামনে উপস্থিত। যদি তোমরা এই উটকে কোন ধরনের কষ্ট প্রদান করো তাহলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তোমরা যে কূপ হতে পানি পান করো, আল্লাহ নিয়ম করে দিয়েছেন যে, ঐ কূপের পানি একদিন তোমরা পান করবে এবং একদিন উট পান করবে।

পবিত্র কোরআন এই উটকে নাকাতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর উট নামে ভূষিত করেছে। সামূদ জাতি যদিও হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালামের ওপরে ঈমান আনেনি, তবুও তারা এই উট দেখে ভয় পেয়েছিল। এ কারণে তারা উটকে কোন ধরণের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত ছিল। আল্লাহর নবী পানি পান করার যে নিয়ম চালু করেছিলেন, সেই নিয়ম তারা পালন করে চলছিল। উটের দুধও তারা পান করতো। উট স্বাধীনভাবে তার বাচ্চাসহ চারণ ভূমিতে চড়ে বেড়াত। জাতির অবাধ্য নেতৃবৃন্দ এটাও সহ্য করতে পারেনি। তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকলো কিভাবে এই উটকে হত্যা করা যায়। ঘটনা দৃষ্টে অনুমান করা যায়, জাতির নেতৃবৃন্দ গোপনে হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর দোয়ার বরকতে প্রকাশিত উট ও তারা বাচ্চার বিরুদ্ধে জনসমর্থন যোগাড় করছিল। এই উটকে হত্যা করার জন্য তারা কয়েক জন মহিলাকে হাত করেছিল, যারা ছিল সে সমাজে চরিত্রহীনা।

এই মহিলাগণ কয়েকজন দুষ্কৃতীকারী লোকের কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিল, তোমরা যদি এই উটকে এবং হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালামকে হত্যা করতে পারো, তাহলে তোমরা আমাদেরকে ভোগ করতে পারবে। তারা মহিলাদের কথায় রাজী হয়ে উটকে হত্যা করলো। উটের বাচ্চাটি তার মা'কে হত্যা করতে দেখে চিৎকার

করতে করতে পাহাড়ের দিকে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারা এই ষড়যন্ত্রও করেছিল, ভোর রাতে হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর পরিবার পরিজনকে হত্যা করবে। হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালাম এই ঘটনা জানতে পেরে তাঁর জাতিকে বললেন, আমি যা আশংকা করছিলাম অবশেষে তোমরা তাই ঘটিয়েছো। এবার তোমরা আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছো। আল্লাহর এই আযাব আসবে মাত্র তিনদিন পরে। তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো। এই আযাব তোমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেবে।

বজ্রধ্বনিওয়ালা বিদ্যুৎ

মহান আল্লাহ এমন ভয়ংকর আযাব প্রেরণ করেছিলেন যে, তারা ক্ষনিকের মধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কোরআনে এই আযাবের ধরণ সম্পর্কে কোথাও বলা হয়েছে, বজ্রধ্বনিওয়ালা বিদ্যুৎ, কোথাও বলা হয়েছে ভূকম্পন সৃষ্টিকারী বস্তু, কোথাও বলা হয়েছে, ভয়ংকর ধ্বনি, কোথাও বলা হয়েছে বিকট চিৎকার। এই কথাগুলো বলা হয়েছে এ কারণে যে, মূল বস্তুর বিভিন্ন প্রকার বিশেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলো বলা হয়েছে। মানুষ যেন অনুধাবন করতে পারে, আল্লাহর আযাবের ভয়াবহতা কেমন ছিল।

তোমরা বারবার কল্পনা করে দেখো, এমন একটি বিদ্যুৎ যা চমকিত হচ্ছে এবং তোমাদের চোখ ঝাপসা করে দিচ্ছে। বিদ্যুতের ভয়ংকর ধ্বনিতে তোমাদের কান কোন শব্দ অনুভব করার শক্তি হারিয়ে ফেলছে। পায়ের নীচের মাটি থরথর করে কাঁপছে। দৃষ্টির সামনে আলোকিত পরিবেশটা হঠাৎ করেই অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে। এসব দৃশ্য তোমরা তোমাদের সামনে অহরহ দেখছো। আর সামূদ জাতির ওপরে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, তা কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তাদের ওপরে যে ধ্বংস্ নেমে এসেছিল, তা ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ–
كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا–اَلاَ اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ–اَلاَ بُعْدًا لِّثَمُوْدَ–

আর যারা জুলুম করেছিল, এক প্রচন্ড শব্দ তাদেরকে আঘাত হানলো এবং তারা নিজেদের ঘরে এমনভাবে নিস্পন্দন ও নির্জীব হয়ে পড়ে থাকলো যেন তারা

সেখানে কোনদিনই বসবাস করেনি। শোন! সামুদ তাদের রবের সাথে কুফুরী করেছে। আরো শোন! দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে সামুদকে। (সূরা হুদ-৬৭-৬৮)

হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালামের আহবানে যারা সাড়া দেয়নি এবং তাঁর সাথে যারা বিরোধিতা করেছে, তাদের ধ্বংসের চিত্র পবিত্র কোরআনে বেশ কয়েক জায়গায় মহান আল্লাহ্ তুলে ধরেছেন–

وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ-وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ-وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ-فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ-فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

আর দেখো, হিজ্‌রের লোকজন রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপাদন করেছিল, আমি আমার নিদর্শনসমূহ তাদেরকে দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সত্য গ্রহণ হতে বিরত থাকলো। তারা পাহাড় কেটে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করতো যেন তারা সুরক্ষিত থাকে। (কিন্তু তাদের দেহের শক্তি আর সুরক্ষিত বাড়ি-ঘর তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি) কিন্তু একদিন ভোরে এক ভয়ংকর ও বিকট ধ্বনি এসে তাদেরকে গ্রেফতার করেছিল। (এবং সবাই নিজের বাড়িতেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল) আর তারা নিজেদের চেষ্টা তদবীর দ্বারা যা কিছুই উপার্জন করেছিল তা তাদের কোনই কাজে এলো না। (সূরা হিজ্‌র-৮০-৮৪)

মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত এই পৃথিবীতে কোন একটি প্রাণীর পক্ষেই এক মুহূর্ত টিকে থাকা সম্ভব নয়, এ কথা মানুষ জাতির কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। তবুও এই মানুষ আল্লাহর দাসত্ব করে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاَنَّهٗ اَهْلَكَ عَادَ نِ ا الْاُوْلٰى-وَثَمُوْدَاْ فَمَا اَبْقٰى-

আর এই যে, তিনি প্রথমে আ'দ জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন এবং সামুদকেও, তারপর তাদের কাউকে অবশিষ্ট রাখলেন না। (সূরা আন্ নাজম-৫০-৫১)

মহান আল্লাহ্ আল্লাহর বিধানের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শনকারী সামুদ জাতির ধ্বংস চিত্র সম্পর্কে সূরা কামার-এর ৩০-৩১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ-اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ-

তারপর দেখো, আমার আযাব কত ভয়াবহ ছিল এবং আমার সাবধানবাণী ছিল কত ভয়াবহ। আমি তাদের ওপর শুধুমাত্র একটা শব্দ ছেড়েছি, ফলে তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীদের নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ ডাল পালার মতই ভুষি হয়ে গেল।

কোরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই জাতিকে অনেক ওপরে উঠিয়ে নিয়ে যমীনের ওপরে আছাড় দিয়ে ফেলা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন–

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ–فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ–

সামূদ ও আ'দ সেই আকস্মিকভাবে সংঘটিতব্য মহাবিপদকে অবিশ্বাস করেছে। তারপর যারা সামুদ জাতি ছিল, তাদেরকে আমি উর্ধ্বে উঠিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছি। (সূরা আল্ হাক্কাহ্-৪-৫)

এভাবে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আ'দ ও সামুদ জাতির ইতিহাস তুলে ধরেছেন। শুধু তারাই নয়, অতীতে যেসব জাতি আল্লাহর বিধানের সাথে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে, তারপর তারা কিভাবে আল্লাহর গযবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেসব ইতিহাস আল্লাহ মানুষকে শুনাচ্ছেন। মানুষ যেন এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মহা ধ্বংস হতে নিজেরদেরকে হেফাজত করে।

মহাসত্য গ্রহণ করুন হে আমার পিতা

পরিণত বয়সে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম দেখলেন, তাঁর গোটা জাতি এক অন্ধকার জগতে নিমজ্জিত রয়েছে। সেই সাথে তাঁর গোটা পরিবারও অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। যে মহান আল্লাহ এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং এর প্রতিপালন করছেন, তাঁর সাথেই এরা শির্ক করছে। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, এই পরিবারই হলো শির্কের ঘাঁটি। তাঁর পিতা আযারের মূর্তি নির্মাণ ও পূজা করা গোটা জাতির আশ্রয়কেন্দ্র এবং প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। এখন তিনি মানুষকে যদি এই মূর্তি পূজা হতে বিরত রাখতে চান তাহলে তাকে সর্ব প্রথমে নিজের পরিবারের লোকদের প্রতি মহাসত্যের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে।

সুতরাং পরিবার প্রধান তাঁর পিতাকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর প্রতি আহবান জানাতে হবে। তিনি যদি মূর্তি পূজা ত্যাগ করেন তাহেল পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ এমনিতেই মূর্তিপূজা ত্যাগ করবে। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্

সালাম সর্বপ্রথমে নিজের পিতাকেই আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, আব্বাজান! আপনি আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য যে পথ ও মত গ্রহণ করেছেন তা একেবারেই ভ্রান্ত পথ। আপনি বলে থাকেন যে এ পথ হলো আপনার পূর্ব পুরুষদের পথ। তারা যদি ভুল পথ অবলম্বন করে থাকে তাহলে আপনিও কি তাদের সেই ভুল পথেই চলবেন? রাজা-বাদশাহর পূজা আর মূর্তি পূজার পথ তো মানুষকে ভুল পথেই নিয়ে যায়। আপনি ঐ পথ ত্যাগ করে সহজ সরল পথে আসুন। আমি আপনাকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথপ্রদর্শন করছি। এই পথ আপনাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে।

আপনি নিজের হাতে যাদেরকে বানাচ্ছেন, তারা কি করে আপনাকে মুক্তি দিতে পারে? যে শক্তি দেখতে পায়না, শুনতে পায়না, যাদের কোন বোধ শক্তি নেই, তারা কি করে আপনাকে মুক্তি দিতে পারে তা কি আপনি চিন্তা করে দেখেছেন? আপনি সমস্ত শক্তির দাসত্ব ত্যাগ করে এক আল্লারহ দাসত্ব করুন, যে আল্লাহ আপনাকে আমাকে এবং গোটা জাহান সৃষ্টি করেছেন এবং তা প্রতিপালন করছেন। আপনি যদি এই পৃথিবী এবং পরকালে মুক্তি পেতে চান তাহলে ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করে এক আল্লাহর দাসত্ব করুন এবং তাঁর দান করা বিধান গ্রহণ করুন।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম কথার উত্তরে তাঁর মুশরিক পিতা আযার জবাব দিল, দেখো ইবরাহীম! তুমি আমাদের উপাস্য রাজা এবং এই মূর্তিদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ এবং অপপ্রচার বন্ধ করো। যদি অপপ্রচার বন্ধ না করো, তাহলে আমি তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে বাধ্য হবো।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম দেখলেন, এখন তাঁর সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা আছে। একদিকে তাঁকে তাঁর পিতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হতে বিরত থাকতে হবে। অপরদিকে তাঁর দায়িত্ব পালনও করতে হবে, সত্য প্রচার করতে হবে। এসব দিক চিন্তা করে তিনি এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যে পন্থা কেবল আল্লাহর একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নবী গ্রহণ করতে পারে। তিনি মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দিলেন না। কঠোরতার মোকাবেলায় কঠোরতা আরোপ করলেন না। নীচতার মোকাবেলা তিনি নীচতা দিয়ে করলেন না। তিনি ভদ্রতা, নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করলেন। তিনি বিনয়ের সাথে পিতাকে বললেন, আব্বাজান! আমি আপনাকে ভালো কথা বললাম আর আপনি তার জবাবে বললেন, আমাকে

আপনি পাথর মেরে হত্যা করবেন। তাহলে আমি আপনাকে সালাম দিয়ে আপনার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি। আমি তওহীদের আদর্শ ত্যাগ করতে পারছি না। আমি আপনার মত কোন অবস্থাতেই মূর্তি পূজা করতে পারি না।

আপনারা যেভাবে একজন মানুষ এবং কিছু মাটির বানানো মূর্তির সামনে মাথানত করেন, আমি তা করতে পারি না। সুতরাং আজ থেকে আমি আপনার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। তবুও আমি আমার আল্লাহর কাছে আপনার জন্য দোয়া ভিক্ষা করবো। আপনার এই ভ্রান্তির জন্য আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করবো। আমি আমার আল্লাহর কাছে বলবো, তিনি যেন আপনাকে সৎ প্রদর্শন করেন এবং আখেরাতে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন।

সূরা মরিয়ামে মহান আল্লাহ এই ঘটনাটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে আলোচনা করেছেন। সূরা আনয়ামেও মহান আল্লাহ তাদের পিতা-পুত্রের কথা আলোচনা করেছেন। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম তাঁর নিজের ঘর থেকে সর্বপ্রথম আন্দোলনের কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁর পিতাকে তিনি প্রথমে দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার জন্য। তাঁর পিতা দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকারই শুধু করেননি, তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এ কারনে তাঁর পিতার সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি। তিনি অত্যন্ত কৌশলের সাথে পিতার সাথে কথা বলেছিলেন। পিতার জন্য কোন বদ দোয়া বা অভিশাপ করেননি। তিনি তাঁর পথভ্রষ্ট পিতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন বলে পিতাকে জানিয়ে তাঁর কাছ হতে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন।

বর্তমান যুগে যারা ইসলামী আন্দোলন করছে বা করবেন, তাদের জন্য হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম আন্দোলনের পদ্ধতি সম্পর্কে উজ্জ্বল জোতিষ্ক হয়ে আছেন। তিনি তাঁর পিতার সাথে যে আচরণ করেছিলেন, বর্তমানেও আন্দোলনের কর্মীদের জন্য সেইভাবেই কথা বলতে হবে। মহান আল্লাহ অকারণে এই কাহিনী ওহী হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে অবতীর্ণ করেননি। এসব কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আন্দোলনের কর্মীদের পথ চলতে হবে।

তোকে পাথর নিক্ষেপ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান নবী ছিলেন। তাঁর নামে পবিত্র কোরআনে স্বতন্ত্র একটি সূরাও অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর সেই উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে যা অন্যান্য নবীদের তুলনায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব পবিত্র কোরআনে তাঁর বিভিন্ন ঘটনাবলীকে নানা প্রকারে বহুস্থানে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআন তাঁর মহান ব্যক্তিত্বকে মানুষের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উজ্জ্বলভাবে পেশ করেছে। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের পিতা ছিল মূর্তি নির্মাতা এবং রাজ পুরোহিত। এ কারণেই তাকে 'আযার' বা শ্রেষ্ঠ মূর্তি পূজক হিসেবে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আযার তার ব্যক্তি বাচক নাম ছিল না, এটা ছিল তার গুণবাচক নাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً-اِنِّىْ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ-

ইবরাহীমের ঘটনা স্মরণ করুন। সে যখন আপন পিতা আযরকে বলেছিল, তুমি কি মূর্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করছো? আমি তো তোমাকে ও তোমার দলের লোকজনকে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি। (সূরা আনয়াম-৭৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার লোকগুলোকে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন, তখন তারা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীমের অনুসারী বলে দাবী করতো অথচ তারা হযরত ইবরাহীমের আদর্শের বিপরীত পথেই চলতো। এ কারণে তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা নিজেদেরকে যার অনুসারী দাবী করে মূর্তি পূজায় লিপ্ত রয়েছো, সেই ইবরাহীম স্বয়ং তাঁর পিতাকে কি বলেছিলেন, তা শুনে নাও। তিনি বলেছিলেন, তুমি কি মূর্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করছো? আমি তো তোমাকে ও তোমার দলের লোকজনকে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি। আজ তোমরা যেমন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের সাথে বিতর্ক করছো, তাঁর প্রতি বিরক্ত হচ্ছো, তাদেরকে হুমকি প্রদর্শন করছো, ইবরাহীমের পিতাও এমনি বিরক্তি প্রকাশ করেছিল এবং হুমকি প্রদর্শন করেছিল। শোন তোমোদের বরণ্য নেতা ইবরাহীমের ইতিহাস–

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ-اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا-اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا- يٰاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَاءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا-يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ-اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا-يٰاَبَتِ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰاِبْرٰهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا-

আর এই কিতাবে ইবরাহীমের কাহিনী বর্ণনা করো। সে নিঃসন্দেহে একজন সত্যপন্থী মানুষ এবং নবী ছিল। (এই লোকদেরকে সেই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিন) যখন সে তাঁর পিতাকে বলেছিল, হে পিতা! আপনি কেন সেই সব জিনিষের দাসত্ব করেন যা না শুনতে পারে আর না দেখতে পারে, আর না আপনার কোন কাজ সম্পাদন করে দিতে সক্ষম? আব্বাজান! আমার কাছে এমন এক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি। আপনি আমাকে অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে অভ্রান্ত পথ প্রদর্শন করবো। আব্বাজান! আপনি শয়তানের দাসত্ব করবেন না। শয়তান তো রহমানের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমার শংকা হচ্ছে যে, আপনি রহমানের আযাবে নিমজ্জিত হয়ে না পড়েন, আর শয়তানের সাথী হয়ে না বসেন। পিতা বললো, ইবরাহীম! তুই কি আমার ইলাহদের থেকে বিমুখ হয়ে গেছিস? তুই যদি বিরত না হস, তাহলে আমি তোকে পাথর নিক্ষেপ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব। তুই চিরদিনের জন্য আমার কাছে থেকে দূরে সরে যা। (সূরা মরিয়ম-৪১-৪৬)

একি দুর্দশা তোমাদের!

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহ তা'য়ালা প্রথম থেকেই সত্য উপলব্ধি এবং সত্য পথের সন্ধান ও হেদায়েত দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মূর্তিগুলো শুনতেও পারনা, দেখতেও পারনা এবং কারো ডাকে সাড়া দিতেও পারে না। কারো কোন ক্ষতি বা উপকার করতেও পারে না। তিনি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নিজের চোখে দেখতেন যে, এ সমস্ত নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোকে আমার পিতা নিজের হাতে তৈরী করেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের দেহের আকতিদান করেন ও

চোখ, কান, মুখ নির্মাণ করেন। অতএব এসব মূর্তি কিছুতেই ইলাহ্ হতে পারে না এবং তাঁর সমকক্ষও হতে পারে না। পবিত্র কোরআনে সূরা আম্বিয়ার ৫১-৫৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর এই প্রিয় বন্ধু সম্পর্কে বলেছেন –

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ-اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ-قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ-قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ-قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ-قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِىْ فَطَرَهُنَّ-وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ-

নিঃসন্দেহে আমি প্রথম থেকেই ইবরাহীমকে হেদায়েত ও সৎ পথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাঁর (কর্মকান্ড) সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিলাম। যখন সে তাঁর পিতা ও নিজের জাতিকে বললো, এই মূর্তিগুলো কি? যা নিয়ে তোমরা বসে আছো। (তারা জবাব দিল) আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এসবের পূজা করতে দেখেছি। ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। তারা জবাব দিল, তুমি কি আমাদের জন্য কোন সত্য নিয়ে এসেছো? না কি এমনি বিদ্রুপকারীদের মত বলছো? ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম বললেন (এ সমস্ত মূর্তি তোমাদের প্রতিপালক নয়) বরং তোমাদের প্রতিপালক পৃথিবী ও আকাশসমূহের পরোয়ারদিগার যিনি এই সমদুয়কে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি এই বিশ্বাসই ঘোষনা করছি।

এভাবে এই মহান মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহাপুরুষের ওপর আল্লাহর অবারিত অনুগ্রহ স্রোতের মত অবিরত ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করলো, সে সময়ে তিনি তাওহিদী আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করলেন। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর জাতি মূর্তিপূজা, নক্ষত্র পূজাসহ বিভিন্ন ধরণের জড়পদার্থের দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ। কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী অজ্ঞ জাতিকে নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করছে। মানুষের ওপর মানুষ প্রভুত্ব করছে। গুটিকতক শক্তিশালী মানুষ–যারা দেশ ও সমাজের নেতৃত্ব নিজেদের হাতের মুঠোয় কব্জা করে রেখেছে, তারা বিভিন্ন কৌশলে গোটা জাতিকে নির্মমভাবে শোষন করছে।

ক্যারেমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ধর্মের নামে গোটা জাতিকে নিজেদের দাসে পরিণত করেছে। অন্যায় অত্যাচারের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে অথচ প্রতিবাদ করার কারো কোন সাহস নেই এবং মানসিকতাও নেই। মিথ্যে শক্তির পূজারীগণ সাধারণ মানুষের মন থেকে ন্যায়-অন্যায় বোধের পার্থক্য মুছে দিয়ে সমস্ত দেশবাসীকে মূঢ় জাতিতে পরিণত করেছে। ইসলামী আন্দোলনের এই মহান নেতা দেশবাসীকে আহবান জানালেন– হে আমার জাতি! একি দুর্দশা তোমাদের! কেন তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব পরিত্যাগ করে এসব মূর্তির দাসত্ব করছো? তোমরা যার দাসত্ব করছো তার কোন ক্ষমতা নেই। তারা না পারে নিজেদের কোন উপকার করতে আর না পারে তোমাদের কোন উপকার করতে।

তোমরা যাদের আইন মেনে চলছো তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। এরা নিজেদের কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তোমাদেরও কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। তোমরা তাঁর আইন মেনে চলো, যিনি এই গোটা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবীর ভেতরে এবং বাইরে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুকে প্রতিপালন করছেন। এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন অনুসরণ করোনা। তিনিই গোটা জাহানের একমাত্র প্রতিপালক। তিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। অতএব কেবলমাত্র তাঁরই দাসত্ব করো। আমার মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্য আইন-কানুন অবতীর্ণ করছেন, সেই আইন অনুসরণ করো। কেবল মাত্র তাঁর সামনেই মাথানত করো, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক।

আমাদের পূর্বপুরুষ যা করেছেন

ইতিহাস সাক্ষী, সেই মূঢ় জাতি হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের কোন কথায় কর্ণপাত করলো না। ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করতে শুরু করলো তারা। হতভাগা জাতি তাদের মূক, বধির, অন্ধ উপাস্য দেবতার মতই বধির অন্ধ হয়ে থাকলো। সত্য কথা তাদের কানে প্রবেশ করলো না। তাদের চোখ সত্য দর্শন করতে পারলো না। সত্য অস্বীকারকারী মানুষদের অবস্থা প্রকৃত পক্ষে এমনই হয়। তাদের সমস্ত ক্ষমতা থাকে কিন্তু সত্য গ্রহণ করার মত ক্ষমতা থাকে না।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের জাতির অবস্থাও তেমনি ছিল। তারা নিজের চোখে সমস্ত কিছুই দেখছিল, কিন্তু তারা তাদের চিন্তা শক্তি বা বিচার শক্তি কাজে লাগিয়ে দেখছিল না যে, তারা যা করছে, তা কতটুকু যৌক্তিক। হযরত ইবরাহীম

আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন, বলো তো, তোমরা যাদেরকে উপাস্য হিসেবে পূজা অর্চনা করছো, তারা কি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না কোন কল্যাণ করতে পারে? হতভাগার দল আল্লাহর নবীকে উত্তর দিয়েছিল, এ বিষয়ে আমরা তোমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে ইচ্ছুক নই। আমরা এটাই জানি যে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যা করে গেছেন, আমরাও তাই করছি।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এবার কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের এই মূর্তিগুলোকে আমার শত্রু মনে করি। আমি তোমাদের এই মূর্তিসমূহকে মোটেও ভয় করি না। এরা যদি পারে তাহলে আমার কোন ক্ষতি করুক। আমি শুধু সেই সত্তাকে ভয় করি যিনি গোটা জাহানের রব। তিনিই আমার মালিক এবং মনিব। তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে প্রতিপালন করছেন। মহান আল্লাহই আমাকে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনিই আমাকে সহজ সরল পথ দেখিয়েছেন। আমি শুধু তাঁকেই ভয় করি, যিনি আমাকে খাদ্য ও পানিয় দান করেন এবং আমাকে জীবিত রেখেছেন। আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন তিনিই আমাকে সুস্থতা দেন। তিনিই আমার জীবন এবং মৃত্যুর মালিক। আমি যদি কোন ভুল করি তাহলে আমি তাঁর রহমতের আশা করি, তিনি আমাকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দিবেন। আমি সব সময় তাঁর দরবারে এই আবেদন করি যে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত শক্তি দিন। আপনি আমাকে সত্য বলার সাহস দিন।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম তাঁর পিতা এবং জাতিকে কিভাবে ইসলামের দাওয়াত দান করেছিলেন, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ মানুষকে শুনাচ্ছেন—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ-اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ-قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ-قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ-اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ-قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ-قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ-اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ-فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ-الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ-وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ-وَاِذَا

مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ-وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ-وَالَّذِيْ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ-

আর আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শুনিয়ে দিন। যখন সে তাঁর পিতা এবং তাঁর জাতির কাছে প্রশ্ন করেছিল, এই জিনিষগুলো কি তোমরা যার পূজা করছো? তারা জবাব দান করেছিল, কিছু সংখ্যক মূর্তি যেগুলোর আমরা পূজা করি এবং এদের সেবায় আমরা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছি। ইবরাহীম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যখন তোমরা এদেরকে ডাকো তখন তারা তোমাদের ডাক শুনতে পায়? অথবা তারা কি তোমাদের কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে ?

তারা জবাব দিয়েছিল, না, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এই ধরনের করতে দেখেছি। এ কথা শুনে ইবরাহীম বলেছিল, তোমরা কি কখনো নিজেদের চোখ মেলে এদেরকে দেখেছো, যেগুলোর দাসত্ব তোমরা ও তোমাদের অতীত বাপ-দাদারা করে আসছো? আমার রাব্বুল আলামীন ব্যতীত এরা সবাই আমার চরম শত্রু। রাব্বুল আলামীন আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান। আমি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি, তখন আমাকে আরোগ্য দেন। যিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং পরে আবার জীবন দিবেন। আর যার কাছে আমি আশা পোষণ করি যে, বিচার দিবসে তিনি আমার ভুলসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা শুআরা-৬৯-৮২)

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম মূর্তি পূজার অসারতা সম্পর্কে তাঁর জাতি এবং নিজের পিতাকে নানা ধরনের যুক্তি দিয়ে বুঝালেন। কিন্তু তাদের অন্তর এতই কলুষিত হয়েছিল যে, সত্য তাদের অন্তরে আসন গ্রহণ করতে সক্ষম হলো না। তারা এসব বাতিল মাবুদ ও ইলাহকেই চরম সত্য হিসেবে আঁকড়ে ধরে থাকলো। এই জাতি শুধু নিজের হাতে বানানো মাটির পুতুলেরই পূজা করতো না, তারা আকাশের চন্দ্র, তারা, সূর্য ও নানা ধরনের নক্ষত্রেরও পূজা করতো। এসব নক্ষত্রকে তারা অসীম শক্তিশালী মনে করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের জীবন-মৃত্যু, খাদ্য, কল্যাণ-অকল্যাণ, মানুষের ওপরে নানা ধরনের দুর্ভোগ, বিপদ-আপদ, যুদ্ধে জয়-পরাজয় এবং পৃথিবীর যাবতীয় নিয়ম-কানুন নক্ষত্রসমূহ এবং এর প্রভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেব-দেবতা এবং নক্ষত্রসমূহই এসব করছে।

সুতরাং এসব দেব-দেবতা ও আকাশের চন্দ্র, সূর্য ও তারকা এবং নক্ষত্রকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে টিকে থাকার কোন পথ নেই। তাদেরকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র মাধ্যম হলো, তাদের পূজা উপাসনা করা। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম মাটির বানানো মূর্তি সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করে একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলেন। পূর্ব পুরুষের দোহাই ব্যতীত তারা কোন জবাবই দিতে পারেনি। এবার তিনি এমন এক কৌশল অবলম্বন করলেন যে, নক্ষত্র পূজাড়ীদের কাছে যেন এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায়, নক্ষত্র পূজা করা অর্থহীন এবং দাসত্ব করতে হলে করতে হবে একমাত্র তাঁরই যিনি এই নক্ষত্রসমূহ পরিচালিত করছেন।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম যেভাবে তাদের মাটি বা পাথরের বাতিল মাবুদগুলোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে তাদেরকের সত্য পথের দিকে আহ্বান করলেন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন মনে করলেন যে, তাদের পূজনীয় নক্ষত্রগুলোর অস্থায়িত্ব এবং ধবংসশীল হওয়ার দৃশ্য তাদের সামনে পেশ করে এই তথ্যটিও জানিয়ে দেন যে, এটা তোমাদের নিশ্চিত ভ্রান্ত ধারণা যে, এই উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান নক্ষত্র, আকাশের চন্দ্র এবং সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহগুলোর মাবুদ হবার শক্তি রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তা নয়, এদের কোন শক্তিই নেই। এটা তোমাদের ভুল ধারণা।

কিন্তু এই জাতি যখন নিজেদের হাতের বানানো মাটি ও পাথরের মাবুদকে এত ভয় করতো যে, কেউ যদি এদের কোন ধরণের নিন্দা করে বা এদেরকে অবহেলা করে, তাহলে এদের অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই অবস্থায় এই জাতির অন্তরে নক্ষত্র পূজার বিপরীত প্রেরণা সৃষ্টি করা কোন সহজ বিষয় ছিল না। সার্বিক দিক চিন্তা গবেষণা করে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এক অদ্ভুত পদ্ধতি অবলম্বন করলেন।

অভূতপূর্ব পদ্ধতি অবলম্বন

ইলাহ, মা'বুদ, রব বা যার গোলামী করা হবে, তিনি অবশ্যই অসীম শক্তির অধিকারী হবেন এবং তিনি হবেন স্থায়ী। এই বিষয়টি তিনি সেই জাতিকে যদি এভাবে বুঝাতে যেতেন য, তোমরা যে, চাঁদ, তারকা ও সূর্যকে অসীম শক্তিশালী মন করে তাদেরকে ইলাহ হিসেবে পূজা করছো, তারা তো অস্থায়ী। এভাব বললে, সেই জাতি তার কথা মেনে নিত না। এ জন্য তিনি এমন এক কৌশল অবলম্বন করলেন, যার মাধ্যমে জাতির কাছে যেন এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, তারা যেসব

জিনিসের পূজা করছে, তারা অস্থায়ী। এই ঘটনা আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاكَوْكَبًا–قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَاَ أُحِبُّ الافِلِيْنَ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ–فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ–فَلَمَّا رَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَا اَكْبَرُ–فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ–اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا–وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ–

তারপর তাঁর ওপর যখন রাত্র আচ্ছন্ন হয়ে এলো তখন সে একটা তারকা দেখতে পেলো। সে বললো, এই কি আমার রব? কিন্তু পরে যখন তা অস্তমিত হয়ে গেল, তখন সে বললো, অস্ত হয়ে যাওয়া জিনিষের প্রতি আমি কিছুমাত্র অনুরাগী নই। পরে যখন উজ্জ্বল চন্দ্র দেখতে পেলো তখন সে বললো, এই কি আমার রব? কিন্তু সেটাও যখন অস্ত গমন করলো তখন সে বললো, আমার রবই যদি আমাকে পথ না দেখান তবে আমিও পথভ্রান্ত লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়বো। এরপর যখন সূর্যকে উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত দেখতে পেলো তখন বললো, এই হচ্ছে আমার রব, কেননা এটা সবচেয়ে বড়। কিন্তু পরে এটাও যখন অস্তমিত হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম চীৎকার করে বললো, হে লোকজন! তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানাচ্ছো, আমি সেসব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সত্ত্বার দিকে কেন্দ্রীভূত করেছি, যিনি জমীন ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। (সূরা আনয়াম-৭৫)

রাতের আকাশে যে নক্ষত্রের আলো সবচেয়ে বেশী এবং অতিমাত্রায় উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছিলো, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সেদিকে তাকিয়ে বললেন, এটা কি আমার উপাস্য মাবুদ? কোন নক্ষত্রের ভেতরে যদি মাবুদ বা ইলাহ্ হবার শক্তি থাকে, তাহলে কি এই বড় নক্ষত্রটিই কি সেই মাবুদ? কিছুক্ষণ পরে সেই নক্ষত্রটি ক্রমশঃ অস্তের পথে এগিয়ে গেল। নিজের কক্ষ পথ ধরে তার গন্তব্য পথে যাত্রা করতে বাধ্য হলো। তাকে যারা পূজা করে, সেই পূজাড়ীদের মনের আশা সেই

নক্ষত্রটি অধিক সময় ধরে আকাশে উদিত থাক, তারা প্রাণ ভরে তার পূজা আরাধনা করবে। কিন্তু সেই নক্ষত্র তাদের আশানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের অধিক এক মুহূর্ত কাল নিজের অবস্থানে থাকতে সক্ষম হলো না।

মহান আল্লাহ সৌর জগতের জন্য যে নিয়ম করে দিয়েছেন, সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করা কোন নক্ষত্র বা কোন কিছুর পক্ষেই সম্ভব নয়। কোন নক্ষত্রের ক্ষমতা নেই, নির্দিষ্ট সময়ের সামান্য কিছুক্ষণ বেশী সে তার আলো বিতরণ করে বা টিকে থাকে। সূরা ইয়াসিনে বলা হয়েছে, রাতের ক্ষমতা নেই দিনকে অতিক্রম করে আর দিনের ক্ষমতা নেই রাতকে অতিক্রম করে। চন্দ্রের ক্ষমতা নেই সূর্যকে অতিক্রম করে আর চন্দ্রের ক্ষমতা নেই সূর্যকে অতিক্রম করে। যার যার কক্ষপথে তারা স্রষ্টার নির্দিষ্ট নিয়মের অধিন চলতে বাধ্য।

এক সময় সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, যারা এভাবে চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যায় এবং আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়, টিকে থাকার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা কখনো মাবুদ হতে পারে না এবং আমি তাদেরকে মাবুদ বলে স্বীকৃতি দিতে পারি না। যে জিনিষ পরিবর্তন শীল এবং এবং কোন এক নিয়মের অধিন, তা কিভাবে মাবুদ হতে পারে? কিছুক্ষণ পরে গোটা পৃথিবী আলোকিত করে পূর্ণিমার পূর্ণশশী উদিত হলো। নক্ষত্রমন্ডলীর চেয়ে এই চন্দ্র অধিক দীপ্তিমান এবং আকর্ষণীয়। সেই নক্ষত্রের তুলনায় সর্বদিক দিয়ে সুন্দর। নক্ষত্র কিছুস্থান জুড়ে আলোকিত করেছিল। এই চন্দ্র গোটা পৃথিবীকে আলোকিত করেছে। নক্ষত্রের তুলনায় এই চন্দ্রের শক্তি তাহলে বেশী। তাহলে কি এই চন্দ্র মাবুদ হতে পারে? সামান্য আলোর অধিকারী নক্ষত্রকে যদি তারা মাবুদ বানাতে পারে, তাহলে এত বিশাল আলোর অধিকারী এবং অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন চন্দ্রকে কেন মাবুদ বানানো যাবে না? কারণ নক্ষত্রের চেয়ে এই চন্দ্রই অধিক যোগ্য।

রাত এক সময় শেষ হয়ে এলো। পূর্বাকাশে পূর্বাশার ইশারা দেখা দিল। রাতের নিকষ কালো অন্ধকার তরল হয়ে এলো। পূর্ণিমার পূর্ণশশী এক সময় তার দীপ্তি হারিয়ে ম্রিয়মান হয়ে এলো। দীপ্তিহীন নিস্প্রভ হয়ে গেল আলোকিত পূর্ণিমার পূর্ণশশধর। বিশালাকার সূর্যের আগমন সময় যতই ঘনিয়ে আসতে থাকলো, চন্দ্র ততই দৃষ্টি পথ হতে হারিয়ে যেতে থাকলো। এই দৃশ্য অবলোকন করে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এমন এক কথা বললেন যে, যাতে চন্দ্রের মাবুদ হবার

ওপর নেতিবাচক একটা আবরণ টেনে দেয়ার সাথে সাথে একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বের দিকে গোটা জাতির দৃষ্টি এমন নীরবতার সাথে আকর্ষণ করা হয় যে, জাতি যেন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের মূল উদ্দেশ্য অনুভব করতে না পারে। কারণ তারা যদি অনুভব করতে পারতো, ইবরাহীম তাদেরকে এই নক্ষত্র পূজা হতে বিরত করতে চায়, তাহলে তারা তাঁর কোন কথাই শুনতে আগ্রহী হত না। এ কারণে ঐ নক্ষত্র এবং চন্দ্র সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এমন কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা বললেন, যেন তারা এসব কিছু পূজা করার অসারতা অনুভব করতে পারে। তিনি বললেন, আমার প্রকৃত রব যদি আমাকে পথপ্রদর্শন না করতেন তাহলে আমিও এই পথভ্রষ্ট জাতির মতই পথহারা হয়ে যেতাম।

এরপর দিনের আগমন ঘটলো। রাতের অবসানে পূর্ব গগনে দিনমনি উদিত হলো। নক্ষত্র এবং চন্দ্রের তুলনায় সূর্য অনেকগুণ বড় এবং শক্তিশালী দেখা গেল। গোটা দিন এই সূর্য পৃথিবীকে আলোকিত করে রাখলো। তারপর তা এক সময় পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হয়ে গেল। রাতের অন্ধকার ক্রমশ পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেললো। এরপর সময় এলো প্রকৃত সত্য ঘোষনা করার। তিনি তাঁর জাতির সামনে এমন কতকগুলো প্রশ্ন রাখলেন যে, গোটা জাতি নিরুত্তর হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে এইসব নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য যদি মাবুদ হয়, তাহলে তাদের এত পরিবর্তন কেন? কেন তারা আরেকটি নিয়মের অধীন? কেন এরা উদিত হয় এবং অস্ত যায়? কেন এরা সব সময় একইভাবে উজ্জ্বল এবং দীপ্তিমান থাকে না? নক্ষত্র যদি খোদা হয় তাহলে চাঁদ কেন তাকে আলোহীন করে দেয়? আবার চাঁদ যদি খোদা হবে তাহলে সূর্য তাকে আলোহীন কি করে দেয়?

সুতরাং আমার জাতি, আমার কথা শোন! এসব নক্ষত্র এবং চন্দ্র সূর্যকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনিই হলেন মাবুদ। আর তোমরা যাদের পূজা করছো, এরা ঐ আল্লাহর অধিন। আমি তোমাদের এসব মাবুদকে পছন্দ করিনা। আমি তোমাদের এই পূজ্যদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঐ আল্লাহর দিকে মুখ করেছি। আমি সেই আল্লাহকে আমার মনিব এবং রব হিসেবে গ্রহণ যিনি গোটা জাহানের রব্ব এবং ইলাহ। আর এ কথা তোমরা জেনে রেখো যে, আমি তোমাদের সাথে নেই এবং তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করি।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের কথা শুনে তাঁর জাতি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। তারা দেখলো, ইবরাহীম তাদের সমস্ত যুক্তি অকেজো করে দিয়েছে।

ইবরাহীমকে তারা বুঝাবে, এমন যুক্তি আর তাদের কাছে নেই। তারা যে প্রমাণ পেশ করতো, সমস্ত প্রমাণ ইবরাহীম ব্যর্থ করে দিয়েছে। যুক্তির মোকাবেলায় যুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়ে তারা এবার ভিন্ন পথ অবলম্বন করলো।

গোটা পৃথিবীতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অজ্ঞ এবং সত্যের প্রতি বিদ্বেষী মানুষগুলো এমনই করে আসছে। তাদের যুক্তি যখন ফুরিয়ে যায়, তখন তারা ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি করে এবং সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করে। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে তখন তারা নানা ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে থাকলো। তারা বললো, আমাদের মাবুদকে তুমি অবজ্ঞা করেছো, অবহেলা করছো, তাদের নিন্দা করছো, এরা তোমার ওপরে কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। তুমি আমাদের মাবুদকে যে অপমান করেছো, এর জন্য তোমাকে অবশ্যই কঠিন দন্ড ভোগ করতে হবে।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম তাঁর জাতিকে বললেন, তোমরা আমাকে মূর্তির ভয় দেখাচ্ছো এবং আমার সাথে অযথা ঝগড়া করছো। কিন্তু আমার আল্লাহ আমাকে সত্য সহজ সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমাদের সমস্ত কিছুই ভুল এবং তোমাদের কাছে একমাত্র পথ ভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমি তোমাদের এইসব মূর্তির কোন পরোওয়া করি না, আমার আল্লাহ্ যা চাইবেন তাই হবে। আল্লাহর মর্জির বিপরীত কিছুই হবে না। তোমাদের মূর্তিগুলো আমার কোন লাভ বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। এতসব দেখে শুনে তোমাদের মাথায় কি কিছুই প্রবেশ করে না? তোমরা এসব মূর্তিগুলোকে যে আল্লাহর সাথে শরিক করো, এ ব্যাপারে তোমাদের কোন ভয় করে না? অথচ এসব মূর্তি যে আল্লাহর শরিক, এ সম্পর্কে তোমরা কোন প্রমাণও পেশ করতে পারছো না।

আমি এক আল্লাহর দাসত্ব করি, আমি কেবল মাত্র তাঁকেই ভয় করি। এবং বিশ্বাস করি, তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে অপমানিত করতে পারেন এবং সম্মানিত করতে পারেন। সুতরাং তোমরা কি করে আমার কাছ থেকে আশা করো যে, আমি তোমাদের এইসব মূর্তিকে ভয় করবো? আপসোস! তোমরা যদি বুঝতে, কে আমাদের ভেতরে সংঘাত এবং বিরোধ সৃষ্টি করছে আর কে এসব সংঘাতের অবসান কামনা করছে। কে তোমাদেরকে সংশোধন করে সত্য পথে ফিরিয়ে আনতে চাইছে, এ কথা যদি তোমরা বুঝতে!

একটা কথা মনে রেখো, সহজ সরল পথ এবং নির্ভুল জীবন বিধান এবং নিরাপত্তার জীবন সেই ব্যক্তিই লাভ করেছে যে ব্যক্তি এক আল্লাহর দাসত্ব করার শপথ

করেছে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। যে ব্যক্তি শিরক থেকে মুক্ত হয়ে সৎ পথ অবলম্বন করেছে। শিরক হতে যারা পবিত্র তারাই কেবল সফল হতে পারবে। সুতরাং এখনো সময় আছে তোমরা বুঝার চেষ্টা করো যে, তোমরা যাদের দাসত্ব করছো, তারা প্রকৃত পক্ষে মহান আল্লাহর গোলাম। অতএব গোলামের গোলামী না করে প্রকৃত মনিবের গোলামী করো।

মাছিকে এরা তাড়াতে পারে না

তারা যখন কোন ধরনের যুক্তি পেশ করতে ব্যর্থ হলো এবং ভ্রান্ত পথ হতে বিরত হলো না, তখন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম তাদের বাতিল ইলাহদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তিনি স্পষ্ট বললেন–

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ–

আর আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের অনুপস্থিতির সময়ে অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলোর প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। (সূরা আম্বিয়া- ৫৭)

অর্থাৎ তাঁর জাতি যে একটা মহাভ্রমে নিমজ্জিত হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম তা এবার স্পষ্ট করে দিলেন। তাদের সামনে বিরাট এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। এই কথা তিনি তখনই বললেন, যখন তাঁর জাতি কোন ধরনের যুক্তি গ্রহণ করতে রাজী হলো না। সর্বশেষ কথা বা চ্যালেঞ্জ দিয়েও যদি তাদেরকে ভুল পথ হতে ফিরানো যায়, এটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি মূর্তি পূজকদের মনে পূর্ণশক্তি দিয়ে এই কথাই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন যে, এসব মূর্তি কোন কল্যাণ করতে পারে না। কোন ক্ষতিও করতে পারে না।

তোমরাদের গণক এবং জোতিষীগণ, তোমাদের নেতৃবৃন্দ এসব মূর্তিদের সম্পর্কে তোমাদের মনে একটা অমূলক ভয় সৃষ্টি করেছে যে, যদি তোমরা এসব মাবুদকে পূজা না করো, এদেরকে ভক্তি না করো, এদের সামনে মাথানত না করো তাহলো এরা তোমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি হবে। আসলে এ সমস্ত কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আসলে এসব তথাকথিত মাবুদের এমন ক্ষমতা নেই যে, এদের শরীরে একটা মাছি পড়লে সে মাছিকে এরা তাড়াতে পারে না। এরা নিজেদেরকে নিজেরা রক্ষা করতে পারে না। তাহলে এরা তোমাদেরকে কি করে রক্ষা করবে? এদেরকে তোমরা যেমন ভাবে নির্মাণ করো, তেমনভাবেই এরা

নির্মিত হয়। হাতের স্থানে আর পায়ের স্থানে হাত লাগিয়ে দিলেও এরা অভিযোগ করবে না যে, কেন এমন করা হলো। সুতরাং এদের সম্পর্কে তোমাদের ভয় একান্তই অমূলক।

এত কথার পরেও সে জাতির মাথায় প্রকৃত সত্য প্রবেশ করলো না। বরং তারা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দিল যে, সে যেন তাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে আর কোন কথা না বলে। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এবার চিন্তা করলেন, তাকে এবার এমন এক পথ অবলম্বন করতে হবে, যেন এদের সামনে চরম সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, এসব ভিত্তিহীন মাবুদের নিজেদেরকে রক্ষা করার কোনই শক্তি নেই। গোটা জাতি যেন দেখতে পায়, এতদিন তারা এবং তাদের বাপ-দাদারা যাদের পূজা অর্চনা করে এসেছে, তারা ছিল সম্পূর্ণ শক্তিহীন। তাদের যাবতীয় পূজা অর্চনা সবকিছুই বৃথা গিয়েছে।

জাতি যেন বুঝে, আমাদের দেবতা শুধু কাঠ আর পাথরের নিষ্প্রাণ মূর্তি মাত্র। এরা বোবা, বধির, অন্ধ, এদের সামান্য পরিমাণ ক্ষমতা নেই। জাতি যেন অনুভব করতে পারে, আমাদের নেতারা এতদিন এদের সম্পর্কে যা বলেছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা। আর আল্লাহর নবী ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যা বলছেন, তাই কেবল সত্য।

এসব কথা চিন্তা করে আল্লাহর নবী একটা বিশেষ পন্থা উদ্ভাবন করলেন। তিনি তাঁর বর্তমান কর্ম পদ্ধতি স্থির করে তা বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রইলেন। তিনি যদিও তার পরিকল্পনার কথা কোন মানুষের কাছে প্রকাশ করলেন না, কিন্তু তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করলেন যে, আর আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের অনুপস্থিতির সময়ে অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলোর প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। এই কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, যদি তোমাদের দেবতাদের মধ্যে কোন ক্ষমতা থাকে যেমন তোমরা দাবী করে থাকো, তবে তারা যেন আমাকে প্রতিরোধ করে, আমার প্রচেষ্টা যেন বন্ধ করে দেয়, আমাকে যেন অক্ষম করে দেয়। আমার সমস্ত কৌশল যেন ব্যর্থ করে দেয়। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর জাতি জানতে পারেনি, এই মানুষটা কি করতে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে তাদের তো কোন ধারণাই ছিল না এবং তারা তা কল্পনাও করতে পারেনি যে, এই কাজ কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব। আল্লাহর নবী যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তা বাস্তবায়ন করার এক বিরাট সুযোগ এসে গেল।

মূর্তিগুলোর করুণ অবস্থা

সে জাতি প্রতি বছরে একটা বিশাল মেলায় যোগ দিত। সবাই সে মেলায় যোগ দিতে গেল। তাদের মন্দিরে দেবতাদেরকে প্রহরা দেবার জন্য কেউ থাকলো না। প্রহরার প্রয়োজনও তারা কোন অনুভব করেনি। কারণ তাদের ধারণা হলো, দেবতা তাদেরকে রক্ষা করে, এই দেবতা মহাশক্তিশালী। সুতরাং দেবতার কোন ক্ষতি করতে পারে, এ কথা তারা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। এ কারণেই তারা মন্দির অরক্ষিত রেখে মেলায় গিয়েছিল। তারা মেলায় যাবার সময় হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে ও তাদের সাথে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ জানালো। তিনি যেতে অস্বীকার করলেন। এরপর মূর্তিপজারীরা মেলায় চলে গেল। এই মেলায় দেশের সব শ্রেণীর মানুষ যোগ দিত। দেশের শাসক হতে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত মেলায় গিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গেল।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এই সুয়োগে প্রস্তুতি গ্রহণ করে বের হলেন। তিনি ভাবলেন, এবার তাঁর জাতির কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে, তারা এতকাল যাদের পূজা করে এসেছে, তারা কত দূর্বল। তিনি সে সময়ের সবচেয়ে বড় দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলেন, নানা ধরনের ফল, মিষ্টিসহ অন্যান্য জিনিষ দেবতার সামনে থরে থারে সাজানো রয়েছে। তিনি বিদ্রুপের স্বরে বললেন, এত খাদ্য তোমাদের সামনে তোমরা খাচ্ছো না কেন? আমি কথা বলছি, তোমরা উত্তর দিচ্ছো না কেন? এরপর সমস্ত মূর্তিকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন। তারপর হাতের অস্ত্রটি সবচেয়ে বড় মূর্তির কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে রেখে তিনি মন্দির হতে বের হয়ে গেলেন। এই ঘটনাটি পবিত্র কোরআন এভাবে পেশ করেছে–

فَرَاغَ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلاَ تَاْكُلُوْنَ-مَالَكُمْ لاَتَنْطِقُوْنَ

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ-

তারপর নিঃশব্দে অগ্রসর হয়ে তাদের মূর্তিসমূহের মন্দিরে প্রবেশ করলো এবং তাদের মূর্তিসমূহকে বললো, তোমরা খাচ্ছো না কেন? তোমাদের কি হলো, কথা বলছো না কেন? তারপর নিজের ডান হাত দিয়ে সমস্ত মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেললেন। (সূরা সাফ্ফাত-৯১-৯৩)

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সমস্ত মূর্তি ভাঙ্গতে পারতেন কিন্তু তা তিনি করেননি। কারণ তাঁর জাতি বিশ্বাস করতো যে, এরা অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন। এ করণে বড় মূর্তিটি তিনি রেখে দিলেন। তাঁর জাতির লোকজন যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে তখন তিনি পাল্টা তাদেরকেই বলবেন, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছো, তোমরা এতদিন যাদেরকে মহাশক্তিশালী মনে করে আসছো, তাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো না কেন? মাটির মূর্তি যে অর্থহীন এ কথা আবারও তাঁর জাতিকে বুঝানোর জন্যই তিনি বড় মূর্তিটিকে রেখে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ণনা করেছে–

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلاَّ كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ-قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا-اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ-

তারপর তিনি তাদেরকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেললেন। কিন্তু তাদের বড় দেবতাটিকে ত্যাগ করলেন, যেন তাঁর জাতির লোকজন তার দিকে ফিরে আসতে পারে। (তারা এসে মূর্তিগুলোর এই অবস্থা দেখে) বলতে লাগলো, আমাদের ইলাহদের এই অবস্থা করলো কে, বড়ই জালিম সে। (সূরা আম্বিয়া-৫৮-৫৯)

লোকজন মেলা থেকে ফিরে এসে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে প্রিয় দেবতাদের এই করুণ অবস্থা দেখে প্রথমে তাদের চেতনা শক্তি কিছুক্ষণের জন্য যেন লোপ পেয়েছিল। তারা নির্বাক দৃষ্টিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ভূমিস্মাৎ দেবতাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। চেতনা ফিরে পেতেই তারা আর্তনাদ করে উঠলো, তাদের দেবতাদের এই সর্বনাশ কে করলো? কিন্তু এই হতভাগা জাতির মনে এই ধারণা তখন পর্যন্ত এলো না যে, দেবতারা যদি মহাশক্তিশালীই হবে, তাহলে তাদের কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। এখন দেবতারা যখন কারো আঘাতে মুখ থুবড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, তাহলে বুঝা গেল এই দেবতাদের কোন শক্তিই নেই। এতকাল তারা যে পূজা করেছে, তা সবই ব্যর্থ হয়েছে। এই কথা হতভাগা জাতির মনে উদয় হলো না।

এই লোকগুলোর ভেতরে ঐ লোকটিও ছিল, যে লোকটির সামনে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, আর আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের অনুপস্থিতির সময়ে অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলোর প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। সেই লোকটি চিৎকার করে বলে উঠলো, এই কাজ ইবরাহীমের। সে একদিন বলেছিল, আর আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের অনুপস্থিতির সময়ে অবশ্যই

তোমাদের মূর্তিগুলোর প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। সে আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে নিন্দা করে। এই কাজ ইবরাহীম ব্যতীত আর কেউ করতে পারে না। সেই আমাদের দেবতাদের চরম শত্রু। পবিত্র কোরআনের সূরা আম্বিয়ার ৬০ নং আয়াতে এই মূর্তি ভাঙ্গার পরের বিষয়টি এভাবে পরিবেশন করা হয়েছে–

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗۤ اِبْرٰهِيْمُ–

তাদের ভেতরে একজন বললো, আমি একজন যুবককে এই মূর্তিদের বিরুদ্ধে নিন্দা করতে শুনেছি। তাকে ইবরাহীম বলা হয়। এই কাজ অবশ্যই তার।

জাতিয় নেতৃবৃন্দ এবং পূজারীগণ এ কথা শুনে ক্ষোভে দুঃখে এবং রাগে তাদের চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। তারা ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে ঘোষনা করলো, সেই ইবরাহীমকে এখানে নিয়ে আসা হোক, জাতি দেখুক এবং চিনে রাখুক যে, প্রকৃত অপরাধী কে?

তাদেরকেই প্রশ্ন করে দেখো

তৎকালিন ধর্মীয় নেতা এবং সমাজের নেতাদের নির্দেশে আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঘটনা স্থলে নিয়ে আসা হলো। আল্লাহর নবীর দিকে রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করে রক্ত শীতল করার মত কণ্ঠে নেতারা প্রশ্ন করলো, ইবরাহীম! আমাদের দেবতাদের সাথে এই ধরনের ব্যবহার তুমি কেন করলে? এই প্রশ্ন সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে–

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰۤى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ قَالُوْۤا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰۤاِبْرٰهِيْمُ–

তারা বললো, তাহলে তাকে ধরে নিয়ে এসো সবার সামনে, যেন মানুষ দেখতে পায় তাকে কি ধরনের শাস্তি দেয়া হয়। ইবরাহীমকে নিয়ে আসার পরে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে ইবরাহীম! তুমি আমাদের ইলাহদের সাথে এ ধরনের ব্যবহার করলে কেন? (সূরা আম্বিয়া-৬১-৬২)

জাতিকে মূর্তি পূজার বিভ্রান্তি থেকে ফিরানোর এবং তাদের সামনে মূর্তির অসরতা প্রকাশ ও চরম সত্য প্রকাশ করার আরেকটি সুযোগ আল্লাহর নবীর সামনে এসে উপস্থিত হলো। ইতিপূর্বে এত লোক একসাথে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম একত্রে পাননি যে, তাদের সামনে সত্য প্রকাশ করবেন। আজ বহু মানুষ এক স্থানে

এই মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা উপলক্ষে একত্রিত হয়েছে। এদের সবার সামনে তিনি সত্য প্রকাশ করবেন। বিরাট জনসমাবেশ বিদ্যমান। সাধারণ মানুষ দেখছে যে, তাদের দেবতাদের কি করুণ অবস্থা ঘটেছে অথচ তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। যেসব জাতিয় নেতা এবং পূজারীরা এসব মূর্তি সম্পর্কে গোটা জাতিকে অমূলক ভিত্তিহীন কথা বলে মগ্ন করে রেখেছে, তাদের গোমর ফাঁস করে দেবার এটাই উপযুক্ত সময়। যাতে সাধারণ জনগণ অনুধাবন করতে পারে যে, এতদিন এই নেতারা আর পূজাড়ীরা যা বলেছে, তা সবই মিথ্যা, ধোকা আর প্রতারণা ছাড়া কিছুই ছিল না।

সুতরাং এই পূজারীদেরকে আর পথভ্রষ্ট নেতাদেরকে জাতির সামনে লজ্জিত করতে হলে এখন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তাহলে তাঁর জাতি সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। জিজ্ঞাবাদের উত্তরে গোটা জাতির সামনে নেতাদেরকে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম স্পষ্ট কণ্ঠে যা বলেছিলেন, এ সম্পর্কে কোরআন বলছে–

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ-كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ-

ইবরাহীম বললেন, বরং এদের ভেতর থেকে এই কাজ ঐ বড় মূর্তিটি করেছে। সুতরাং তোমাদের এই দেবতার যদি কথা বলার শক্তি থাকে তাহলে তাদেরকেই প্রশ্ন করে দেখো। (সূরা আম্বিয়া-৬৩)

পবিত্র কোরআনের আয়াতের শব্দ হতে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে যে, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এই কথাগুলো এ কারণেই বলেছিলেন যে, যেন তারা এই উত্তরে নিজেরাই গোটা জাতির সামনে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, তাদের ইলাহ্ সম্পূর্ণ শক্তিহীন, তাদের কাছ থেকে কোন কিছুই আশা করা যেতে পারে না। এ ধরনের ক্ষেত্রে যুক্তির খাতিরে যদি কোন মানুষ প্রকৃত ঘটনার খেলাফ কোন কথা বলেন তবে সে কথাকে মিথ্যা বলা যেতে পারে না। কারণ সে ব্যক্তি মিথ্যা বলার মন-মানসিকতা নিয়ে, মিথ্যা বলার ইচ্ছা বা সংকল্প নিয়ে এ ধরনের কথা বলেন না। বরং যাকে বা যাদেরকে সম্বোধন করে এ কথা বলা হয় সেও-এ কথাকে মিথ্যা বলে মনে করে না। যিনি বলেন তিনি নিজের বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতেই বলেন এবং যিনি শুনেন তিনিও তা সেই অর্থেই গ্রহণ করেন। সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম কোন মিথ্যা কথা বলেননি।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে তাঁর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা জাতির সামনে নেতৃবৃন্দ লজ্জায় অপমানে মাথানত করতে বাধ্য হলো। আল্লাহর নবী যে কথা বলেছেন, সে কথার কি উত্তর দেবে তারা? উত্তর দেবার মত কোন কথা বা যুক্তি তাদের ভান্ডারে ছিল না। গোটা জাতির সামনে মাথানত করে তারা ভাবছিল, এবার তারা এই লজ্জার হাত থেকে রেহায় পাবার জন্য কোন পথ অবলম্বন করবে।

সাধারণ মানুষের কাছে আজ বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেল। যে দৃশ্য আজ সাধারণ মানুষ দেখলো, এই দৃশ্য দেখার জন্য তারা মুহূর্তের জন্যও প্রস্তুত ছিল না। কোনদিন যে এমন দৃশ্য দেখবে তা তারা কল্পনাও করেনি। জাতি অনুভব করলো এবং সবাই নিজের বিবেকের কাছে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলো যে, ইবরাহীম সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং প্রকৃত অপরাধী আমরা স্বয়ং। কারণ আমরা এমন সব মাবুদকে স্রষ্টা জ্ঞানে এতদিন ধরে পূজা করে আসছি, যেগুলোর মাবুদ হবার ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন প্রমাণই নেই।

তারা তো প্রাণহীন মূর্তি মাত্র

কিন্তু প্রকাশ্যে জাতির সামনে এই কথাগুলোর স্বীকৃতি দিলে, নেতাদের নেতৃত্ব থাকে না, এতকাল তারা গোটা জাতিকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে রেখে তাদেরকে শোষণ করেছে। সত্যের প্রতি স্বীকৃতি দিলে এই শোষণ আর চলবে না। এ কারণে তারা আল্লাহর নবীকে বললো, ইবরাহীম! তুমি তো জানো, আমাদের এই দেবতাদের মধ্যে কোন বাকশক্তি নেই। তারা তো প্রাণহীন মাটির মূর্তি মাত্র। এই ঘটনাটি পবিত্র কোরআন এভাবে বর্ণনা করেছে–

فَرَجَعُوْا اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ–ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ–

এরপর তারা নিজেদের অন্তরে চিন্তা করলো এবং বলতে লাগলো, অবশ্যই তোমরাই (অর্থাৎ আমরাই) অন্যায়কারী। তারপর (লজ্জায়) নিজেদের মাথানত করে বলতে লাগলো, হে ইবরাহীম! তুমি তো ভালো করেই জানো যে, এই দেবতাদের কোন বাক শক্তি নেই। (সূরা আম্বিয়া-৬৪-৬৫)

আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে মূর্তিগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিলেন, তাঁর সে পবিত্র উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল। তাঁর প্রতিপক্ষ প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলো যে, আমাদের দেবতাদের কথা বলার কোনশক্তি নেই। এরা আমাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করা তো দূরের কথা, এরা নিজেদেরকেই রক্ষা করতে সক্ষম নয়।

ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এবার সুযোগ বুঝে প্রকাশ্য জনসমাবেশে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করতে থাকলেন। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের এই দেবতারা কোন কথা বলতে পারেনা, কোন শক্তি এদের নেই, এরা নিজেকেই রক্ষা করতে পারে না। তাহলে এরা ইলাহ বা রব হয় কি করে? এই সাধারণ বিষয়টি কি তোমরা বুঝতে পারো না? তোমাদের সাধারণ জ্ঞান কি নেই? তোমরা তোমাদের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধিকে কাজে প্রয়োগ করছো না কেন? বিষয়টি কোরআন এভাবে বর্ণনা করেছে–

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْـًا وَّلاَ يَضُرُّكُمْ-اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ-

ইবরাহীম বললো, তাহলে তোমরা কি আল্লাহকে ত্যাগ করে সেই সব জিনিষের পূজা করো, যারা তোমাদের না কোন উপকার করতে পারে, আর না কোন ক্ষতি? আফসোস তোমাদের জন্য আর তোমাদের এই বাতিল মাবুদগুলোর জন্য আল্লাহকে ত্যাগ করে তোমরা যাদের পূজা করছো। তোমাদের কি কোন জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি নেই? (সূরা আম্বিয়া-৬৬-৬৭)

আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের কথা শুনে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের উচিত ছিল, মিথ্যা পথ ত্যাগ করে সত্য পথে ফিরে আসা। নিজেদের বাতিল এবং ভ্রান্ত মতবাদ মতাদর্শ ত্যাগ করে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান গ্রহণ করা। কিন্তু হতভাগা নেতারা আর তাদের অন্ধ অনুসারীগণ চির অন্ধই রয়ে গেল। নিজেদেরকে এরা জাহান্নামের ইন্ধন হিসাবেই গড়তে থাকলো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী তারা যে, পাপের প্লাবনে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিয়েছিল, এভাবে তারা ভেসেই চললো।

তাদের মন-মানসিকতা এমনভাবে নেতারা তৈরী করেছিল যে, সত্য গ্রহণ করার মত মনের পরিচ্ছন্নতা তাদের ছিল না। তাদের কাছে তাদের নেতাই ছিল একমাত্র সত্য আর মিথ্যার মানদন্ড। নেতাকে বাদ দিয়ে তারা অন্য কিছু চিন্তা করতে

পারতো না। নেতা মিথ্যা বলছেন কি সত্য বলছেন, নেতা তাদেরকে ভুল পথে না সত্য পথে নিয়ে যাচ্ছে, এসব দিক তারা বিচার করে দেখতো না। এই ধরনের মূর্খ এবং আহম্মকের সংখ্যা বর্তমানে মনে হয় সবচেয়ে অধিক। এরাই শ্লোগান উঠায়, অমুক নেতা যেখানে আমরাও সেখানে। এরা এমনই অন্ধ যে, এটাও এরা বিচার করতে পারে না, নেতা তো কোন পরিশ্রম করে না, তাহলে নেতার এত টাকা আসে কোত্থেকে? নেতা এমন আরামে থাকে কিভাবে? নেতার এমন নাদুস নুদুস স্বাস্থ্য হয় কি করে?

অন্ধ অনুসারীগণ এসব কথা চিন্তা করে দেখেনা। তারা চোখ থাকতেও অন্ধের মতই চলে। এরপর বাতিল নেতারা ঘোষনা করলো, ইবরাহীমের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, ইবরাহীমকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। হতভাগা মূর্খের দলেরা, চিৎকার করে নেতাদের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানালো। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, আল্লাহর নবী, মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে তারা পুড়িয়ে হত্যা করবে। যেন পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে যায়।

সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় করো

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে গ্রেফতার করে রাষ্ট্র-শাসক নমরূদের দরবারে নিয়ে আসা হলো। নমরূদের সাথে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের তর্ক-বিতর্ক সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ-اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ-قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ-قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ-وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ-

তুমি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করোনি, যে ব্যক্তি ইবরাহীমের সাথে তর্ক করেছিল? তর্ক হয়েছিল এই কথা নিয়ে যে, ইবরাহীমের রব কে? এবং তা হয়েছিল

এ জন্য যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বললো, আমার রব তিনি, জীবন ও মৃত্যু যার ইখতিয়ার ভুক্ত। তখন সে উত্তর দিল, জীবন ও মৃত্যু তো আমার ইখতিয়ারে রয়েছে। ইবরাহীম বললো, তাই যদি সত্য হয় তাহলে আল্লাহ তো সূর্য পূর্ব দিক হতে উদয় করেন, তুমি একবার তা পশ্চিম দিক হতে উদয় করে দেখাও। এই কথা শুনে সত্যের শত্রু নিরুত্তর ও বিমূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ জালিমকে কখনো পথ দেখান না। (সূরা বাকারাহ্-২৫৮)

এই আয়াতে 'সেই ব্যক্তি' বলতে নমরুদকে বুঝানো হয়েছে। এই লোকছিল সে সময়ে ইরাকের শাসক। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম যখন মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তিগুলোর দফরফা করেছিলেন, তখন তাঁর পিতা স্বয়ং গিয়ে শাসকের দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের সাথে শাসকের তর্ক হয়েছিল এবং তার সাথে আল্লাহর নবীর বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে রব্ব হিসেবে কাকে গ্রহণ করেছে? এই বিরোধ এ কারণে সৃষ্টি হয়েছিল যে, নমরুদকে আল্লাহ রাষ্ট্রশক্তি দান করেছিলেন। এই কথাটা অনুধাবন করতে হলে কয়েকটি নিগূঢ় সত্যকে সামনে রাখতে হবে।

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমগ্র মুশরিক সমাজেরই এই অভিন্ন বৈশিষ্ট রয়েছে যে, তারা আল্লাহকে 'সমস্ত খোদার খোদা, পরম পুরুষ' ইত্যাদী রূপে তো মেনে নিতই, কিন্তু কেবল তাঁকেই একমাত্র রব এবং ইলাহ ও মাবুদ রূপে গ্রহণ করতো না। আল্লাহর ক্ষমতাকে প্রাচীনতম কাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমস্ত মুশরিক সব সময় দুই ভাগে বিবক্ত করে রেখেছে। একভাগ হচ্ছে অতি প্রাকৃতিক খোদায়ী, কার্যকারণ ধারার ওপর যার কর্তৃত্ব চলে এবং মানুষ নিজের বিপদে আপদে যার সাহায্য কামনা করে। এই খোদায়ীর ব্যাপারে তারা আল্লাহর সাথে কামেল বুযর্গ লোকদের আত্মা, তাদের কবর, তথা মাজার, আস্তানা, ফেরেশতা, জ্বিন, নানা ধরনের গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র এই ধরনের আরো নানা শক্তিকে আল্লাহর অংশীদার, আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী বলে মনে করে। মুশরিকগণ এদের কাছে প্রার্থনাও করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব কল্পিত শক্তির মূর্তি নির্মাণ করে তাদের পূজা অর্চনা করে। মাজারে মানত মানে, খানকায় মানত মানে, ব্যক্তি বিশেষের দরবারে ভেট-বেগাড় দান করে।

দ্বিতীয় প্রকার খোদায়ী হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের খোদায়ী বা প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব, যার শক্তিতে নেতা গোছের মানুষ সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনের জন্য আইন-বিধান রচনার ক্ষমতাশালী ও আনুগত্য লাভের অধিকারী হয় এবং যাবতীয় বৈষয়িক ব্যাপারে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকার লাভ করে। এই দ্বিতীয় প্রকারের খোদায়ী পৃথিবীর সমস্ত মুশরিক ও অধিকাংশ রাজনৈতিক, সামাজিক নেতা, দেশের নেতা প্রায় সবযুগেই আল্লাহর কাছ হতে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং রাজবংশের রাজ-রাজারা, বাদশাহ, শাসক, বিচারক, এক শ্রেণীর ধর্মীয় নেতা, এক শ্রেণীর পীর, পুরোহিত এবং সমাজের পূর্ব ও পরবর্তীকালের সব বড় লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে। প্রায় প্রতিটি রাজপরিবারই এবং শাসকই এই দ্বিতীয় অর্থে খোদায়ী ক্ষমতার দাবীদার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই দাবীকে দৃঢ়তর করার জন্য তারা সাধারণত অমুক পীরের সন্তান, অমুক দেবতার আশীর্বাদ প্রাপ্ত, অমুক নেতার সন্তান তথা প্রথমার্থের খোদাদের সন্তান ও বংশোদ্ভূত হবার দাবি করেছে। আর এক শ্রেণীর ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, পীর পুরোহিতগণ এই ষড়যন্ত্রে সব সময় তাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছে।

কোরআন হাদীস ও ইতিহাস সাক্ষী দেয়, নমরুদের খোদায়ী দাবি ছিল এই দ্বিতীয় পর্যায়ের। সে আল্লাহর অস্তিত্ব ও উপস্থিতিকে অস্বীকার করতো না। তার এই দাবি ছিল না যে, সে-ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কর্তা, ব্যবস্থাপক ও পরিচালক। সে এই কথা বলতো না যে, বিশ্বের কার্যকারণ ধারার সমগ্র সূত্রে ওপর তারই কর্তৃত্ব চলছে। বরং তার দাবি ছিল এই যে, গোটা ইরাক রাজ্য ও তার অধিবাসীদের নিরঙ্কুশ শাসক সে, তারই মুখের কথা তার দেশবাসীর জন্য আইন। তার ওপর এমন কোন উচ্চতর শক্তিমান সত্তা বর্তমান নেই, যার সামনে তাকে জওয়াবদিহি করতে হতে পারে। সুতরাং তার শাসনাধীন এলাকার সমস্ত মানুষ তাকে রব হিসেবে গ্রহণ করবে এবং অনুসরণ করবে, তাকে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি অন্য কোন শক্তিকে রব বা ইলাহ মানবে, সে হলো বিদ্রোহী এবং জাতিয় গাদ্দার।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম তাঁর অন্তরের বিশ্বাস এবং সিদ্ধান্ত নমরুদকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি শুধু মাত্র রাব্বুল আলামীন–বিশ্ব প্রতিপালককেই আমার খোদা, রব, ইলাহ ও মাবুদ হিসেবে মানি। এবং তাঁকে ব্যতীত অন্যসব রব, ইলাহ ও মাবুদকে অস্বীকার করি অমান্য করি। ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এই কথা বললেন, তখন জাতিয় ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস,

উপাস্যদের সম্পর্কে তাঁর এই ঘোষনা কতটুকু সহ্য করা যেতে পারে অথবা পারে না-কেবলমাত্র এই প্রশ্ন দেখা দিল না, বরং তখন এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল যে, জাতিয় রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতার ওপর এই ঘোষনার যে আঘাত পড়ে, এর প্রতি কিভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করা যেতে পারে? ঠিক এই কারণেই হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে রাষ্ট্রদোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত করা হলো এবং গ্রেফতার করে তাকে নমরুদের রাজদরবারে উপস্থিত করা হয়েছিল।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সর্বপ্রথম নিজের পিতাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তারপর তিনি সাধারণ মানুষের সমাবেশে আল্লাহর প্রতি ফিরে আসার আহ্বান জানালেন। নানা ধরনের প্রমাণ দিলেন। মূর্তির অসরতা প্রমাণ করে দেখালেন। সমস্ত দলীল প্রমাণের সাহায্যে মহাসত্যকে তাদের সামনে পেশ করলেন। অবশেষে তাকে গ্রেফতার হয়ে শাসকের দরবারে নেয়া হলো।

সেখানেও তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে সত্য প্রকাশ করলেন। শাসক নমরুদের দাবীকে তিনি মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেন। তাঁর প্রমাণ যুক্তির সামনে গোটা জাতি, শাসকবৃন্দ নিরুত্তর থাকতে বাধ্য হলো। তবুও তারা সত্য গ্রহণ করলো তো না-ই, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, সত্যের বাহক ইবরাহীমকেই পৃথিবী হতে সরিয়ে দিতে হবে। এ কারণে তারা এমন ভয়ংকর শাস্তি দেয়ার পরিকল্পনা করলো যে, ইবরাহীমের মত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি যেন, এই ধরনের দাবী আর করতে না পারে।

নমরুদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা করছো কেন এবং আমাকেই বা রব বলে গ্রহণ করছো না কেন?. হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম জবাব দিলেন, আমি একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করি এবং তাঁকে ব্যতীত আর কাউকে রব হিসেবে স্বীকৃতি দেই না। আমি তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করি না। এই পৃথিবী এবং এর ভেতরে ও বাইরে যা কিছু আছে, এ সমস্ত তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত কিছুর প্রতিপালক তিনিই। একমাত্র তিনিই স্রষ্টা এবং তিনিই সমস্ত কিছুর মালিক।

তিনিই আমাকে-তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদের রব বা ইলাহ। তিনিই একমাত্র বিধানদাতা ও আইনদাতা। আমার মতই তুমি একজন মানুষ মাত্র। তোমাকে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং রব এবং ইলাহ তিনি। তুমি একজন মানুষ হয়ে নিজেকে কি করে রব বা ইলাহ হবার দাবী করতে পারো? আর

কি করেই বা এই সমস্ত মাটির ও পাথরের মূর্তিসমূহ রব বা ইলাহ্ হতে পারে? মহান আল্লাহর যে মর্যাদা ও সম্মান, সে সম্মান ও মর্যাদা তুমি বা তোমাদের হাতে নির্মিত পাথরের ও মাটির মূর্তি কি করে পেতে পারে?

তোমরা যা করছো তা সম্পূর্ণ ভুল এবং মারাত্মক পাপের কাজ। আমি আল্লাহর অনুগ্রহে সঠিক পথে আছি। আমি আল্লাহর পক্ষ হতে যে সত্য লাভ করেছি, আমি আমার দেশের মানুষকে এবং তোমাকেও সেই সত্যই গ্রহণ করার জন্য আবেদন করছি। তোমরা এই সত্য গ্রহণ করে সত্যের পথে মুক্তির পথে কল্যাণের পথে চলে এসো। তোমরা যে নিজেদের বানানো এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষের প্রথা অনুসরণ করছো, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে মহাসত্য লাভ করার পরে কি করে তোমাদের ঐ ভুল পথ অুনরসণ করতে পারি ?

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম নির্ভীক কণ্ঠে মহাসত্য উচ্চারণ করলেন এমন এক ব্যক্তির সামনে, যার সামনে কথা বলতে হলে মাথানত করে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে অনুচ্চ আওয়াজে কথা বলতে হতো। আল্লাহর নবীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও সাহস দেখে নমরুদ হতভম্ব হয়ে গেল। সে ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বললো, তুমি যাকে ইলাহ এবং রব্ব বলে স্বীকার করছো, তাঁর এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট বর্ণনা করতো, যে গুণ ও বৈশিষ্ট আমার ভেতরে অনুপস্থিত রয়েছে ?

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম জবাব দিলেন, আমার রব তো তিনিই যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তাঁরই হাতে জীবন ও মৃত্যুর বাগডোর নিবদ্ধ। হতভাগা নমরুদ আল্লাহর নবীর কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলো না। নির্বোধের মতই সে বললো, আমিও তো জীবন ও মৃত্যুর মালিক। এ দুটো জিনিষ আমিও দান করতে পারি।

এই হতভাগা তার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তৎক্ষণাত একজন নির্দোষ মানুষকে এনে জল্লাদকে আদেশ করলো, এই মুহূর্তে একে হত্যা করা হোক। তারপর কারাগারে আবদ্ধ একজন মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীকে তৎক্ষণাত মুক্ত করে দিয়ে বললো, দেখলে ইবরাহীম! জীবন ও মৃত্যুর অধিকারী আমি। এই দুটো জিনিষ আম্যর নিয়ন্ত্রণাধীন। আমি একজনকে মৃত্যুদান করলাম আর একজনকে জীবন দান করলাম। সুতরাং তোমার রব্ব বা ইলাহ যে ক্ষমতার অধিকারী, আমিও ঐ একই ক্ষমতার অধিকারী। আমিই রব, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ রব আর নেই।

মাথা মোটা শাসক

ওহী জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম উপলব্ধি করলেন, মাথা মোটা শাসক নমরুদের মাথায় এই সহজ জিনিষ প্রবেশ করেনি। অথবা এই পাষন্ড এমন এক কৌশল অবলম্বন করলো যে, তার জাতি যেন প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে না পারে। তারা যেন এই পার্থক্যটুকু বুঝতে না পারে যে, মৃত্যুদন্ডের আসামীকে মুক্ত করে দেবার নাম জীবন দান করা নয় আর কাউকে হত্যা করার নামও মৃত্যুদান করা নয়। বরং যার কোন অস্তিত্বই ছিল না, তাকে অস্তিত্ব দান করার নামই হলো জীবন দান করা, আর কারো দেহ থেকে আত্মা বের করে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার নামই হলো মৃত্যুদান করা।

জীবন ও মৃত্যুর অধিকারী যদি নমরুদই হত, তাহলে তার বাপ-দাদা কেউ মৃত্যু বরণ করতো না। তার বংশের প্রথম ব্যক্তিই আজ পর্যন্ত ক্ষমতায় বসে থাকতো আর তার মাথাতেই রাজ মুকুট শোভা লাভ করতো। এই হতভাগা তার জাতিকে এই সহজ কথাটা বুঝতে দিতে চায় না। জাতি এই কথা বুঝতে পারলে তার রব-এর দাবী টিকে থাকবে না। এ কারণে জাতিকে সে বোকা বানানোর চেষ্টা করলো।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম চিন্তা করলেন, এখন যদি তিনি নমরুদের সাথে জীবন মৃত্যু সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনা করতে যান তাহলে এই নির্বোধ কথার কৌশলে প্রকৃত বিষয়ের ওপর থেকে মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে। এতে করে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না। আর প্রকৃত সত্য সম্পর্কে মানষের সামনে এই হতভাগাকে লা-জবাব করা যাবে না। আর তাঁর উদ্দেশ্যও বিতর্ক করা নয়। বরং মানুষের মন-মগজে মহাসত্য প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা।

অতএব এমন এক প্রশ্নের অবতারণা করতে হবে, যা প্রতিদিন মানুষ দেখে থাকে এবং মানুষের চোখের সামনেই তা ঘটে থাকে। এভাবেই নমরুদের কৌশল ব্যর্থ করার জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হবে। তিনি এবার বললেন, আমি সেই মহান সত্ত্বাকে আল্লাহ, রব এবং ইলাহ বলে স্বীকৃতি দান করি, যিনি প্রতিদিন সূর্যকে পূর্বদিক হতে উদিত করেন এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত করান। তুমিও যদি তাঁর মতই রব-এর দাবী করো, তাহলে এর বিপরীতে সূর্যকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করে পূর্ব দিকে অস্তমিত করো।

আল্লাহর নবীর এই প্রশ্নে নমরুদ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে গেল সে। কোন কথাই আর মুখ থেকে বের হলো না। আল্লাহর নবীর কথার পরিপ্রেক্ষিতে সে কোন যুক্তিই আর দিতে পারলো না। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন সে কোন কথা বলতে পারলো না এবং জাতিকে আর ভুল বুঝাতে পারলো?

এর কারণ হলো, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের কথার তাৎপর্য সে বুঝেছিল। তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ইবরাহীম বলতে চায়, আমি এমন এক সত্তাকে আল্লাহ, রব্ব ও ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছি, যার সম্পর্কে আমার বিশ্বাস হলো, এই সমস্ত সৃষ্টি এবং এর সমস্ত নিয়ম ও শৃংখলা, ব্যবস্থাপনা একমাত্র তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তিনি এই পূর্ণ রীতি ও ব্যবস্থাকে নিজের কুদরতের দ্বারা এমনভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন যে, সৃষ্টির কোন কিছুই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে নিজের স্থান হতে একবিন্দু পরিমান এদিক ওদিক হতে পারে না।

তোমরা সেই আল্লাহ বা রব্ব বা ইলাহ-এর ব্যবস্থাপনার মধ্য হতে সূর্যকে দেখো, মাটির পৃথিবী এই সূর্য হতে কি ধরনের কল্যাণ লাভ করছে। এরপরেও আমার রব্ব সেই সূর্যের একটা নিয়ম করে দিয়েছেন যে, তা পূর্ব দিক হতে উদিত হবে এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত হবে। সূর্যের পক্ষে আল্লাহর নিয়মের ব্যতিক্রম করার কোন উপায় নেই। কারণ তা আল্লাহর নিয়মের অধিন। সুতরাং সমস্ত ক্ষমতার উৎস হলেন মহান আল্লাহ। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, যাকে খুশী জীবন দান করতে পারেন এবং মৃত্যুও দিতে পারেন।

নমরুদ বলতে পারতো, সূর্যের ওপর আমার ক্ষমতা আছে, এসব কিছুর নিয়ম শৃংখলা আমার হাতে। কিন্তু সে এ কথা এ কারণেই বলেনি যে, সে নিজেও কোনদিন এ কথা বলেনি, এসব কিছুর স্রষ্টা স্বয়ং আমি। সূর্যের গতিবিধি আমারই হাতে। বরং নমরুদের দাবী ছিল, আমি আমার দেশের মানুষের রব্ব, এদের আইন ও বিধান দাতা আমি।

নমরুদ একথাও বলতে পারতো যে, আমি কোন সৃষ্টি কর্তাকে মানিনা, তাকে আমি স্বীকৃতি দেই না। আর সূর্য স্বয়ং এক দেবতা। সূর্য দেবতার অধিনে অনেক কিছুই রয়েছে। তা নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই কথা সে এ জন্য বলেনি যে, তাহলে ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর বলার অবকাশ ছিল, যে স্বয়ং দেবতা, তাহলে সে এমন উদিত হয় কেন আবার অস্তই বা যায় কেন? তার কোন

স্থায়িত্ব নেই। নমরুদ এ কথাও বলতে পারতো যে, আমি তা পারিনা। কিন্তু তুমি যাকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছো, তাকেই বলো যে, এই মুহূর্তে তিনি সূর্যকে পশ্চিম হতে উদিত করে পূর্বদিকে অস্তমিত করে দেখাক। এ কথাও সে বলেনি, তার কারণ হলো, এই কথা বললে তার অক্ষমতার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তার দুর্বলতা জাতির সামনে প্রকাশিত হয়ে যায়।

হে আগুন ! ইবরাহীমের ওপরে আরামদায়ক হয়ে যাও

শুধুমাত্র হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের ক্ষেত্রেই নয়, প্রতিটি নবী ও রাসূলদের ক্ষেত্রেই এটা হয়েছে এবং প্রত্যেক যুগে ইসলামী আন্দোলনের সাথে এই আচরণই করা হয়। অর্থাৎ বাতিল শক্তি যখন আর যুক্তিতে সত্যের সামনে টিকাতে পারে না, তখন সত্যকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং শক্তি প্রয়োগ করে সত্যেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। বর্তমান কালেও তাই করা হচ্ছে। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে ও তাই করা হলো। জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির ক্ষেত্রে বাতিল শক্তি যখন নিজের দেওলিয়াপনা প্রকাশ করে দিল, তখন তারা বাধ্য হলো জ্ঞানের মশাল ইবরাহীমকে ফুঁক দিয়ে নির্বাপিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে।

গোটা জাতি তাঁর বিরুদ্ধে, নিজের পিতা তাঁর বিরুদ্ধে, খোদ রাষ্ট্রশক্তিও তাঁর বিরুদ্ধে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁর কোন সাহায্যকারী তো থাকা দূরের কথা, তাঁর পক্ষে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করবে, এমন একজন মানুষও ছিল না। এ কারণে আল্লাহর নবী সামান্য দুর্বলতাও অনুভব করেননি। কোন ধরনের ভয়ের ছোঁয়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। এমনকি সামান্য মানসিক চিন্তাও তাঁর ভেতরে সৃষ্টি হয়নি। তিনি পূর্বের মতই নির্ভীক ছিলেন। তাঁর ভেতরে কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছিল না। মানুষ তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন বেপরোয়া। যারা তাকে তিরস্কার করছিল, তাদেরকে তিনি সত্য গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলেন। অবশ্য এমন কঠিন ও করুণ সময়ে জড় পদার্থের নির্ভরতা শেষ হয়ে যায়, পার্থিব উপকরণ বিলুপ্ত এবং সংরক্ষণ ও সাহায্যের সমস্ত বাহ্যিক সরঞ্জাম লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের তখনও এমন একটি শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী নির্ভর ছিল, যিনি সমস্ত নির্ভরের নির্ভর এবং সমুদয় সাহায্যের সাহায্যকারী বলে অভিহিত, তা ছিল একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভরতা। তিনি নিজের উচ্চ মর্যাদাশালী

নবীকে, জাতির মহান পথপ্রদর্শককে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিলেন না। মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান তাঁরই বান্দদের সামনে অকুতোভয়ে প্রচার করেছেন, তাকে কি আল্লাহ জালিমদের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন? ইতিহাসে এমন কখনো ঘটেনি। যথা সময়ে মহান আল্লাহর সাহায্য এসেছে এবং সত্য বিজয়ী হয়েছে।

শাসক নমরুদের আদেশে লোকজন দেশের বিশেষ একস্থানে এক অগ্নিকুন্ড প্রজ্জ্বলিত করলো। কয়েক দিন যাবৎ সেখানে নানা সরঞ্জাম দিয়ে এক ভয়ংকর আগুন জ্বালানো হলো। আগুনের শিখা এত উঁচুতে উঠেছিল যে, শুন্য মার্গে পাখি পর্যন্ত বিচরণ করতে পারেনি। আশেপাশে আগুনের উত্তাপে সমস্ত বস্তু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। এখন মসিবত দেখা দিল, ইবরাহীমকে আগুনে ফেলবে কে? কারণ আগুনের এত উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে যে, তার পাশেই যাওয়া যায় না। আর পাশে যেতে না পারলে তাকে আগুনে নিক্ষেপও করা যাবে না। তারপর মন্ত্রণাদাতাগণ পরামর্শ দিলো, এমন এক চরক গাছ নির্মাণ করা হোক এবং গাছে ইবরাহীমকে বসিয়ে তারপর তাকে দূর থেকে আগুনের ভেতরে নিক্ষেপ করা হোক।

পরামর্শ অনুসারে চরক গাছ নির্মাণ করা হলো। আল্লাহর নবীকে সেই গাছে বসানো হলো। সামনে তীব্র আগুনের উত্তাপ, যার ভেতরে পাথর নিক্ষেপ করা হলেও বোধ হয় তা গলে যাবে, আর সামন্য কিছুক্ষণ পরেই যাকে ঐ আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, সে প্রশান্ত চিত্তে এবং ভয়শুন্য চেহারায় বসে আছেন। গোটা মুখমন্ডলে তাঁর মহান আল্লাহর ওপর নির্ভরতার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে অনেক ফেরেশতা আল্লাহর নবীর কাছে এসে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছেন। আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম মিষ্টি মধুর হেসে বিনয়ের সাথে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। বারবার ফেরেশতারা তাকে সাহায্যের প্রস্তাব দিতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহর নবী জবাব দিলেন, আমি এমন আল্লাহর দাসত্ব করি না, যিনি অন্ধ, যিনি তাঁর বান্দার কোন সংবাদ জানতে পরেনা, যিনি তাঁর বান্দার অবস্থা চোখে দেখেন না। সুতরাং সাহায্যের যদি আমার প্রয়োজন হয়ই, তাহলে ঐ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, যিনি আমার রব এবং আমি যার দাসত্ব করি। এরপর বাতিল শক্তি তাকে যে মুহূর্তে আগুনে নিক্ষেপ করলো ঠিক তখনই মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি আগুনকে আদেশ দিলেন–

يٰنَارُكُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ-

হে আগুন! ঠান্ডা হয়ে যাও এবং শান্তিস্বরূপ হয়ে যাও ইবরাহীমের প্রতি। তারা ইবরাহীমের সাথে অন্যায় আচরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে নিকৃষ্টভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছিলাম। (সূরা আম্বিয়া-৬৯-৭০)

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম আগুন হতে কিভাবে বাঁচলেন, অনেকে এ প্রশ্ন তোলে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এই প্রশ্ন তোলা একান্তই অর্থহীন। আগুনের দহন ক্ষমতা হতে রক্ষা পবার জন্য বর্তমানে এই মানুষ অনেক ধরনের পোষাক এবং পদার্থ আবিষ্কার করেছে। আগ্নেয় গিরির পাশে গিয়ে আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য বিশেষ পোষাক প্রস্তুত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ মানুষকে যে জ্ঞান দিয়েছেন, তা ব্যবহার করেই এই মানুষ এত কিছু আবিষ্কার করেছে।

সুতরাং সেই আল্লাহই সে সময়ে তাঁর নবীকে রক্ষা করার জন্য এমন কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, যে সম্পর্কে মানুষ কোন ধারণা করতেও সক্ষম হবে না। তাছাড়া ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকেও যে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছিলেন, ঐ আগুনকেও ঐ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। আগুন হলো মহান আল্লাহর গোলাম। সুতরাং আগুন তার মনিবের, তার রব-এর আদেশ পালন করেছে মাত্র। এখানে অবাক হবার কিছুই নেই।

আমরা নিরাপত্তার প্রতীক

কোন একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সে আদর্শের ভিত্তিতে একটা সুসংগঠিত দল গঠন করতে হয়। সে দলের একটা কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকে। গোটা দেশে থাকে স্থানীয় কার্যালয়। কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত নির্দেশ ঐ স্থানীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় তা ঐ আদর্শের অনুসারী কর্মীগণ বাস্তবায়ন করে থাকেন। তেমনি মুসলিম একটা মিল্লাতের নাম। এই মিল্লাতের আদর্শ হলো ইসলাম। এই মিল্লাতের জাতির পিতার নাম হলো হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম। আল্লাহর নির্দেশে তিনি এই মিল্লাতের জন্য একটা কেন্দ্র নির্মাণ করলেন। ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম যে ঘর নির্মাণ করলেন তা কোন সাধারণ ঘর ছিল না। এই ঘর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একটাই ছিল, গোটা বিশ্বে আল্লাহর দেয়া জীবন

বিধান প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন এখান থেকেই পরিচালিত হবে−এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখেই হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর মা'কে জনমানবহীন এই প্রান্তরে রেখে যাওয়া হয়েছিল, ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামের কোরবানীও ছিল ঐ একই উদ্দেশ্যে এবং কা'বার নির্মাণও ছিল ঐ একই লক্ষ্যে।

গোটা পৃথিবীতে যারা তাওহীদের মশাল বহন করবে, তারা যেন প্রতি বছরে একবার হজ্জ নামক বিশ্ব সম্মেলনে এসে সমবেত হয়, একত্রে সমস্বরে এক আল্লাহর দাসত্বের ঘোষনা বজ্র কণ্ঠে দিতে পারে,পারস্পরিক পরিচিতি লাভ করতে পারে, একে অপরের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে তা সমাধানের বাস্তব পন্থা অবলম্বন করতে পারে, আল্লাহ বিরোধী শক্তির মোকাবেলা কিভাবে করা যায় এবং গোটা পৃথিবীতে কিভাবে এক আল্লাহর আইন জারি করা যায়−এ সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যেই সেদিন কা'বা নির্মাণ করে আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সমস্ত মানুষকে সে ঘরের দিকে আহবান জানিয়ে ছিলেন। তিনি দোয়া করেছিলেন−

وَاِذْقَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ−

হে আমার প্রতিপালক! এই স্থানকে একটা শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দিন এবং এখানের অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদেরকে সব ধরণের ফলের রিয্ক দান করো। (সূরা বাকারাহ- ১২৬)

পবিত্র কোরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে −

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ−فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ−وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا− وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً−

এ কথা অবশ্যই সত্য যে, মক্কায় অবস্থিত ঘরটিই মানুষের এবাদতের ঘর হিসেবে সর্বপ্রথম বানানো হয়েছে। এ ঘর হচ্ছে বরকতময় এবং গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য হেদায়েতের কেন্দ্র। এতে রয়েছে আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং ইবরাহীমের ইবাদাতের স্থান। এর অবস্থা হলো এই যে, এখানে যে কেউ প্রবেশ করবে সেই নিরাপত্তা লাভ করবে। (সূরা ইমরাণ-৯৬-৯৭)

সূরা আনকাবুতে মক্কার এই ঘরের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ–

এরা কি দেখতে পায়নি, আমরা কি ধরণের নিরাপত্তাপূর্ণ হারাম প্রস্তুত করেছি। অথচ তার চারদিকে মানুষকে ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানেই কা'বাঘর বানানোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন। বলা হয়েছে, এই ঘর হলো হেদায়েতের কেন্দ্র, এখান থেকেই একত্ববাদের বাণী গোটা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। এই ঘরকে মহান আল্লাহ এমনই সম্মান ও মর্যাদাদান করেছেন যে, এখানে মানুষ পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। কে না জানে গোটা আরবে হত্যা, নির্যাতন, লুটতরাজ ও যুদ্ধ ছিল নিয়মিত ব্যাপার। কিন্তু সে সময়ের ইতিহাস সাক্ষী, কা'বা এলাকা ছিল নিরাপদ । এখানে প্রাণের শত্রুকেও কেউ কিছুই বলতো না। কা'বা এলাকার ভেতরে নিজের পিতা, আপন ভাই বা মায়ের হত্যাকারীকে আরবের একেবারে পাষাণ, অসভ্য নির্মম কোন লোকও যদি দেখতে পেতো তবুও সে তাকে কিছুই বলতো না।

কারণ তাদের কাছে কা'বা ছিল সম্মানিত এলাকা। যাদের জীবিকা অর্জনের পেশা ছিল জোর পূর্বক অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া, অহেতুক যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে সম্পদ হস্তগত করা, তারাও কোরবানীর পশু দেখলে সসম্মানে পথ ছেড়ে দিত। গোটা বছরের আটমাস গোটা আরবে রক্তের বন্যা বইয়ে দিলেও তারা বছরের চারটি মাস কোন ধরণের যুদ্ধ মারামারি করতো না। সে চারটি মাস হলো রজব, যিলকদ, যিলহজ্জ ও মহররম। আমরা মুসলিম জাতি পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আমাদের পিতা এবং তিনি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেছেন। এই পৃথিবীকে যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা ইসলামী জীবন বিধানের ভিত্তিতে নেতৃত্ব দিয়েছে, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীবাসী শান্তি ও স্বস্তিতে বসবাস করেছে। যখনই পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে ইসলাম বিরোধী জনগোষ্ঠী আসীন হয়েছে, তখনই পৃথিবীতে অশান্তির দাবানল প্রজ্বলিত হয়েছে।

শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে যতগুলো প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, এসব যুদ্ধের একটি যুদ্ধের সূচনাও মুসলমানরা করেনি। যাদের জাতির

পিতা শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, আজ মুসলমানদের অনৈক্যের কারণে তাদেরকেই ঐসব লোকজন সন্ত্রাসী হিসেবে বিশ্বব্যাপী চিহ্নিত করছে, যারা সন্ত্রাসের জন্মদাতা। পৃথিবীতে ভাঙন, বিপর্যয়, যুদ্ধ, হানাহানী, বিশৃংখলা, অশান্তির সূচনা করেছে ইসলাম বিরোধী লোকগুলো। পৃথিবীতে নেতৃত্বের আসন থেকে যখন মুসলমানরা ছিট্কে পড়েছে, তখন থেকেই অশান্তি, বিপর্যয় আর সন্ত্রাস পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই মুসলমানদেরকে আজ ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে।

মৃতকে জীবিতকরণ

আমরা পবিত্র কোরআন থেকে জানতে পারি, নবুয়্যাত লাভ করার পূর্বে নবীগণ যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, সেই জ্ঞানের দ্বারাই তাঁরা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে যেতেন। ওহীর আগমন তাদের অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানকে বিশাল শক্তিতে পরিণত করে দিত। ওহী অবতীর্ণের পূর্বে তাদের মন-মস্তিষ্ক যেসব সত্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিত, আল্লাহর ওহী সেগুলোর সত্য হবার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করতো। পরম সত্যের সাথে নবীদেরকে চাক্ষুষ পরিচয় করে দেয়া হত, নবীগণ সেসব বিষয়ে মানুষের কাছে সাক্ষ্য প্রদান করতেন।

পবিত্র কোরআন বারবার মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছে, তোমরা চিন্তা গবেষণা করো, দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, আমার নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করো। নবী-রাসূলগণ নবুয়্যাত লাভ করার পূর্বে তাই করতেন। সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করলে স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা এভাবে চিন্তা গবেষণা করেই পরম সত্ত্বার সন্ধান লাভ করার চেষ্টা করতেন। আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী অবতীর্ণ হবার কারণে তারা প্রকৃত সত্যের পৃথিবীতে প্রবেশ করেছেন। মানুষকেও সেদিকেই আহ্বান করেছেন। পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলী কিভাবে আল্লাহ পরিচালনা করছেন, এটা তাঁদেরকে পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছে। তিনি কিভাবে সৃষ্টি করেন এবং মৃত্যু ঘটান আবার মৃত থেকে জীবিত করেন তা প্রদর্শন করা হয়েছে। এই পৃথিবী ও অদৃশ্য জগতের মাঝে যে পর্দা অন্তরায় হিসেবে রয়েছে, মহান আল্লাহ সে পর্দা তাদের দৃষ্টির সামনে থকে সরিয়ে এমন সব দৃশ্য দেখিয়েছেন, যে দৃশ্য অবলোকন করলে সাধারণ মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলতো।

—১২

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম তাঁর মহান বন্ধু আল্লাহর কাছে দাবি জানালেন, তিনি কিভাবে মৃতকে জীবন দান করবেন, তা তিনি দেখতে আগ্রহী। এই ঘটনা মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এভাবে পেশ করেছেন–

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى-قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ-قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ-قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا-اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

সেই ঘটনাও স্মরণে রেখো, যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি মৃতকে কেমন করে পুনরুজ্জীবিত করবেন? আল্লাহ বললেন, তুমি কি তা বিশ্বাস করো না? সে আবেদন করলো, বিশ্বাস তো করি, কিন্তু মনের সান্ত্বনা প্রয়োজন। আল্লাহ বললেন, তবে তুমি চারটি পাখি ধরো এবং সেগুলোকে নিজের সাথে সুপরিচিত করে নাও। তারপর তাদের একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে দাও এবং তাদের আহ্বান করো। তারা তোমার কাছে ছুটে চলে আসবে। ভালো করে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও অতিশয় কুশলী। (সূরা বাকারাহ্,-২৬০)

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম কয়েকটি পাখি আনলেন এবং চিনে রাখার ব্যবস্থা করে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। তারপর প্রাণহীন সে পাখির টুকরোগুলো কয়েকটি পাহাড়ের ওপর রেখে আল্লাহর নাম নিয়ে সে পাখিগুলোকে আহ্বান জানালেন। পাখিগুলো জীবিত থাকতে যেমন আকৃতির ছিল, তেমন আকৃতি ধারণ করে তাঁর কাছে ফিরে এসেছিল। অর্থাৎ ঈমান বিশ্ শাহাদাত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি দেখলেন, মহান আল্লাহ কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন এবং সমস্ত মানুষের ইন্তেকালের পরে কিভাবে আবার জীবিত করবেন।

পৃথিবীতে জঘন্য প্রথা

হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম যে জাতির কাছে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন, সে জাতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির। পৃথিবীতে পরিচিত অপরিচিত এমন কোন অপরাধ নেই, যা সেই জাতির ভেতরে ছিল না। অন্যায় আর জুলুম অত্যাচারের সাগরে নিমজ্জিত ছিল সেই জাতি। সে সময়ে তারা আরো এমন একটি অপরাধের আবিষ্কার করেছিল যে, তখন পর্যন্ত পৃথিবী সে অপরাধের সাথে পরিচিত ছিল না। পবিত্র কোরআন হতে জানা যায় যে, তখন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ জানতো না, এই ধরনের কোন কু-কর্ম করা যায়। হযরত লূত আলায়হিস্ সালামের জাতিই সেই কু-কর্মের জন্মদান করেছিল। সে কু-কর্মের নাম হলো সমকাম। হোমি সাইড সেক্স। সে জাতির লোকজন নারীর সাথে যৌনক্রিয়া করার চেয়ে পুরুষে পুরুষে যৌন ক্রিয়া করতে অধিক আগ্রহী ছিল। এই জঘন্য কাজ তারা প্রকাশ্যে করতে আনন্দ লাভ করতো। সুন্দরী নারীকে ত্যাগ করে তারা পুরুষের সাথে যৌন ক্রিয়া করতো।

আজ হতে হাজার হাজার বছর পূর্বে এমন একটি জাতি এই ঘৃণিত ও জঘন্য প্রথার আবিষ্কার করেছিল, বর্তমান যুগের সভ্যতা গর্বী মানুষ যে জাতিকে অজ্ঞ অশিক্ষিত আর মূর্খ ছাড়া আর কিছুই বলবে না। কিন্তু সেই অজ্ঞ অশিক্ষিত ও মূর্খ জাতি কর্তৃক আবিষ্কৃত ঘৃণিত ও জঘন্য কর্ম—সমকামকে বর্তমানের সভ্যতা গর্বীত মানুষ আনন্দের সাথে স্বাগত জানিয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার দেশসমূহে পার্লামেন্টে আইন পাশ করা হয়েছে যে, সমকাম অবশ্যই বৈধ। এক পুরুষের সাথে আরেক পুরুষের বিয়েও তারা বৈধ করেছে আইনের মাধ্যমে। আমেরিকায় নির্বাচনের সময় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে ঘোষনা করতে হয় যে, 'আমি সমকামীদের অধিকার নিশ্চিত করবো।'

নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর এই ঘোষনা হতেই অনুমান করা যায় যে, সে দেশে এই ঘৃণিত প্রথা কিভাবে মহামারীর আকারে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। সমকামিতাও নাকি মানুষের মৌলিক অধিকার—এটাই হলো তথাকথিত উন্নত জাতিগুলোর বিশ্বাস। নারী ও পুরুষ তাদের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে পরস্পরকে বিয়ে করে। বিয়ে তো দূরে থাক, রাস্তা-পথে তারা পশুর মত জিনা ব্যভিচার করছেই, সেই সাথে এক শ্রেণীর নারী তার যৌনসঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করছে

আরেকজন নারীকে। আর পুরুষ নির্বাচন করছে আরেকজন পুরুষকে। হযরত লুত আলায়হিস্ সালামের যে জাতির কাছে আগমন করেছিলেন, সেই জাতি এই জঘন্য কাজের আবিষ্কারক।

সেই জাতির পূর্বে এই ঘৃণিত কাজের সাথে পৃথিবীর মানুষ পরিচিত ছিল না। যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তি করার জন্য একটা কুকুর আরেকটা নর কুকুরের কাছে গমন করেনা। একটা শূকর আরেকটা নর শূকরের কাছে যায় না। অর্থাৎ পশুর ভেতরে যে প্রথা নেই, পশু যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তি করার জন্য বিপরিত লিঙ্গের কাছে যায়। কিন্তু সৃষ্টির সেরা এই মানুষ, তার যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তি করার জন্য কোন লিঙ্গের ধার ধারে না। এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কিছু হতে পারে না।

পৃথিবীর যে এলাকায় এই জঘন্য কাজের সূচনা, সে এলাকার নাম ছিলো সুদম এবং কোন বিদেশী সুদম এলাকায় গমন করলে, সে এলাকার লোকজন তার সমস্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিত। তেমন বয়স হলে তার সাথে বাধ্যতামূলকভাবে সমকাম করা হতো। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম যখন তাঁর দাসীর সন্তান আলইয়ারাযকে সাদুমে প্রেরণ করেছিলেন, তখন সে এলাকার একজন লোক তার মাথায় পাথর ছুড়ে অকারণে আঘাত করেছিল। তারপর আঘাতকারী এসে তার কাছে দাবী করেছিল, আমি তোমার মাথায় পাথর ছুড়ে আঘাত করেছি। এতে আমার পরিশ্রম হয়েছে। সুতরাং আমার পারিশ্রমিক দিতে হবে।

অন্যায়কারীর এই অদ্ভুত দাবী শুনে আলইয়ারায তো অবাক। অন্যায়ভাবে একজন লোক তাকে আঘাত করলো, ক্ষতিপূরণ দিলে তো আঘাতকারী তথা অন্যায়কারী দিবে। আর এ দেশে যিনি নির্যাতিত হন উল্টো তাকেই ক্ষতিপূরণ দান করতে হয় নির্যাতনকারীকে। পাথর নিক্ষেপকারী অবশেষে আলইয়ারাযকে ধরে সেদেশের আদালতে নিয়ে গেল। আদালত বিচার করে রায় দিল যে, পাথর নিক্ষেপকারীর পাথর নিক্ষেপ করে তোমার মাথা ফাটিয়ে দিতে পরিশ্রম হয়েছে।

সুতরাং তার পারিশ্রমিক দান করতে হবে। আলইয়ারায তখন এই জুলুম থেকে আত্ম রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে একটি পাথর উঠিয়ে বিচারকের মাথা লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেছিল। বিচারকের মাথা ফেটে গেলে সে বলেছিল, আমি তোমার মাথা ফাটিয়ে যে পরিশ্রম করেছি এবং যে পারিশ্রমিক পাওনা হয়েছি, তা তুমি তোমার দেশের এই নাগরিককে দিয়ে দাও–যে ব্যক্তি আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

ইসলামে সমকামের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। ইসলামে সমকামকে লাওয়াতাত বলা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাওয়াতাতের (পুংমৈথুন) শাস্তি স্বরূপ কাউকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করেছেন অথবা তার নির্দেশ দিয়েছেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। শুধুমাত্র এতটুক প্রমাণ আছে যে, তিনি লাওয়াতাতকারী এবং যার সঙ্গে লাওয়াতাত করা হয় তাদের উভয়কেই হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এরা নিজেদের বড় পবিত্র বলে মনে করে

যেসব জাতির ওপরে মহান আল্লাহ্ আযাব নাজিল করেছিলেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, কেন তাদের ওপরে আযাব নাজিল করা হয়েছিল, তাদের অপরাধ কি ছিল, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত লূত আলায়হিস্ সালামের জাতিকে কি কারণে ধ্বংস করা হয়েছিল, তাদের অপরাধ কি ছিল এবং তারা কোন ধরনের অপরাধে জড়িত ছিল, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ–اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ–بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ–وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ–اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ–فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اِلاَّ امْرَاَتَهٗ–كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ–وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا–فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ–

আর লূতকে আমি পয়গাম্বর বানিয়ে প্রেরণ করেছি। তারপর স্মরণ করো যখন সে নিজ জাতির লোকদেরকে বললো, তোমরা কি এতদূর নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছো যে, তোমরা এমন সব নির্লজ্জতার কাজে করছো, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি? তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে ত্যাগ করে পুরুষদের দ্বারা নিজেদের যৌন ইচ্ছা পূরণ করে নিচ্ছো, প্রকৃতপক্ষে তোমরা একেবারেই সীমালংঘনকারী লোক। কিন্তু তাঁর জাতির লোকদের জবাব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, বের করে দাও এই লোকদেরকে তাদের নিজেদের জনপদ হতে, এরা নিজেদের বড় পবিত্র বলে প্রকাশ

করছে। শেষ পর্যন্ত আমি লূত ও তাঁর ঘরের লোকদেরকে–তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত, যে পেছনের লোকদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল, বাঁচিয়ে বের করে নিলাম। এই সেই জাতির লোকদের ওপরে এক প্রচন্ড বৃষ্টি বর্ষন করলাম। এরপর দেখো, সেই অপরাধী লোকগুলোর কি পরিণাম হলো! (সূরা আ'রাফ-৮০-৮৪)

এরা নিজেদের বড় পবিত্র বলে প্রকাশ করছে' এই কথাটা সেই হতভাগা জাতি অত্যন্ত বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গীতে হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছিল। তারা ব্যঙ্গ করে বলতো, এত ভদ্র ও পবিত্র লোক তো আমাদের ভেতরে থাকতে পারে না। সুতরাং তাদেরকে আমাদের এই এলাকা হতে বের করে দাও। কারণ ঐ লোকগুলো বলে, আমরা নাকি অপবিত্র কাজে লিপ্ত। সুতরাং আমরা অপবিত্র কাজ করে যখন নিজেরা অপবিত্র হয়ে গেছি, তখন এই অপবিত্র লোকদের সাথে তো আর পবিত্র লোক থাকতে পারে না। আমাদের এখান থেকে তাদের অন্যত্র চলে যাওয়াই উচিত।

এতেও আল্লাহর নবী হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম মনভাঙ্গা হলেন না। তিনি ধৈর্যের সাথে তাঁর জাতিকে আল্লাহর বিধানের দিকে ডাকতে থাকলেন। তিনি যেখানেই কয়েকজন মানুষ দেখতেন, সেখানে গিয়েই বলতেন, তোমরা কি তোমাদের ভেতর হতে অপরাধ বোধ হারিয়ে ফেলেছো? তোমাদের কি কোনই চেতনা নেই? কেন তোমরা ছিনতাই করো? কেন তোমরা অপরের দ্রব্য শক্তি প্রয়োগ করে ছিনিয়ে নাও? কেন তোমরা দুর্বলদের ওপরে অত্যাচার করো?

কেন তোমরা ডাকাতি করো? তোমাদের বিবেক বলে কি কিছুই নেই? তোমাদের তো স্ত্রী আছে, যাদের নেই তারা তো বিয়ে করার সামর্থ রাখো। তাহলে কেন তোমরা একজন পুরুষ হয়ে আরেকজন পুরুষের কাছে যৌন তৃষ্ণা মিটানোর জন্য গমন করো? তারপরেও এই কাজগুলো তোমরা প্রকাশ্য করছো। এই কাজ সম্পর্কে তোমরা পরস্পরে রসাত্মক আলোচনা করছো। এসব নোংরা কাজে তোমরা এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছো যে, এসব যে অপরাধমূলক কর্ম, এ সম্পর্কে তোমাদের কোন অনুভূতিই নেই। আল্লাহর নবী হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম তাঁর জাতিকে কি বলতেন, এ সম্পর্কে আল কোরআন বলছে–

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ–مَاسَبَقَكُمْ

بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ-اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ-وَتَأْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ-

আমি লূতকে প্রেরণ করেছিলাম, যখন সে তাঁর জাতির লোকদেরকে বলেছিল, তোমরা তো এমন নির্লজ্জ দুষ্কর্ম করো যা তোমাদের পূর্বে এই পৃথিবীবাসী করেনি। তোমাদের অবস্থা কি এই যে, তোমরা পুরুষদের কাছে যাও, রাহাযানি করো এবং নিজেদের মজলিসসমূহে খারপ কাজ করো। (সূর আন্‌কাবুত-২৮-২৯)

অর্থাৎ হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম-এর জাতির অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তারা সত্য কথা শোনার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবে, সে পথ তারা নিজেদের হাতেই বন্ধ করে দিয়েছিল। আল্লাহর নবীর ওপরে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে বলতো, আমরা যা করছি, এতে যদি তোমার খোদা একান্তই নারাজ হন বা অসন্তুষ্ট হন, তাহলে তিনি আমাদের ওপরে আযাব কেন নাজিল করেন না? আর তুমি আমাদেরকে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো যেন আমরা আমাদের এই জীবন-যাপন ত্যাগ করে তোমাকে নেতা মেনে নিয়ে, তোমার আদর্শ অনুরসণ করি।

তাহলে দেরী না করে নিয়ে এসো তোমার আযাব! তোমার আল্লাহ আমাদের ওপরে আযাব নাজিল করতে পারে, এ কথা তুমি আমাদেরকে অনেক বার শুনিয়েছো। তোমার আল্লাহর যদি এতই ক্ষমতা থাকে, আর তোমার কথা আল্লাহ যদি এতই শোনে, তাহলে সেই আযাব আমাদের ওপরে নিয়ে এসো। আমাদেরকে এসব কাজ ত্যাগ করার জন্য তুমি আর বিরক্ত করতে এসো না। যদি পারো তাহলে আযাব দিয়েই আমাদেরকে ধ্বংস করে দাও, যদি তুমি তোমার দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো।

চলে এলো আযাবের ফেরেশ্‌তা

মহান আল্লাহর আদেশে আযাবের ফেরেশ্‌তা হযরত লূত আলায়হিস্ সালামের জাতির আবাস স্থল সাদুমে উপস্থিত হলেন। তারপর তাঁরা অপূর্ব সুন্দর চেহারার কিশোর বালক বা তরুণের আকৃতি ধারণ করে নবীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। আল্লাহর নবী এই মেহমানদের দেখে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। তাঁর চিন্তার কারণ ছিল, সাদুম জাতি সুন্দর চেহারার কিশোর তরুণ দেখলেই তার সাথে জোর

করে বলৎকার করতো। হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম ভাবলেন, এই মেহমানগণ বয়সে এমন যে, এদেরকে তাঁর জাতির লোকজন দেখলেই তারা এসে এই মেহমানদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং মেহমানদের রক্ষার চিন্তায় তিনি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন।

ইতোমধ্যে তাঁর জাতির লোকজন জানতে পারলো যে, এমন কয়েকজন অদ্ভূত সুন্দর চেহারার তরুণ তাদের শত্রু লূতের বাড়িতে মেহমান হয়ে এসেছে, যারা বিদেশী এবং তেমন সুন্দর চেহারার তরুণ তাদের জাতির ভেতরে নেই। তাদের ভেতরে নোংরা প্রবৃত্তি জেগে উঠলো। তারপর তারা দলবদ্ধভাবে এসে হযরত লূত আলায়হিস্ সালামের বাড়ি ঘেরাও করলো। তারা বারবার দাবী করতে থাকলো, ঐ তরুণদের আমাদের হাতে উঠিয়ে দাও। যদি না দাও তাহলে আমরা শক্তি প্রয়োগ করে তোমার বাড়ি থেকে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবো।

হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম তাঁর জাতির লোকজনদের সামনে গিয়ে তাদেরকে বুঝালেন। কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল রইলো। আল্লাহর নবী তাদেরকে বললেন, এই দেশে সুন্দরী নারীর অভাব নেই। তোমরা তাদেরকে বিয়ে করে তাদের সাহচর্য লাভ করতে পারো। তোমাদের ভেতরে যে যৌবন রয়েছে, সেই নারীদের সাথে তা বৈধ পথে ব্যবহার করতে পারো।

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে শুধু মানুষের মধ্যেই শুধু নয়, প্রতিটি প্রাণীর ভেতরেই দুটো শ্রেণী এই কারণেই সৃষ্টি করেছেন যে, তারা একে অপরের সাথে যৌন ক্রিয়া করে বংশ বৃদ্ধি করবে। মানুষের ভেতরে নর আর নারী সৃষ্টি করা হয়েছে এ কারণে যে, তারা বিয়ের মাধ্যমে একে অপরকে বৈধ করে নিয়ে পরস্পর যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এ কারণে বংশ বৃদ্ধি করবে যে, এই পৃথিবীকে তারা সচল রাখবে। মানব বংশের বিস্তৃতি ঘটিয়ে মানব সভ্যতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেবে।

কিন্তু তোমরা পৃথিবীর চিরন্তন নিয়মকে পদদলিত করে এমন এক ঘৃণ্য পন্থা আবিষ্কার করেছো যে, এই ঘৃণ্য পন্থা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কোন জাতি আবিষ্কার করেনি এবং এমন ধরনের নোংরা কাজে লিপ্তও হয়নি। তোমরা এই অপকর্ম হতে বিরত হও এবং জাতির ভেতরে যেসব নারী রয়েছে, তোমাদের পছন্দ অনুসারে তাদেরকে বিয়ে করো এবং তাদের সাথে মিলিত হয়ে তোমরা তোমাদের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তি করো।

কিন্তু সাদুম জাতির লোকজন আল্লাহর নবীর কোন যুক্তিই গ্রহণ করলো না। তারা শেষ সময় দিয়ে দিল, এই সময়ের ভেতরে যদি সেই সুন্দর তরুণদেরকে তাদের হাতে অর্পণ করা না হয় তাহলে তারা তাঁর বাড়িতে জোর করে প্রবেশ করে তরুণদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। আল্লাহর নবী হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম কথার কৌশলে তাদেরকে বাড়ির বাইরে রেখে মেহমানদের কাছে এলেন। তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করলেন, আল্লাহ যেন এই জালিমদের কবল হতে তাঁর মেহমানদেরকে রক্ষা করেন।

আল্লাহর ফেরেশতারা হযরত লুত আলায়হিস্ সালামের অবস্থা অনুধাবন করলেন। তাঁরা আল্লাহর নবীকে এবার তাদের পরিচয় জানিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাদের এই চেহারা দেখে আপনি চিন্তিত হবেন না। কারণ আমরা মানুষ নই, আমরা আল্লাহর ফেরেশতা। আল্লাহর আদেশে আমরা আপনার জাতিকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। কারণ আপনার জাতির কর্মকান্ড এমন এক স্তরে গিয়ে পৌছেছে যে, তারা আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে। আপনি ও আপনার সঙ্গী সাথীগণ এই ধ্বংস লীলা হতে সংরক্ষিত থাকবেন। কিন্তু আপনার সেই স্ত্রী-কে তার সমর্থকদের সাথে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

হযরত লুত আলায়হিস্ সালাম যখন অনুভব করলেন, এই জাতির ভাগ্যে মহান আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তা ঘটবেই। যে আযাব নিয়ে আল্লাহর ফেরেশতাগণ আগমন করেছেন, সেই আযাব আর ফিরে যাবে না। তখন তিনি আল্লাহর আদেশে তাঁর ঈমানদার সাথীদের নিয়ে রাতের প্রথম প্রহরেই নিরাপদ এলাকায় চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রী তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করেছিল, সে তার স্বামীকে ত্যাগ করে তার জাতির সাথেই থাকতে অধিক পছন্দ করলো।

এরপর রাতের এক অংশে যখন অপরাধী জাতি গভীর সুসুপ্তিতে নিমগ্ন ছিল, এমন সময় আল্লাহর ফয়সালা কার্যকরী হয়ে গেল। ভয়ংকর একটা গর্জন হলো। তারপর গোটা এলাকাকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর তা উল্টিয়ে ফেলে দেয়া হলো। এরপর উপর হতে পাথর নিক্ষেপ করে গোটা জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলো। অপরাধী জাতি তাদের অপরাধের বিনিময় এভাবেই মহান আল্লাহর কাছ হতে লাভ করেছিল।

এই ঘটনা পবিত্র কোরআনের বেশ কয়েক স্থানে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যে মানব সভ্যতা এই পৃথিবীকে আবাদ করতে থাকবে, তাদের

শিক্ষার জন্যই আল্লাহ সেই সাদুম জাতির ধ্বংসের চিত্র পবিত্র কোরআনে এঁকে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ-فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ-اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ-

অবশেষে প্রভাত হতেই একটি বিকট শব্দ তাদেরকে আঘাত করলো এবং আমি সেই জনপদকে ওলট পালট করে রেখে দিলাম আর তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষন করলাম। নিঃসন্দেহে এই ঘটনার মধ্যে ঐ সমস্ত লোকের জন্য বড়ই নিদর্শন রয়েছে, যারা প্রজ্ঞাবান এবং বিচক্ষণ। (সূরা হিজর-৭৩-৭৫)

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ-مَّنْضُوْدٍ-مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ-وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ-

তারপর আমার ফায়সালার সময় যখন এসে পৌছলো, তখন আমি সেই জনপদের নীচের দিক হতে ওপরের দিকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দিলাম এবং তার ওপর পরিপক্ক মাটির পাথর অবিশ্রান্তভাবে বর্ষণ করলাম। যার প্রতিটি পাথর খন্ডই তোমার রব-এর কাছে চিহ্নিত ছিল। আর জালিমদের ব্যাপারে এই শাস্তি কিছু মাত্র দূরের জিনিষ নয়। (সূরা হূদ-৮২-৮৩)

আমি রোগগ্রস্ত হয়ে গেছি

হযরত আয়ূব আলাইহিস্ সালামের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, অকল্পনীয় রোগ যন্ত্রণায় তিনি দিনের পর দিন কষ্ট ভোগ করেছেন। তাঁর গোটা শরীরে পচন ধরেছিল, তা থেকে যে দুর্গন্ধ নির্গত হতো, ফলে কোন মানুষ তাঁর পাশে যেতে পারতো না। গোটা শরীরে রক্তাক্ত ক্ষত, তার ভেতরে পোকা বাসা বেঁধেছে। একদিকে রোগ যন্ত্রণা অপরদিকে পোকার কামড়ে তিনি জর্জরিত। তাঁর শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। প্রতিবেশীগণ সহ্য করতে পারলো না। তাকে এলাকা থেকে বের করে দেয়া হলো। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয় স্বজন তাকে ত্যাগ করলো। তবুও তিনি ধৈর্যহারা হলেন না।

নেই–কোথাও কেউ নেই তাঁকে এতটুকু সাহায্য করার। জীবনের এই চরম মুহূর্তেও তিনি হতাশ হননি। নিরাশা–হতাশার সামান্যতম চিহ্নও তাঁর রোগাক্রান্ত চেহারায় প্রতিভাত হয়নি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিন্দু পরিমাণ স্থান তাঁর দেহে অবশিষ্ট ছিল না, যেখানে রোগ আক্রমণ করেনি। অবশেষে রোগ যখন তাঁর জিহ্বায় আক্রমণ করলো, জিহ্বায় পচন দেখা দিল, তখন তিনি ব্যকুল হয়ে উঠলেন।

তাঁর ব্যকুলতা রোগের কারণে ছিল না। তাঁর ব্যকুলতা এ জন্য ছিল যে, মুখের ভেতরে জিহ্বাও যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তিনি ঐ মহান আল্লাহর নাম কী ভাবে উচ্চারণ করবেন ! এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি কী ভাবে আল্লাহকে ডাকলেন–আল্লাহর কোরআন আমাদেরকে তা শোনাচ্ছে–

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَابِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ–

স্মরণ করো, যখন সে তার রবকে ডাকলো, আমি রোগগ্রস্ত হয় গেছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী। আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম এবং শুধুমাত্র তার পরিবার পরিজনই তাকে দেইনি বরং এই সাথে এ পরিমাণ আরো দিয়েছিলাম, নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এজন্য যে, এটা একটা শিক্ষা হবে ইবাদাতকারীদের জন্য। (সূরা আল্ আম্বিয়া-৮৩-৮৪)

হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের দোয়ার ধরণ অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়! সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন, তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। পরে কোন অভিযোগ ও নালিশ নেই, দোয়ার এই ভঙ্গিমা যে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন চিত্রটি তুলে ধরে তা হচ্ছে এই যে, কোন পরম ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট, ভদ্র ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি দিনের পর দিন অনাহার ক্লিষ্টতার দুঃসহ জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে কোন পরমদাতা ও দয়ালু ব্যক্তির সামনে কেবলমাত্র এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়ে যায়, আমি অনাহারে আছি এবং আপনি বড়ই দানশীল। এরপর সে আর মুখে কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না।

আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম–সূরা সাদের চতুর্থ রুকূ'তে এর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁকে বলেন, নিজের পা দিয়ে আঘাত করো, এ ঠাণ্ডা পানি মজুদ আছে গোসল ও পান করার জন্য।

এই আয়াত থেকে জানা যায়, মাটিতে পা ঠুকবার সাথে সাথেই আল্লাহ তাঁর জন্য একটি প্রাকৃতিক ঝরণা-ধারা প্রবাহিত করেন। সে ঝরণার পানির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ পানি পান ও এতে গোসল করার সাথে সাথেই তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। এ রোগ নিরাময়ে এদিকে ইংগিত করে যে, তাঁর কোন মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছিল।

হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের এক মহান পরীক্ষায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁর সে ভূমিকা সম্পর্কে মহান আরশে আজিমের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সনদ দিয়েছেন যে, তাঁর এই ভূমিকা চিন্তাশীলদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়। মহান আল্লাহ বলেন–আর স্মরণ করো আমার বান্দা আইয়ুবের কথা যখন সে তার রবকে ডাকলো এই বলে যে, শয়তান আমাকে কঠিন যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। (আমি তাকে আদেশ দিলাম) তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো, এ হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি গোসল করার জন্য এবং পান করার জন্য। আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার পরিজন এবং সেই সাথে তাদের মতো আরো, নিজের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ এবং বুদ্ধি ও চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে। সূরা সা-দ-এর ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا–نِّعْمَ الْعَبْدُ–إِنَّهُ أَوَّابٌ–

আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি, উত্তম বান্দা ছিল সে, নিজের রবের অভিমুখী।

উল্লেখিত আয়াতে হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বর্ণনা করার পূর্বে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ হযরত সোলাইমান আলাইহিস্ সালামের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, আমি সোলাইমানকে অগণিত নেয়ামত দানে ধন্য করেছিলাম। কিন্তু সে কখনো আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়নি এবং আমাকে ভুলে যায়নি। কখনো সে অহংকার করেনি। এখানে একথা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, বান্দার অহংকার আল্লাহর কাছে যত বেশী অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় তার দীনতা ও বিনয়ের প্রকাশ তাঁর কাছে তত বেশী

প্রিয়। বান্দা যদি অপরাধ করে এবং সতর্ক করার কারণে উলটো আরো বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহলে এর পরিণাম তাই হয় যা ইবলিস, ফেরাউন, নমরুদ, কারুণসহ যুগের বা শতাব্দীর ফেরাউনদের হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে বান্দার যদি সামান্য পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে তাওবা করে দীনতা সহকারে তার রবের সামনে মাথা নত করে, তাহলে তার প্রতি এমন সব দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হয়, যা ইতিপূর্বে দাউদ আলাইহিস সালাম ও সোলাইমান আলাইহিস সালামের ওপর প্রদর্শিত হয়েছে। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম ইস্তিগফারের পরে যে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ তাকে অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেন এবং বাস্তবে তাঁকে এমন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করেন যা তাঁর পূর্বে কেউ লাভ করেনি এবং তাঁর পরে আজো পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি। বায়ু নিয়ন্ত্রণ ও জ্বিনদের ওপর কর্তৃত্ব এবং দু'টি এমন ধরনের অসাধারণ শক্তি যা মানুষের ইতিহাসে একমাত্র হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামকেই দান করা হয়েছে। অন্য কাউকে এর কোন অংশ দেয়া হয়নি।

এরপরেই হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের ইতিহাস উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আমি যেমন সোলাইমানকে নেয়ামত দান করে পরীক্ষা করেছিলাম, সে পরীক্ষায় সে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল ঠিক তেমনি আইয়ুবের কাছ থেকে সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নিয়ে, তাকে রোগগ্রস্থ করে পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। সে পরীক্ষায় সে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল। যখন সে প্রচুর নে'মাত লাভ করেছিল, তখনও সে কখনো আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়নি, আবার যখন তার কাছ থেকে ধন-দৌলত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তাঁর আপনজনরা রোগের কারণে তাঁকে পরিত্যাগ করেছে, কঠিন রোগ তাকে দিনের পর দিন সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে, তখনও সে আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়নি। নিরাশ হয়নি–হতাশা ব্যক্ত করেনি। উভয় অবস্থাতেই সে আমার শোকর আদায় করেছে–আমার রহমতের ওপরে আশাবাদী থেকেছে।

বোখারীর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আবু হোরায়রা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন একদিন হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম গোছল করছিলেন। এমন সময় স্বর্ণের তৈরী পঙ্গপাল তাঁর শরীরের ওপরে এসে আছড়ে পড়তে থাকে। তিনি তা দ্রুত হাতে ধরে নিজের কাপড়ের ভেতরে জমা করতে থাকেন। এ সময় মহান আল্লাহ তাকে ডাক দিয়ে বলেন, হে আইয়ুব ! তুমি দেখতে পাচ্ছো, তা থেকে কি আমি তোমাকে মুখাপেক্ষীহীন করিনি?

অর্থাৎ আমি তো তোমাকে প্রচুর দান করেছি, তবুও কেন এসব স্বর্ণের পঙ্গপাল ধরে জমা করছো? আল্লাহর নবী হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম বললেন, হে রাব্বুল আলামীন, তুমি আমাকে অনেক দান করেছো, কিন্তু এরপরেও তো তোমার রহমত ও বরকত হতে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। আবার এক সময় তিনি একেবারে কপর্দক শুন্য হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর সন্তান-সন্ততি তাঁকে ত্যাগ করেছিল, পরীক্ষায় সফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবার পরে মহান আল্লাহ তাঁকে পুনরায় সমস্ত কিছুই দান করেছিলেন। কোরআনে বলা হয়েছে, যখন সে তার রবকে ডাকলো এই বলে যে, শয়তান আমাকে কঠিন যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

কোরআনের বর্ণনার অর্থ এটা নয় যে, শয়তান আমাকে রোগগ্রস্ত করে দিয়েছে এবং আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, রোগের প্রচন্ডতা, ধন-সম্পদের বিনাশ এবং আত্মীয়-স্বজনদের মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে আমি যে কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি তার চেয়ে বড় কষ্ট ও যন্ত্রণা আমার জন্য হচ্ছে এই যে, শয়তান তার প্ররোচনার মাধ্যমে আমাকে বিপদগ্রস্থ করছে। এ অবস্থায় সে আমাকে আমার রব থেকে হতাশ করার চেষ্টা করে, আমাকে আমার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ করতে চায় এবং আমি যাতে অধৈর্য হয়ে উঠি সে প্রচেষ্টায় রত থাকে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, আমি তাকে হুকুম দিলাম তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো, এ হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি গোসল করার জন্য এবং পান করার জন্য।

অর্থাৎ আল্লাহর আদেশে মাটিতে পায়ের আঘাত করতেই একটি পানির ঝরণা প্রবাহিত হলো। এর পানি পান করা এবং এ পানিতে গোসল করা ছিল হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের জন্য তাঁর রোগের চিকিৎসা। মুফাস্সিরগণ বলেন, হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম কোন কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাইবেলও এ কথাই বলে যে, তাঁর সারা শরীর ফোড়ায় ভরে গিয়েছিল।

কোরআনে বলা হয়েছে, আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার পরিজন এবং সেই সাথে তাদের মতো আরো–হাদীস থেকে জানা যায়, এ রোগে আক্রান্ত হবার পর হযরত আইয়ূব আলাইহিস সালামের স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তাঁর সংগ ত্যাগ

করেছিল এমন কি সন্তানরাও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ দিকে ইংগিত করেই আল্লাহ বলছেন, যখন আমি তার রোগ নিরাময় করলাম, সমস্ত পরিবারবর্গ তাঁর কাছে ফিরে এলো এবং তারপর আমি তাঁকে আরো সন্তান দান করলাম। আল্লাহ বলেন, আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার পরিজন এবং সেই সাথে তাদের মতো আরো, নিজের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ এবং বুদ্ধি ও চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে।

অর্থাৎ একজন বুদ্ধিমানের জন্য এর মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, সুসময়ে অনুকূল অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে গিয়ে আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী হওয়া উচিত নয় এবং খারাপ অবস্থায় আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও উচিত নয়। তাকদীরের ভালমন্দ সরাসরি একমাত্র ঐ আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন। তিনি ইচ্ছে করলে মানুষের সবচেয়ে ভাল অবস্থাকে একেবারে খারাপ অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে একেবারে চরম দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে তাকে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় উপনীত করতে পারেন। সুতরাং ঈমানদার-পরহেযহার ব্যক্তির কর্তব্য হলো, যে কোন অবস্থায় তাঁর ওপর ভরসা এবং তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করা উচিত। কোন অবস্থাতেই হতাশ হওয়া উচিত নয়। হতাশা ব্যক্ত করা বড় ধরনের গোনাহ্।

যাযাবর জীবন থেকে রাজসিংহাসনে

ঈমানদার ব্যক্তি কখনও বিপদে ধৈর্য হারায় না। জীবনের চরম মুহূর্তে সে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। যে কোন ধরনের বিপদই আসুক না কেন, ঈমানদার আল্লাহর ওপরে ভরসা করে। এটা হলো ঈমানের বাস্তব উপকারিতা। ঈমান মানুষের ভেতরে ধৈর্য সৃষ্টি করে দেয়। কারণ ঈমানদার এ কথা জানে যে, বিপদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের জীবনের দিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে তাঁর অন্যান্য ভাইগণ তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি গর্তে নিক্ষেপ করলো। জীবনের এই চরম মুহূর্তেও তিনি অস্থির হননি। এতটুকু ধৈর্যহারা হননি। তাঁর এই বিপদের মধ্যে কতবড় কল্যাণ যে নিহিত ছিল, তখন তিনি যেমন অনুভব করতে পারেননি তেমনি উপলব্ধি করতে পারেনি তাকে যারা হত্যা করার উদ্দেশ্যে গর্তে নিক্ষেপ করেছিল তারাও।

কেনান শহরের একটি গর্তে তাকে নিক্ষেপ করা হলো, এরপর তিনি গিয়ে পৌঁছলেন সুদূর মিশরে। সেখানে তিনি প্রথমে হলেন সে রাষ্ট্রের অর্থ ও খাদ্যমন্ত্রী এবং তারপরেই তিনি সেদেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেন। তাঁর ওপরে যে বিপদ আপতিত হয়েছিল, সে বিপদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত ছিল। কিন্তু বিপদ যখন মুখ ব্যাদন করে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল, পৃথিবীর আলো-বাতাস তিনি আর কোনদিন দেখতে পাবেন, ভোগ করতে পারবেন, মুক্ত আলো-বাতাসে তিনি প্রাণভরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন, এমন কোন আশা-ই যখন ছিল না, তখনও তিনি এতটুকু বিচলিত হননি। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরও অবস্থা তেমনি হতে হবে। তাহলেই কল্যাণ লাভ করা যাবে–তার পূর্বে নয়।

আমি কারাগারে যেতে চাই

মিশরেও উপনীত হয়ে বিপদ তাঁর পিছু ত্যাগ করলো না। অপূর্ব সুন্দর চেহারার কারণে একশ্রেণীর নারীর দল তাঁকে কলুষিত করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠলো। তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র যখন ব্যর্থ হলো তখন তাঁর ওপরে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হলো। এখানেও তিনি ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। প্রকৃত পক্ষে নীতি নৈতিকতা বিরোধী এবং আল্লাহ বিরোধী কোন কাজ নিজের দ্বারা সংঘটিত হবার পূর্বে ঈমানদার–আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি এমন স্থানকেই অধিক প্রাধান্য দান করেন, যে স্থান সম্পর্কে তার পূর্ণ ধারণা থাকে যে, সেখানে তাকে চরম কষ্টের মধ্যে দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করতে হবে। সেখানে যতই কষ্ট হোক না কেন, এমন কাজ করতে ঈমানদার ব্যক্তি কখনোই রাজী হবে না, যে কাজ করে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো যাবে না। এ কারণেই নবী রাসূল ও তাদের দৃঢ় অনুসারী ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীগণ প্রজ্জ্বলিত আগুনের কুন্ডকে, কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিকে, ফাঁসির রশিকে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর সামনে লজ্জিত হতে হবে, এমন কাজ তাঁরা করেননি। অন্যায়ের সামনে তাঁরা কখনো মাথানত করেননি।

যৌন উন্মাদ সেই নারীর কামনা-বাসনা পূরণ করতে হবে, নয় তো তাঁকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যেতে হবে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সামনে পথ খোলা ছিল দুটো। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি যত্নের সাথে ধৈর্যকেই

লালন করলেন। কারাগারকেই তিনি বেছে নিলেন। এই অবস্থায় নিপতিত হয়ে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম মহান আল্লাহর কাছে কি আবেদন করেছিলেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা ইউসুফের ৩৩-৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْ اِلَيْهِ–وَاِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَ هُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ–فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ–اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

ইউসুফ বললো, হে আমার রব! এরা আমার কাছ থেকে যে কাজ পেতে চায় তার তুলনায় কয়েদ হওয়া আমি অধিক পছন্দ করি। তুমি যদি এদের অপকৌশলগুলো আমার ওপর হতে দূরে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়বো ও জাহিলদের মধ্যে গণ্য হবো। তাঁর রব্ব তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং সেই স্ত্রীলোকদের কূট-কৌশলকে তাঁর কাছ হতে দূরে সরিয়ে দিলেন। নিশ্চিতই তিনি সবার কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন।

আল্লাহর কোরআন বলছে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম বিপদে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন, তুমি যদি এদের অপকৌশলগুলো আমার ওপর হতে দূরে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়বো ও জাহিলদের মধ্যে গণ্য হবো। তাঁর এই আবেদনের ধরণ থেকেই স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, এই সময় তিনি যে অবস্থার মধ্যে পরিবেষ্টিত ছিলেন, এই আয়াত কয়টি এই ঘটনার এক আশ্চর্যজনক চিত্র পেশ করেছে । উনিশ-বিশ বছর বয়সের এক সুদর্শন যুবক, যাযাবর জীবনের অবদানে এক অপূর্ব স্বাস্থ্যমন্ডিত দেহ আর ভরা যৌবনের অধিকারী তিনি। দারিদ্র্য, পরদেশ, আপন ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার ও যবরদস্তিমূলক দাসত্ব প্রভৃতি পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করে আসার পর ভাগ্য তাকে তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বাধিক সভ্যতা-সংস্কৃতিসম্পন্ন রাজ্যের রাজধানীতে এক বড় ধনবান ও পদাধিকারী ব্যক্তির ঘরে এনে পৌছিয়ে দিল।

এখানে এই ঘরের স্ত্রীলোকটির সাথে তার দিন-রাতের দেখা সাক্ষাতের ব্যাপার ছিল। প্রথমে-সেই নারীই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপর তার রূপ ও সৌন্দর্যের কথা গোটা রাজধানী শহরের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আর গোটা শহরের অভিজাত ও ধনবান পরিবারে নারীগণ তাঁকে দেখে আত্মহারা হয়ে যায়। এই সময় তাঁর

চতুর্দিকে অসংখ্য ছলনাময়ী জালের আকর্ষণ সব সময় এবং সব স্থানেই তাকে জড়াতে ব্যতিব্যস্ত থাকে। তার মনে আবেগ-উচ্ছ্বাসের বন্যা-প্রবাহ জাগিয়ে তোলার জন্য, তার আল্লাহ ভীতি ভেঙ্গে চুরমার করে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য সীমাহীন ষড়যন্ত্র–চেষ্টা-সাধানা চলতে থাকে।

যে দিকেই তিনি যান, সেই দিকেই দেখেন গোনাহ ও দুষ্কৃতি পূর্ণ চাকচিক্য ও জাঁক-জমক সহকারে তাকে গ্রাস করার জন্য দুয়ার খুলে অপেক্ষায় দন্ডায়মান। যাদের ভেতরে ঈমান নেই, তারা পৃথিবীতে পাপের পথ নিজেরা সন্ধান করে আর পাপ স্বয়ং তার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ঈমানদারকে সন্ধান করে ফিরতে থাকে। ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের জন্যেও তাই ঘটেছিল। পাপ অপেক্ষা করে আছে, যে মুহূর্তেই তার মনে অন্যায় ও পাপের প্রতি একবিন্দু ঝোক প্রবণতা দেখা যাবে, ঠিক তখনই সে নিজেকে সামনে পেশ করে দেবে। রাতদিন চব্বিশ ঘন্টাই তিনি এ ধরনের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাটাচ্ছেন। কোন এক মুহূর্তে তার ইচ্ছা-বাসনায় একবিন্দু শিথিলতা দেখা দিলেই অপেক্ষমান পাপের শত-সহস্র দরজার যে কোন একটাতে প্রবেশ করতে পারেন।

এ ধরনের অবস্থায় এমন ঈমানদার আল্লাহ-বিশ্বাসী নওজোয়ান যে সাফল্যের সাথে এ ধরনের শয়তানী আকর্ষণ ও প্রলোভনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন, তা কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। ধৈর্য কোন পর্যায়ে উপনীত হলে, সেই চরম মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করা যায়, তা ভাষায় ব্যক্ত করার বিষয় নয়–হৃদয় দিয়ে অনুভব করার বিষয়। আর ঈমান না থাকলে এ ধনের ধৈর্যও সৃষ্টি হয় না এবং বিষয়টি অনুভবও করা যায় না।

বিস্ময়কর আত্মসংযম

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের আত্মসংযমের এই বিস্ময়কর অভিব্যক্তির পরও আত্মচেতনা ও চৈত্তিক পবিত্রতার অতিরিক্ত অবদান এটাই ছিল যে, এতবড় একটি মারত্মক পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবার পরও তার হৃদয়ে কখনো কোন অহংকার জাগেনি। এ জন্য তিনি কখনো আত্মপ্রসাদ লাভ করেননি বা নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়ে আত্মম্ভরিতায় মেতে উঠেননি। কখনো এই গৌরব তার মনে জাগে নি যে, কত শত রূপসী যুবতী নারী আমার জন্য পাগলপারা, অথচ এরপরও আমার পদস্খলন ঘটেনি।

এই ধরনের অহংকার প্রকাশের পরিবর্তে তিনি বরং স্বীয় মানবীয় দুর্বলতার কথা চিন্তা করে কেঁপে কেঁপে উঠতেন আর বারবার বিনয় ও আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্র কাছে কাতর প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ্! আমি বড়ই দুর্বল মানুষ, এতসব আকর্ষণ ও প্রলোভনের হাতছানি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই; হে আমার প্রতিপালক! তুমিই আমাকে আশ্রয় দাও, তুমিই আমাকে বাঁচাও! কখনই যেন আমার পদস্খলন না ঘটে, এই ভয়ে কম্পমান আমি!

আসলে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের নৈতিক প্রশিক্ষণের এটা এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুকতম অধ্যায় ছিল। বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, পবিত্রতা, সত্যানুরাগ, ধৈর্য, সত্য পথে চলা, আত্মসংযম, মানসিক ভারসাম্য প্রভৃতি যেসব অসাধারণ গুণাবলী তার মধ্যে এতদিন পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল, এই কঠিন পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত হয়ে তা প্রকাশ হয়ে পড়লো। এমন কঠোর ও কঠিন পরীক্ষার সময়ে সেসব গুণাবলী উৎকর্ষিত হয়ে উঠে-পূর্ণ শক্তিতে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। ঈমান আনার পরে পরীক্ষা না এলে ঈমানদার অনুভব করতে পারে না, এই ঈমান তার ভেতরে কি কি গুণাবলী সৃষ্টি করে দিয়েছে। ঈমান আনার উপকারিতা কি, তা পরীক্ষায় নিমজ্জিত না হলে ঈমানদার অনুভব করতে পারে না। এ জন্য ঈমানদারের জন্য পরীক্ষা অনিবার্য।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন এবং তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে মহান আল্লাহ ঐ সকল নারীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে কারাগারের দরোজা তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে যাবতীয় অপকৌশল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন।

এভাবে হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের কারারুদ্ধ হওয়া ছিল মূলত তাঁর এক বিরাট নৈতিক বিজয় এবং মিশরের রাজন্যবর্গ ও শাসক শ্রেণীর লোকদের চরম নৈতিক পরাজয়ের চূড়ান্ত ঘোষণা। ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম কোন অপরিচিতি ও অজ্ঞাত-কুলশীল লোক ছিলেন না। সমগ্র দেশে-অন্তত রাজধানীতে সর্বশ্রেণীর লোকেরা তাঁকে জানতো ও চিনতো। বস্তুত যে ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি অধিকাংশ পদস্থ ও অভিজাত ঘরের নারীগণই ছিল পাগল প্রায়, যার রূপ-সৌন্দর্যের অগ্নি জ্বালায় নিজেদের ঘর-বাড়ি জ্বলে-পুড়ে ছারখার হতে দেখে মিশরের শাসক

শ্রেণী তাকে জেলে প্রেরণ করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত মনে করলো, এমন ব্যক্তির দেশ ব্যাপী পরিচিতি যে কতটা ব্যাপক ছিল, তা অনুমান করা যেতে পারে। তার সম্পর্কে যে মিশরের প্রতিটি নগরে, জনপদে আলোচনা হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ ছিল না। উপরন্তু এই লোকটি যে কত উন্নত, মজবুত ও নির্মল চরিত্রের মানুষ, সেটাও সবাই জেনে গিয়েছিল।

তারা এটাও জানতে পেরেছিল যে, লোকটিকে তার নীজের কোন অপরাধের কারণে কারারুদ্ধ করা হয় নি; বরং কারারুদ্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র এ জন্য যে, মিশরের রাজন্যবর্গ নিজেদের ঘরের নারীদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার তুলনায় এই নির্দোষ ব্যক্তিকে কারাগারে প্রেরণ করার সবচেয়ে সহজতম পথটি অবলম্বন করেছিল।

এ ঘটনা থেকে এ কথাও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে ইনসাফের শর্ত অনুযায়ী আদালতে অপরাধী প্রমাণ না করেই অকারণে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে রাখা বেঈমান ও স্বৈরাচারী শাসকদের অত্যন্ত প্রাচীন ও চিরন্তন রীতি। এ ব্যাপারেও বর্তমানের স্বৈরাচারী–গণতন্ত্রের আলখেল্লাধারী শাসকগণ চার হাজার বৎসর পূর্বের স্বৈরশাসকদের তুলনায় স্বতন্ত্র কিছু নয়। যদি কোন পার্থক্য সেকালের স্বৈরাচার আর এ কালের স্বৈরাচারের মধ্যে থেকেই থাকে, তা হলো শুধু এটুকু যে, সেকালের শাসকেরা গণতন্ত্রের' দোহাই দিত না আর একালের জালিম শাসকগণ তাদের যাবতীয় স্বৈরাচারী কর্মকান্ড বৈধ করার লক্ষ্যে গণতন্ত্রের লেবাস ব্যবহার করে। সেকালের স্বৈরশাসকগণ আইনের কোন মাধ্যম ব্যতিতই বে-আইনী কর্মকান্ড পরিচালিত করতো, আর বর্তমানের স্বৈরশাসকগণ তাদের প্রতিটি অবৈধ বাড়াবাড়ির 'বৈধতা' প্রমাণের জন্য পূর্বেই একটা আইন তৈরী করে নেয়। সেকালের স্বৈরশাসকগণ নিজেদের স্বার্থের জন্য সরাসরি লোকদের উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালাতো আর বর্তমানের স্বৈরশাসকগণ যার ওপর হামলা করে, তার সম্পর্কে প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে গোটা পৃথিবীকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এই লোকটির দ্বারা শুধু তাদের নয়, দেশ ও জাতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এক কথায়, সেকালের স্বৈরশাসকগণ শুধু জালিম ছিল আর বর্তমানের স্বৈরশাসকগণ জালিম তো বটেই সেই সঙ্গে মিথ্যাবাদী ও নির্লজ্জও।

কারাগারে রাতদিন

আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে কারাগারে বন্দী করা হলো। তাঁর অপরাধ, তিনি ঐসব নারীদের যৌবনের কামনা বাসনা পূরণ করেননি। তথাকথিত এই অপরাধে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার জন্য আল্লাহর নবীকে তারা বন্দী করেছিল। কারাগারের ভেতরেও তিনি নীরবে বসেছিলেন না। কারা কর্তৃপক্ষ ও সমস্ত কারাবন্দীদের কাছে তিনি আকাশের উজ্জ্বল সূর্যের মতই দেখা দিলেন। তাঁর ভেতরে মহান আল্লাহ যে গুণাবলী নিহিত রেখেছিলেন, জান্নাতের যে সুবাস দিয়ে দিয়েছিলেন, তা গোটা কারাগারকে আমোদিত করে তুলেছিল।

সেখানের সমস্ত বন্দী এবং কারা কর্তৃপক্ষের কাছে এক সময় তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হলেন। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে শিক্ষা দান করলেন, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের রব বা প্রতিপালক হতে পারে না। প্রতিপালক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যিনি সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। কারাগারের সমস্ত লোকজন তাঁর কাছে যে কোন সমস্যার সমাধান গ্রহণ করতেন। জটিল বিষয়ের সমাধানের জন্য তাঁর কাছেই তারা পরামর্শের জন্য ধর্ণা দিত।

তিনি কারা-জীবনে কিভাবে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতী কাজ করেছেন এবং তাঁর কারাগারের সাথীরা তাঁর কাছে পরামর্শ গ্রহণের জন্য কিভাবে আসতো এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ–قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّىْ اَرٰنِىْ اَعْصِرُ خَمْرًا–وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّىْ اَرٰنِىْ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِىْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ–نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ–اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ–قَالَ لَايَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا–ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ–اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ–وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَاۤءِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ–مَاكَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ–ذٰلِكَ

مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ-يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ-مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ-اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ-اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ-ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ-يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا-وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ-قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيَانِ-وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ -

কারাগারে তাঁর সাথে আরো দু'জন দাস প্রবেশ করেছিল। একদিন তাদের একজন তাকে বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি মদ প্রস্তুত করছি। অপরজন বললো, আমি দেখেছি যে, আমার মাথার ওপর রুটি রাখা আছে আর পাখি তা খাচ্ছে। উভয়েই বললো, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি বলুন, আমরা দেখছি আপনি একজন সৎ ব্যক্তি।

ইউসুফ বললো, এখানে তোমরা যে খাবার লাভ করো, তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিবো। আমার রব আমাকে যে জ্ঞান-ভান্ডার দান করেছেন, এটা সেই জ্ঞানেরই অংশ বিশেষ। প্রকৃত ব্যাপার হলো, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনা ও পরকালকে অস্বীকার করে, আমি তাদের নিয়ম নীতি পরিত্যাগ করেছি। আর আমার পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব প্রমুখের আদর্শ গ্রহণ করেছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতি ও সমস্ত মানবতার প্রতি এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যতীত আর অন্য কারো দাস বানাননি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাঁর শোকর আদায় করে না। হে কারাগারের বন্ধুরা আমার! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো না সেই এক আল্লাহ যিনি সব কিছুর ওপরে বিজয়ী—মহাপরাক্রমশালী।

তাকে ত্যাগ করে তোমরা যাদের দাসত্ব করো, তারা কয়েকটি নাম ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছো। আল্লাহ্ এদের পক্ষে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। বস্তুত সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্য নয়। তাঁর আদেশ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা আর কারো দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। এটাই সঠিক ও খাঁটি জীবন-যাপন পন্থা, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

হে কারাগারের বন্ধুরা আমার! তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তোমাদের একজন নিজের প্রভু (মিশর অধিপতি)-কে শরাব পান করাবে। আর আরেকজনকে শূলে চড়ানো হবে। আর পাখি তার মাথার মগজ ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খাবে। তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলে, তার ফয়সালা হয়ে গেল। (সূরা ইউসুফ-৩৬-৪২)

হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামকে যখন বন্দী করা হয়, তখন তার বয়স সম্ভবত কুড়ি-একুশ বৎসরের বেশি ছিল না। আল্লাহর কোরআনের বর্ণনা হলো, 'উভয়েই বললো, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি বলুন, আমরা দেখছি আপনি একজন সৎ ব্যক্তি।' জেলখানায় ইউসূফ আলায়হিস্ সালামকে কি দৃষ্টিতে দেখা হত, এই কথা থেকে সে সম্পর্কে ধারণা করা যায়। উপরে যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তা সম্মুখে রেখে বিবেচনা করলে এ সম্পর্কে আশ্চর্য বোধ হয় না যে, এরা ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের কাছেই কেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইতে এসেছিল এবং 'আমরা দেখছি আপনি একজন সৎ লোক' বলে তাঁর খেদমতেই বা কেন এত ভক্তি-শ্রদ্ধা পেশ করলো।

কারণ কারাগারের ভেতরের ও বাইরের সব লোকেরই জানা ছিল যে, এই ব্যক্তি কোন অপরাধ করে জেলে আসেন নি; বরং তিনি একজন সদাচারী ও পবিত্র চরিত্রের লোক। অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়ও তিনি নিজের পবিত্রতা ও খোদাভীরুতার প্রমাণ দিয়েছেন। একালে সমগ্র দেশে তাঁর অপেক্ষা পবিত্রতর ব্যক্তি একজনও নাই। এমনকি দেশের ধর্ম-নেতাদের মধ্যেও তাঁর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ কারণে কেবল কয়েদীরাই যে তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো তাই নয়, বরং জেলখানার অফিসার ও কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তীতে এই লোক দু'জনের ভেতরে একজনের অর্থাৎ খাদ্য বিভাগের প্রধানের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল এবং মদ পরিবেশনকারী তার পূর্ব পদে বহাল

হয়েছিল। স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার পূর্বে ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম যে ভাষণ দিলেন, তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া এই সুদীর্ঘ কাহিনীর মূল প্রাণবস্তুই হলো তাঁর সেই ভাষণ। আর স্বয়ং কোরআনে উল্লেখিত তওহীদ সংক্রান্ত ভাষণগুলোর মধ্যেও এটা অতি উত্তম সম্পদ। কোরআন আমাদেরকে জানায় যে, ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের ছিল নবী-জনোচিত এক 'মিশন' এবং এর দাওয়াত ও প্রচার কাজ তিনি জেলখানা থেকেই শুরু করেছিলেন।

কারাগারে দাওয়াতী কাজ

ময়দানে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে আগ্রহী, তাদেরকে অবশ্যই এই ঘটনাটি সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা-বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় এবং এ থেকে আন্দোলনের উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র কাহিনী শোনানোর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এ ঘটনা কোরআনে বর্ণনা করেননি। এর একাধিক দিক এমন রয়েছে, যে সম্পর্কে গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা-গবেষণা করলে এমন কতকগুলো দিক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, যা অবগত হওয়া আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

সেদিকগুলো হচ্ছে, এই প্রথমবার আমরা হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামকে সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিতে দেখতে পাই। এর পূর্বে তাঁর জীবন কাহিনীর আর যেসব দিক কোরআন মজীদ উজ্জ্বল রূপে আমাদের সম্মুখে পেশ করেছে, তাতে আমরা শুধু তাঁর উন্নত চরিত্রের বিভিন্ন পর্যায়ই উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু তাতে ইসলাম প্রচার ও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কোন চিহ্নই আমরা দেখতে পাইনি। এটা হতে বুঝা যায় যে, তাঁর জীবনের প্রাথমিক পর্যায়গুলো নিছক প্রস্তুতি ও আত্মগঠনের মধ্যে সীমিত ছিল। নবুয়্যাতের দায়িত্ব এই কয়েদখানার পর্যায়েই তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়। আর নবী হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম দাওয়াতী ভাষণ।

নিজের মূল পরিচয়ও তিনি এই প্রথমবার লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন। এর পূর্বে আমরা দেখতে পাই, তিনি অত্যন্ত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে সম্মুখে আসা যে কোন অবস্থাকেই অকুণ্ঠিত চিত্তে কবুল করেছেন। কাফেলার লোকেরা যখন তাকে ধরে নিয়ে গোলাম বানালো, যখন তিনি মিশরে আনিত হলেন, যখন তাঁকে আযীযে-মিশর-এর কাছে বিক্রি করা হলো, যখন তাঁকে

কারাগারে বন্দী করা হলো-এর কোন একটা পর্যায়েও তিনি নিজেকে ইবরাহীমের প্রপৌত্র ও ইসহাক আলায়হিস্ সালামের পৌত্র ও ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের পুত্র ছিলেন বলে কোন পরিচয়ই দেননি। তাঁর বাপ-দাদা কোন অপরিচিত লোক ছিলেন না। কাফেলার লোক মাদিয়ানবাসীই হোক কি ইসমাঈলী, তারা উভয় পরিবারের সাথেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

মিশরের লোকেরাও অন্তত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল না, বরং ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম যে ভংগীতে তাঁর ও ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম ও ইসহাক আলায়হিস্ সালামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করছেন, তাতে অনুমান করা যায় যে, এই তিন মহান ব্যক্তির খ্যাতি মিশর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম বিগত চার পাঁচ বছর যাবৎ যেসব দুরাবস্থায় পরিবেষ্টিত হয়ে ছিলেন কখনো নিজের বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে সেসব হতে মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করেননি। সম্ভবত তিনি নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যা কিছু বানাতে চান সে জন্য এই ধরনের বিচিত্র অবস্থার মধ্যে থেকে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে নিছক দ্বীনের দাওয়াত ও তবলীগের খাতিরে তিনি এই মহাসত্য উদঘাটন করলেন যে, তিনি কোন নতুন ও অপরিচিত দ্বীন পেশ করছেন না; বরং হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের পরিচালিত তওহীদের দাওয়াত ও প্রচার কার্যের বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের সাথেই তাঁর সম্পর্ক।

এ ধরনের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন এই জন্য দেখা দিয়েছিল যে, সত্যের আহ্বানকারী-অতীতে কখনোই কেউ জানতে পারে নি এমন নতুন কথা আমি পেশ করছি বলে কখনো দ্বীনের দাওয়াত প্রচার শুরু করেন না; বরং প্রথম কদমেই এই কথা তিনি প্রকাশ করে দেন যে, অতীতের সব কালে ও সব যুগেই সত্যপন্থী লোকেরা যেদিকে আহ্বান জানিয়ে এসেছেন তিনি সেই শাশ্বত চিরন্তন মহাসত্যের দিকেই লোকদের আহ্বান জানাচ্ছেন।

ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম যেভাবে তাঁর দাওয়াত পেশ করার সুযোগ বের করেছিলেন তাতে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত প্রচারের এক চমৎকার কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। অবস্থা এই ছিল যে, দুইজন লোক তাঁর কাছে স্বপ্নের কথা বলে-নিজেদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রমাণ দিয়ে তাঁর কাছে এর ব্যাখ্যা

জানতে চায়। জবাবে তিনি বলেন, স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো আমি তোমাদের বলবোই; কিন্তু আমি যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলবো তা কোন্ উৎস হতে পাওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তা পূর্বেই জেনে নাও।'

এভাবেই তিনি তাদের কথার মধ্য হতেই কথা বলার সুযোগ বের করে তাদের সম্মুখে দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপন শুরু করলেন। এই বিষয় থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, কারো মনে যদি সত্যই ইসলামী আন্দোলনের প্রচারের আগ্রহ বর্তমান থাকে এবং এর কৌশলও তার জানা থাকে, তাহলে সে অতি সহজেই কথার ধারাবাহিকতাকে খুব সুন্দরভাবে নিজের কথার দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে। আর যার মনে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার কোন চিন্তা বা আগ্রহই নেই, তাদের সম্মুখে সুযোগের পর সুযোগ এসে চলে যায়; বিরাট বিরাট মাহফিলে তারা বক্তা হিসেবে যান, কিন্তু সেটাকে নিজের কথা বলার সুযোগ হিসেবে কখনো গ্রহণ করেন না। এমন ধরনের বক্তৃতা তারা করেন যে, নিজেরা কি বলছেন তাও তারা জানেন না এবং শ্রোতাদেরকে কোনদিকে নিয়ে যেতে চান, সে লক্ষ্যও তাদের থাকে না।

পক্ষান্তরে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে যে প্রচার করতে আগ্রহী হয়, সে তো সুযোগের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে থাকে আর সে সুযোগ এলেই নিজের কাজ শুরু করে দেয়। অবশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির সুযোগ সন্ধান আর নির্বোধ লোকের অমার্জিত প্রচার-সময় জ্ঞান এবং উপযুক্ত পরিবেশের জ্ঞান যাদের নেই, মসজিদে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে, রাস্তা-পথে যে কোন পরিবেশে, কার মন-মানসিকতা কেমন আছে তার প্রতি গুরত্ব না দিয়ে দাওয়াত দেয়া শুরু করে–এই দুইয়ের মাঝে শত যোজন পার্থক্য রয়েছে। এই শেষোক্ত লোকেরা সময় ও সুযোগের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য না রেখেই লোকদের কানে জোরপূর্বক নিজের দাওয়াত ঠেসে দেয়ার চেষ্টা করে এবং এভাবে ইসলাম প্রচারের নামে লোকদের মধ্যে অযথা মতপার্থক্য সৃষ্টি ও বাকবিতন্ডা সৃষ্টি করে উল্টো ইসলামের প্রতিই তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ বানিয়ে দেয়।

এ ঘটনা থেকে লোকদের কাছে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত প্রচারের সঠিক পদ্ধতি কি হতে পারে, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত ইউসূফ প্রথমেই দ্বীনের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি পেশ করতে শুরু করেন নি; বরং লোকদের সামনে তিনি দ্বীনের সেই মূল সূচনা বিন্দুর কথাই পেশ করেন যেখান থেকে সত্য দ্বীনের পথ বাতিল পন্থা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে যায়। এই সূচনা বিন্দুটি হলো

তওহীদ ও শিরকের মধ্যকার পার্থক্য। এমনকি এই পার্থক্যকেও তিনি এমন যুক্তিসংগত পন্থায় স্পষ্ট করে তোলেন যে, সাধারণ বুদ্ধির কোন লোকই তা অনুভব না করে থাকতে পারবে না। বিশেষত এই সময় যাদের লক্ষ্য করে তিনি কথা বলছিলেন, তাদের মন-মগজে তো এই কথাটি তীরের মত বসে গিয়েছিল। কেননা তারা ছিল চাকরিজীবি গোলাম আর তারা এই কথা মর্মে মর্মে অনুভব করছিল যে, একজন মনিবের গোলাম হওয়া অনেক মনিবের গোলাম হওয়া অপেক্ষা ভালো। অনুরূপভাবে তারা আরো উপলব্ধি করছিল যে, বান্দাহদের বন্দেগী করা অপেক্ষা গোটা জাহানের মালিক ও মনিবের গোলামী করাই অধিক কল্যাণকর।

ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম এখানে শ্রোতাদেরকে নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করতে ও তাঁর ধর্ম অবলম্বন করতেও বলেননি। তাঁর দাওয়াত দেয়ার ভঙ্গি ছিল বড়ই বিস্ময়কর ধরনের। তিনি লোকদেরকে বলেন, চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ্ আমাদের প্রতি কত বড় অনুগ্রহ করেছেন। তিনি কেবল নিজের ছাড়া আমাদেরকে আর কারোই বান্দাহ বানান নি; কিন্তু লোকেরা তাঁর শোকর করে না; বরং শুধু শুধুই তারা মনগড়াভাবে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নেয় ও সেগুলোরই দাসত্ব করে। এমন কি তিনি শ্রোতাদের ধর্মমতেরও সমালোচনা করেন; কিন্তু তা করেন খুবই বুদ্ধিমত্তা সহকারে। তাতে কারো মনে একবিন্দু কষ্ট দেয়ার নীতি তিনি গ্রহণ করেননি।

তিনি শুধু এটুকুই বলেন যে, এই যে সব মাবুদকে তোমরা অন্নদাতা, নিয়ামতদাতা, দুনিয়ার মালিক, ধনসম্পদের প্রভু, বা রোগ-স্বাস্থ্যের নিয়ামক ইত্যাদি বলে অভিহিত করো, এ সবই অন্তঃসারশূন্য নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নামগুলোর পেছনে কোন প্রকৃত অন্নদাতা, অনুগ্রহকারী মালিক ও প্রতিপালক বলে কারো কোন অস্তিত্ব নেই। আসলে সবকিছুরই মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, যাকে তোমরা ও বিশ্বভুবনের সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী বলে মানো। তিনি অপর কারো জন্য প্রভু, উপাস্য বা মাবুদ হওয়ার কোন সনদই নাযিল করেন নি। জগত পরিচালনার সমস্ত অধিকার ও ইখতিয়ার তিনি নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। তাঁর নির্দেশই এই যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কারোই বন্দেগী করবে না।

এভাবে আল্লাহ্র নবী হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের জীবনের মূল্যবান প্রায় দশটা বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিনগুলো পার হয়ে গেছে। কারাগারে

তিনি নিশ্চুপ বসে থাকেননি। ইসলামী আদর্শ কারা-কর্তৃপক্ষ এবং বন্দীদের মাঝে প্রচার করেছেন। তাদেরকে আল্লাহর গোলামী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর জমিনে যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বা এই আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত, তাঁরা যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, মুহূর্ত কালের জন্য ও তাঁরা তাদের দায়িত্ব হতে গাফিল হন না।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর রহমতের ওপরে নির্ভরশীল ছিলেন, তিনি ধৈর্যহারা হননি। সমস্ত পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন তারপরে কারাগার হতে তাকে সম্মানের সাথে বের করে এনেই মহান আল্লাহ তাকে দেশের শাসকের পদে আসীন করেছিলেন।

ফুল যেখানেই ফোটে তার আপন সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ সে ফুলের সৌরভ অনুভব করে। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে মহান আল্লাহ সে যুগের সুগন্ধ যুক্ত ফুল হিসেবেই শুধু প্রেরণ করেননি, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে সেই ইউসুফ নামক ফুল হতে সুগন্ধি গ্রহণ করবে। সে ফুল যুগ যুগান্তরে সৌরভ ছড়াবে। সে ফুল আজ পৃথিবীতে নেই, কিন্তু তাঁর বিখ্যাত সেই সুবাস রয়ে গেছে এবং থাকবে।

আমি সুবাস অনুভব করছি

শুধু ইউসুফ আলাইহিস্ সালামই নন, তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই, তিনিও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হননি, সবচেয়ে প্রিয় সন্তানকে হারিয়েও তিনি এতটুকু ধৈর্যহারা হননি। মানুষের কাছে তিনি তাঁর হৃদয়ের ব্যথা বেদনা প্রকাশ করেননি। আল্লাহর কাছেই তিনি আবেদন পেশ করেছিলেন। তিনি তাঁর অন্যান্য ছেলেদের কি বলেছিলেন, কোরআন আমাদেরকে শোনাচ্ছে–فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ আমি সর্বোত্তম ধৈর্য ধারণ করবো (সূরা ইউসুফ-১৮)

তিনি তাঁর অন্যান্য সন্তানদেরকে বলেছিলেন, আমি আমার মনের যন্ত্রণার কথা এক মাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছেই করছি না এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হচ্ছি না। তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় শুধু তারাই যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। সূরা ইউসুফের ৮৬ নং আয়াতে হযরত ইয়াকুব সম্পর্কে বলা হয়েছে–

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ-يٰبَنِيَّ اذْ هَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلاَتَا يْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ-اِنَّهُ لاَيَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ-

আমি আমার দুঃখ ও ব্যথার আবেদন আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো কাছেই করছি না। আর আল্লাহর কাছ হতে আমার যা জানা আছে তা তোমাদের নেই। হে আমার ছেলেরা ! তোমরা গিয়ে ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের সন্ধান করো। আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। তাঁর রহমত হতে নিরাশ হয় শুধু কাফেররাই।

হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম বয়সের একটা প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি একেবারে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের অন্যান্য ভাইগণ খাদ্যের সন্ধানে মিশরে যেতে বাধ্য হলেন, এক পর্যায়ে যখন তাঁর সাথে ভাইদের পরিচয় হলো, তখন তিনি মিশরের শাসক। ভাইদেরকে তিনি কোন শাস্তি দেননি এমনকি কোন কটু কথাও বলেননি। তাদের কাছ থেকে তিনি যখন শুনলেন, পিতার দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গিয়েছে। তখন ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম পিতার জন্য নিজের শরীর মোবারকের জামা তাঁর ভাইদেরকে দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা এই জামা আব্বার চেহারার ওপর রাখলেই আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর হারানো দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে। তখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর পবিত্র জামা নিয়ে মিশর হতে বাড়ির পথে অর্থাৎ কেনআনে যাত্রা করেছিল।

মিশর এবং কেনআন, এই দুইটি দেশের মাঝে বেশ ব্যবধান। তবুও মহান আল্লাহ তাঁর কুদরতী ব্যবস্থার মাধ্যমে ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের শরীরের গন্ধ ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের নাসারন্ধ্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এই অনুভূতির কথা প্রকাশ করতেই তাঁর পরিবারের লোকজন তাচ্ছিল্য ভরে বলেছিল, এটা আপনার মনের কল্পনা। যেদিন থেকে ইউসুফ হারিয়ে গেছে, সেদিন হতে আপনি তাঁ সম্পর্কে চিন্তা করছেন। সেই চিন্তা আপনাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, আপ এখন পর্যন্ত আশায় আছেন, ইউসফ একদিন ফিরে আসবেই। এটা আপনার সেং

পুরনো কল্পনা। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলেছেন–

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلاَ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ-قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ- فَلَمَّآ اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِه فَارْتَدَّ بَصِيْرًا-قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ-اِنِّىْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ-قَالُوْا يٰاَبَانَا اسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ-قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ-اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ-

এই কাফেলা যখন (মিশর হতে) যাত্রা করলো, তখন তাদের পিতা (কেনানে বসে) বললো, আমি ইউসুফের সুবাস অনুভব করছি। তোমরা যেন বলে না বসো যে আমি বয়সের কারণে দিশাহারা হয়ে পড়েছি। ঘরের লোকজন বললো, আল্লাহর কসম ! আপনি এখনো আপনার সেই পুরনো ভুলেই নিমজ্জিত আছেন। তারপর যখন সুসংবাদ বহনকারী এসে পৌছলো, তখন সে ইউসুফের জামা ইয়াকুবের মুখের ওপর রাখলো আর সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে এলো।

তখন সে বললো, আমি না তোমাদেরকে বলছিলাম, আমি আল্লাহ্র কাছ হতে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না। সবাই বলে উঠলো, আব্বাজান! আপনি আমাদের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন। আমরা সত্যই অপরাধী। সে বললো, আমি আমার রব-এর কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা ইউসুফ-৯৪-৯৮)

আমি ইউসুফের সুবাস অনুভব করছি– ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের এই কথা হতে নবী-রাসূলদের অসাধারণ শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কাফেলা ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের জামা নিয়ে সবেমাত্র মিশর হতে রওয়ানা করলো আর এই দিকে শত শত মাইল দূরত্বে থেকে ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম আপন সন্তান ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের শরীরের 'সুবাস' পাচ্ছেন।

সেই সঙ্গে এ কথাও জানতে পারা যায় যে, নবী-রাসূলের এই শক্তি তাঁদের নিজস্ব ও স্ব-উপার্জিত নয়; এটা একান্তভাবে আল্লাহ্র দান। আল্লাহ্ই দান করেছেন বলে

তারা এই শক্তির অধিকারী হয়েছেন। আর আল্লাহ্ যখন যে পরিমাণ চান, তাদেরকে সেই শক্তি কাজে লাগানোর সুযোগ দেন। ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম অনেক বছর ধরে মিশরে রয়েছেন; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম তাঁর কোন গন্ধ অনুভব করলেন না। কিন্তু সহসাই অনুভূতি-শক্তি এত বেশী তীব্র হয়ে উঠলো যে, তাঁর জামা নিয়ে মিশর হতে রওয়ানা হতেই তিনি বাড়িতে বসেই ইউসুফ আলায়হিস্ সালামেরর সুবাস লাভ করতে শুরু করলেন। ঘরের লোকজন বললো, আল্লাহর কসম! আপনি এখনো আপনার সেই পুরনো ভুলেই নিমজ্জিত আছেন–এই কথাগুলো ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের পরিবারের লোকজনের।

তাদের কথার ধরণ দেখে মনে হয় যে, গোটা পরিবারে হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম ছাড়া আর কেউ পিতার মর্যাদা ও মূল্য বুঝতো না এবং হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম নিজেও তাঁর পরিবারের লোকদের মানসিক ও নৈতিক হীনতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান করে যাচ্ছিলেন।

পক্ষান্তরে যে ঘরের প্রদীপের আলো বাইরের জগতকে আলোকোদ্ভাসিত করে তুলছিল; কিন্তু স্বয়ং সে ঘরের লোকেরা ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। আর তাদের দৃষ্টিতে সে 'প্রদীপ' এক টুকরা কয়লার অধিক কিছু নয়। প্রকৃতির এই নির্মম পরিহাসের সাথে ইতিহাসের প্রায় সকল বড় বড় ব্যক্তিত্বেরই সাক্ষাত ঘটেছে।

এই পৃথিবীতে মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য যারা আগমন করেছেন, নবী ও রাসূলদের অবর্তমানে যারা ইসলামী মিশনকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য যারা অক্লান্ত শ্রম দান করছেন, আগামীতেও করবেন, ইসলামকে ময়দানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা নিজের ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দান করতেও কুণ্ঠাবোধ করবেন না, তাদের অধিকাংশের পরিবারের লোকজনের অবস্থা হলো, তারা সত্য পথ অবলম্বন করতে আগ্রহী হয় না।

অথচ তাদের ঘরের ভেতরেই মহাসত্যের মশাল আলো বিকিরণ করতে থাকে। যেমন ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের কয়েকজন সন্তান, তাদের পিতা এবং ভাই হলেন আল্লাহর নবী। কিন্তু তারা সেই পিতার কাছ থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে নিজেদেরকে পূর্ণ মুসলিমে পরিণত করতে পারেনি।

এখানে এ কথাও চরম সত্য যে, অধিকাংশ নবীগণ যখন দায়িত্ব পালনের নির্দেশ লাভ করেছেন, তখন তারা অবিবাহিত বা সন্তান-সন্ততি হীন ছিলেন না। তাদের সন্তান-সন্ততিও নির্দিষ্ট একটা বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ফলে পরিবার গঠনের শুরু থেকেই তাদেরকে আল্লাহর আইন পালনে অভ্যস্থ্ করার কোন সুযোগ ছিল না। তবুও নবীগণ তাদের সন্তানদের পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যেন তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে।

বর্তমানে পরহেজগার হিসেবে পরিচিত এমন কিছু লোকজন দেখা যায়, যাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী। তাদের সন্তান কেন এমন হলো, এ প্রশ্ন তাদের কাছে করলে তারা নবীদের সন্তানদের উদাহরণ পেশ করে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার প্রয়াস পায়। কিন্তু পারিবারিক জীবন গঠন করার পূর্বেই যিনি ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়েছেন, তিনি তো তার পরিবারে ইসলামী পরিবেশ বিরাজ করে এমন ধরনের ব্যবস্থা প্রথম থেকেই গ্রহণ করবেন। যেন সেই পরিবারে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে আগমন করেই আল্লাহ ও তাঁর রাসলকে চিনতে পারে। ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

কিন্তু অধিকাংশ লোকজন এ দায়িত্ব পালন করেন না। ফলে তাদের সন্তান-সন্ততি ইসলামী আন্দোলন থেকে বিরত থাকে। সন্তানকে তারা শিশু বয়স থেকেই সাথে নিয়ে আন্দোলনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিয়ে তাদেরকে অভ্যস্থ্ করে তুলেন না। এমনকি অনেকে মসজিদেও সাথে করে নিয়ে যান না। শিশু বয়স থেকে শিশুকে যে কাজে অভ্যস্থ্ করে তোলা হয়নি, ইসলাম বিরোধী এই পরিবেশে তারা বড় হয়ে ইসলামী আন্দোলন পছন্দ করবে কিভাবে? এ কথা ভালোভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, এসব সন্তানদের পিতা নবীদের সন্তানদের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

প্রচণ্ড ধ্বনি এসে পাকড়াও করলো

শুআইব আলায়হিস্ সালাম যখন নিজ জাতির প্রতি প্রেরিত হলেন, যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী এবং পাপানুষ্ঠান শুধু গুটিকতক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং গোটা জাতিই ধ্বংসের ঘূর্ণিপাকে আক্রান্ত ও লিপ্ত রয়েছে। তারা নিজেদের অসৎ কর্মে এতই মত্ত রয়েছে যে, মুহূর্তের জন্যও তাদের এই অনুভূতি হতো না, তাদের কৃতকার্যসমূহ নাফরমানী এবং গুণাহের কাজ; বরং তারা তাদের ঐ কার্যকসমূহকে গর্বের বিষয় বলে মনে করতো। তাদের ভুরিভুরি অসৎ চরিত্রতার কাজ এবং নাফরমানীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করলেও শুধু যে সমস্ত মন্দ কার্য বিশেষভাবে তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তা এই যে, মূর্তিপূজা ও মুশরেকী রীতিনীতি এবং ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে নিজে পূর্ণ মাত্রায় মেপে নেয়া এবং অপরকে দিতে হলে ওযনে কম দেয়া ও সমস্ত লেন-দেনের ব্যাপারেই কৃত্রিমতা এবং ডাকাতি।

কোরআন মজীদ বলে, নাফরমানী এবং অবাধ্যতার প্রতিফলে হযরত শুআইব আলায়হিস্ সালামের জাতির ওপর দুই প্রকারের আযাব এসে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেললো। একটি ভূ-কম্পনের আযাব এবং দ্বিতীয়টি অগ্নিবৃষ্টি। যখন তারা নিশ্চিন্তে নিজ নিজ গৃহে আরাম করছিল, তখন অকস্মাৎ এক ভয়ঙ্কর ভূ-কম্পন আরম্ভ হলো এবং এই ভয়ঙ্কর অবস্থা শেষ হতে না হতেই ওপর হতে অগ্নি বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল। ফল এই দাঁড়ালো যে, সকালে দিনের আলোয় দর্শকেরা দেখতে পেলো যে, গতকল্যের অবাধ্য এবং অহংকার আজ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য এ সমস্ত কাহিনী পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। হযরত শুআইব আলায়হিস্ সালামের জাতির ইতিহাস মহান আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন−

وَإِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا-قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ-وَلاَ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّىْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ-وَيٰقَوْمِ اَوْفُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ-

আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠালাম। সে বললো, হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহর দাসত্ব কবুল করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। আর ওযন ও পরিমাপে কমতি করো না। আজ আমি তোমাদেরকে ভালো অবস্থায়ই দেখছি। কিন্তু আমার ভয় হয়, কাল তোমাদের ওপর এমন দিন আসবে, যার আযাব তোমাদের সবাইকে ঘিরে ধরবে। আর হে আমার জাতির ভাইয়েরা! ঠিক ঠিক ইনসাফ সহকারে পূর্ণ ওযন ও পরিমাপ করো। আল লোকদের জিনিসে কোনো ধরনের ঘাটতির সৃষ্টি করো না এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িয়েও না। (সূরা হুদ-৮৪-৮৫)

হযরত শুআইব আলায়হিস্ সালামের জাতি তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁকে বিদ্রূপ করে বললো-

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰؤُا-اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ-

হে শু'আইব! তোমার নামায কি তোমাকে এটাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা এই সব উপাস্যদের পরিত্যাগ করবো, যাদের পূজা-উপাসনা আমাদের বাপ-দাদারা করতো? অথবা এই যে, আমাদের ইচ্ছামত ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ করার ইখতিয়ার থাকবে না? শুধু তুমিই তো একজন বড় আত্মার ও সৎ ব্যক্তি থেকে গেলে! (সূরা হুদ-৮৭)

অবশেষে আল্লাহর নবী হযরত শুআইব আলায়হিস্ সালাম তাঁর অবাধ্য ও পাপাচারে লিপ্ত জাতিকে জানিয়ে দিলেন-

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ-

হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা নিজেদের পন্থায় কাজ করতে থাকো আর আমি আমার পথে কাজ করতে থাকবো। খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনার আযাব আসছে আর কে মিথ্যাবাদী। তোমরাও অপেক্ষা করো আর আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় রইলাম। (সূরা হুদ-৯৩)

এরপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অবাধ্য ও নাফরমান বান্দাদেরকে ভয়ঙ্কর গযব দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ-كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا-اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ-

শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়সালার সময় এসে পৌছলো, তখন আমি আমার রহমত দ্বারা শু'আইব ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে রক্ষা করলাম। আর যারা জুলুম করেছিল তাদেরকে এমন এক প্রচণ্ড ধ্বনি এসে পাকড়াও করলো যে, তারা নিজেদের বসতির স্থানে নির্জীব নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলো, মনে হচ্ছিল যেন তারা সেখানে কোন দিন বসবাসই করেনি। শোন! মাদইয়ানবাসীকেও দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে, যেমনিভাবে সামুদকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (সূরা হুদ-৯৪-৯৫)

সলিলে ভাসমান শিশু

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, ফেরআউন একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছিল, দরবারের জ্যোতিষী ও গণৎকারেরা সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিল, আপনার রাজত্ব ও ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাবে এমন এক লোকের দ্বারা, যে লোক জন্মগ্রহণ করবে ইসরাঈলীদের ভেতরে। কিবতীদের যে শাসকদল মিশরে ক্ষমতায় ছিল, তারা যে ইসরাঈলী পুত্র সন্তানদের জন্য মারাত্মক হুমকী ছিল এতে সন্দেহ নেই। এ কারণেই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের মা তাঁকে জন্মগ্রহণ করার পরপরই একটা সুসংরক্ষিত সিন্দুক জাতিয় বাক্সের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

আর এ কাজটা তিনি তাঁর নিজের চিন্তাধারা অনুসারে করেননি। মহান আল্লাহই তাঁর মনের ভেতরে এই ধরনের চিন্তাধারার উদয় করে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যখন এই ধরনের ইশারা কোন সৃষ্টির প্রতি করা হয় তখন শরিয়তের পরিভাষায় তাকে ইলহাম বলা হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে মহান আল্লাহ সূরা কাসাস-এর ৭ নং আয়াতে বলেন–

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ-فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ-اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ-

আমি মূসার মা'কে ইশারা করলাম, একে স্তন্যদান করো, তারপর যখন এর প্রাণের ভয় করবে তখন একে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে এবং কোন ভয় ও দুঃখ করবে না, তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রাসূলদের মধ্যে শামিল করবো।

فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا-اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ-وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ-لَا تَقْتُلُوْهُ-عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ-وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا-اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ-فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ-وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ-فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ-

শেষ পর্যন্ত ফিরআউনের পরিবারবর্গ তাকে দরিয়া হতে উঠিয়ে নিল, যেন সে তাদের শত্রু এবং তাদের দুঃখের কারণ হয়। যথার্থই ফিরআউন, হামান ও তার সৈন্যবাহিনী তাদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ছিল ভয়ংকর অপরাধী। ফিরআউনের স্ত্রী বললো, এ শিশুটি আমার ও তোমার চোখ জুড়িয়েছে। সুতরাং একে হত্যা করো না, বিচিত্র কি সে আমাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসাবেই গ্রহণ করতে পারি, আর তারা এর পরিণাম অবগত ছিল না। ওদিকে মূসার মায়ের মন অস্থির হয়ে পড়েছিল।

সে তার রহস্য প্রকাশ কের দিতো যদি আমি তার মন সুদৃঢ় না করে দিতাম, যেন সে আমার ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের একজন হয়। সে শিশুর বোনকে বললো, এর পিছনে পিছনে যাও। অতএব সে তাদের (শত্রুদের) অজ্ঞাতসারে তাকে দেখতে থাকলো। আর আমি পূর্বেই শিশুর জন্য স্তন্য দানকারিনীদের স্তন পান হারাম করে রেখেছিলাম। (এ অবস্থা দেখে) সে মেয়েটি তাদেরকে বললো, আমি তোমাদের এমন পরিবারের সন্ধান দিতে পারি যারা এর প্রতিপালনের দায়িত্ব

গ্রহণ করবে এবং কল্যাণকামী হবে। এভাবে আমি মুসাকে তাঁর মায়ের কোলে ফিরিয়ে আনলাম, যেন তার চোখ শীতল হয়, সে দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয় এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য বলে জেনে নেয়। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ কথা জানে না। (সূরা কাসাস-৭-১৩)

এই সূরা কাসাসের প্রথম দিকেই সে সময়ের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করতে হবে আর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে রেখে দিতে হবে–এটাই ছিল সে সময়ে শাসকদের নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন, এই শিশুটিকে তারা তো উঠিয়ে নিল প্রকৃত পক্ষে তারা এই শিশুকে উঠলো না, ফিরআউনের পরিবার ফিরআউনের ধ্বংসের বীজ তখন হতেই বপন করলো। তারা যখন সেই শিশুটিকে সাগর হতে উঠিয়ে নিয়ে রাজ প্রাসাদে নিয়ে গেল এবং ফিরআইনের স্ত্রী সেই শিশু সম্পর্কে যে কথাবার্তা বলেছিল, তা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কথাবার্তা হতে যে চিত্র ভেসে ওঠে তাহলো, ফিরআউনের প্রাসাদ ছিল সাগরের ধারে অথবা সে সময়ে ফিরআউন তার স্ত্রীকে নিয়ে সাগরের ধারে ভ্রমণ করছিল।

সিন্দুক বা ঝুড়ি সাগরে ভাসতে ভাসতে যখন ফিরআউনের প্রাসাদের কাছে চলে আসে তখন তারা তা দেখতে পেয়ে কৌতুহলী হয়ে ওঠে এবং সেটা উঠিয়ে আনার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। রাজপরিবারের দাস-দাসীরা আদেশ পেয়ে সিন্দুক উঠিয়ে বাদশাহ ও তার বেগমের সামনে প্রদর্শন করে। সিন্দুক বা ঝুড়ির ভেতরে একটা শিশু রাখা আছে দেখতে পেয়ে এ ধারণা করা স্বাভাবিক যে, এই শিশু অবশ্যই কোন ইসরাঈলী সন্তান হবে। কারণ ইসরাঈলী জনবসতীর দিক হতেই সেটা ভেসে আসছিল এবং সে সময়ে ইসরাঈলী পুত্র সন্তানদেরকে হত্যার আদেশ জারী করা হয়েছিল।

সুতরাং ইসরাঈলীদের সম্পর্কেই এই ধারণা করা যেতে পারে যে, এই সন্তান তাদেরই কোন পরিবারের এবং এ সন্তানকে তারা গোপনে কিছুদিন লালন-পালন করেছে, তারপর যখন তারা বুঝেছে যে, শিশুর বিষয়টা আর গোপন রাখা যাবে না, তখন এ আশায় তাকে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কারো চোখ এটা পড়বে এবং তারা এটাকে উঠিয়ে এর ভেতরে শিশু দেখতে পাবে। দয়াবশত কেউ হয়ত এই শিশুকে গ্রহণ করবে এবং শিশু প্রাণে বেঁচে যাবে। এই ধারণা ফিরআউন এবং

তার দাস-দাসীরা যে করেনি তা নয়। করেছিল বলেই তারা ফিরআউনকে বলেছিল, এই শিশু ইসরাঈলীদের সন্তান। সুতরাং একে এই মুহূর্তে হত্যা করা উচিত। কিন্তু ফিরআউনের স্ত্রী ছিল একজন সৎ স্বভাব সম্পন্না নারী। একটি চাঁদের মতই ফুটফুটে শিশু দেখে তাঁর ভেতরে মাতৃত্বের ক্ষুধা প্রবল হয়ে উঠেছিল। সূরা ত্ব-হা-এ উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ হযরত মুসা আলায়হিস্ সালামকে বলেছিলেন, আমি আমার পক্ষ হতে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করে দিয়েছিলাম। অর্থাৎ তোমাকে এমন প্রিয় দর্শন ও মনোমুগ্ধকর চেহারা দিয়েছিলাম যে, দর্শনকারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাকে পরম মমতায় কোলে উঠিয়ে নিত।

এ কারণেই ফিরআউনের স্ত্রী বলে ওঠেন যে, এই শিশুকে হত্যা করো না বরং একে নিয়ে আমরা প্রতিপালন করি। সে যখন আমাদের এখানে প্রতিপালিত হবে এবং আমরা তাকে নিজের পুত্র করে নেবো তখন সে যে ইসরাঈলী এই শিশু বড় হয়ে জানবে কেমন করে? সে নিজেকে আমাদের ফিরআউনের বংশেরই একজন মনে করবে এবং তাঁর যাবতীয় যোগ্যতা শক্তি সামর্থ আমাদের পক্ষে কাজে লাগাবে।

কোরআনের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, হযরত মুসা আলায়হিস্ সালামের বোন সেই ভেসে যাওয়া সিন্দুক বা ঝুড়ির ওপরে এমনভাবে দৃষ্টি রেখেছিল যে, ঐ সিন্দুকের সাথে তার কোন সম্পর্ক যে আছে, এ কথা যেন কেউ বুঝতে না পারে। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে সে সময়ে এই মেয়েটির বয়স ছিল দশ বা বারো বছর। সে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রাজমহলে পৌছে যায়। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, মেয়েটা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারিণী।

সাগর থেকে রাজমহলে

শিশু নবী হযরত মুসা আলায়হিস্ সালামক যখন ফিরআউনের রাজমহলে উঠিয়ে নেয়া হলো, তখন এই শিশুকে দুধ পান করানোর প্রয়োজনের যত ধাত্রীকে ডাকা হলো, মহান আল্লাহ তাঁর শিশু নবীকে ইশারা দিয়ে দিলেন, তিনি যেন কারো দুধেই মুখ না দেন। ওদিকে হযরত মুসাকে যখন রাজমহলে তুলে নেয়া হলো তখন এই দৃশ্য দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর বোন ঘরে বসে থাকেনি। সে বুদ্ধিমত্তার সাথে রাজমহলে প্রবেশ করে সমস্ত ঘটনা দেখছিল। তাঁর শিশুভাই কোন নারীর দুধ পান করছে না। এ কারণে রাজা-রাণী চরমভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে এবং এই শিশু কার

দুধ পান করবে এ চিন্তায় তারা অস্থির হয়ে পড়েছে, এটা সে দেখছিল। তারপর সে এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য সে বলেছিল, আমি একজন ভালো ধাত্রীর সন্ধান দিতে পারি, যে ধাত্রী অত্যন্ত স্নেহ প্রবণ ও মমতা দিয়ে এই শিশুর লালন-পালন করতে পারবে।

এখানে একটা বিষয় স্মরণে রাখতে হবে যে, প্রাচীন কালে বড় ও অভিজাত বংশীয় লোকেরা নিজেদের শিশু সন্তানকে নিজেদের কাছে রেখে লালন পালন করার পরিবর্তে সাধারণত ধাত্রীদের হাতে সোপর্দ করে দিতো। পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় দেখা যায় যে, আপনা ভাই যখন কোন ধাত্রীর স্তনে মুখ দিচ্ছে না, তখন তাকে অনুসরণকারী তাঁর বোন এ কথা বলেনি যে, আমি একজন ভালো ধাত্রী এনে দিচ্ছি। বরং সে বলেছিল, আমি এমন গৃহের সন্ধান দিতে পারি যার অধিবাসীরা এই শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং তারা অত্যন্ত স্নেহ মমতার সাথে এই শিশুকে প্রতিপালন করবে।

এভাবেই হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মা রাজ প্রাসাদে প্রবেশের সুযোগ লাভ করলেন এবং নিজের সন্তানকে নিজের বুকে ফিরে পেলেন। তাঁর বুকের দুধ পান করেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ এমন এক ব্যবস্থা তাঁর এই নবীর জন্য করেছিলেন যে, রাজার ছত্র ছায়ায় লালিত পালিত হয়েও হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ফিরআউনের শাহাজাদা হিসেবে গড়ে উঠেননি। বরং নিজের মাতা-পিতা ও ভাই-বোনদের পরম স্নেহেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং এ কারণেই তিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বড় হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য ও পিতৃ পুরুষের আদর্শ এবং নিজের জাতি থেকে তাঁর সম্পর্কচ্যুতি ঘটতে পারেনি।

তিনি ফিরআউন পরিবারের একজন সদস্য হবার পরিবর্তে নিজের মানসিক আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তাধারার দিকদিয়ে সম্পূর্ণভাবে বনী ইসরাঈলীদেরই আপনজন হিসেবে পরিণত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের রুজি রোজগারের জন্য কাজ করে এবং সেকাজে লক্ষ্য থাকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তার দৃষ্টান্ত মূসার মায়ের মতো। তিনি নিজের সন্তানকে নিজেই দুধ পান করান আবার তার বিনিময়ও লাভ করেন।

এই হাদীসের ব্যাখ্যা হলো, এ ধরনের লোক যদিও নিজের ও নিজের সন্তানদের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেয়ার জন্য কাজ করে কিন্তু যেহেতু সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ঈমানদারীর সাথে কাজ করে, যার সাথেই কাজ কারবার করে তার অধিকার যথাযথভাবে আদায় করে এবং হালাল রিজিকের মাধ্যমে নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণকে আল্লাহর ইবাদাত মনে করে, তাই নিজের জীবিকা উপার্জন করা হয় এবং অন্যদিকে আল্লাহর কাছ হতে সওয়াব ও প্রতিদানও লাভ করা হয়।

বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকলে সে একদিন ক্ষমতাসীন শাসক কিবতীদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন গড়ে তুলে পুনরায় মিশরের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে পারে, এ আশংকায় তারা ইসরাঈলী পুত্র সন্তানদের হত্যা করার আদেশ জারী করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ এই শাসকদের অন্যায় অত্যাচার হতে সাধারণ মানুষকে হেফাজত করার জন্য ইসরাঈলীদের মধ্য হতেই একজনকে নির্বাচিত করলেন, যাকে নবুয়্যাত দান করা হলো। এই সন্তানকে কিভাবে আল্লাহ হেফাজত করবেন এই চিন্তায় তাঁর মা ও পরিবারের লোকজন ছিল চিন্তিত। এরপর আল্লাহ যখন এই ব্যবস্থা চূড়ান্ত করলেন, তখন মানুষ বুঝলো যে, মহান আল্লাহ কিভাবে তাঁর কাজ সমাপ্ত করলেন।

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের গোটা পরিবার এবং তাঁর আত্মীয় স্বজন সবাই চিন্তিত ছিল, এই শিশু জীবিত থাকবে কি করে। তাকে কিভাবে লালন-পালন করা যাবে। যার ভয়ে তারা শংকিত ছিল, মহান আল্লাহ এমন এক ব্যবস্থা করলেন যে, সেই প্রাণের শত্রুর ঘরেই তিনি লালিত পালিত হলেন। এক সময় তিনি পূর্ণ বয়স্ক যুবকে পরিণত হলেন। তাঁর এ সময়ের ইতিহাস কোরআন এভাবে বর্ণনা করেছে–

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ–

মূসা যখন পূর্ণ যৌবনে পৌছে গেলো এবং তার বিকাশ পূর্ণতা লাভ করলো তখন আমি তাকে হুকুম ও জ্ঞান দান করলাম, সৎলোকদের আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। (সূরা কাসাস-১৪-১৫)

দেয়া হলো সেই অলৌকিক লাঠি

ঘটনাবশত হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে রাজমহল ত্যাগ করতে হলো এবং এক পর্যায়ে তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা যথাসময়ে নবুয়্যাতের পদমর্যাদায় ভূষিত করলেন। এরপর স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে ডাক দিলেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম মহান আল্লাহর আহ্বান শুনে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করেছিলেন, কেননা এই আল্লাহর সন্ধানেই তিনি এতদিন ছিলেন। তিনি যাকে পেতে চান, সেই প্রেমিক আজ স্বেচ্ছায় তাকে আহ্বান করছেন–এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে! পবিত্র কোরআনে এর পরের ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى–قَالَ هِيَ عَصَايَ–اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَارِبُ اُخْرٰى–قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى–فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى–قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ–سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى–وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ اٰيَةً اُخْرٰى–لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى–اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى–

আর হে মূসা! এ তোমার হাতে এটা কি? মূসা জবাব দিল, এ আমার লাঠি। এর ওপর ভর দিয়ে আমি চলি, নিজের ছাগলগুলোর জন্য এর সাহায্য পাতা পাড়ি এবং এর সাহায্যে আরো অনেক কাজ করি। বললেন, একে ছুঁড়ে দাও হে মূসা! সে ছুঁড়ে দিল এবং অকস্মাৎ সেটা হয়ে গেলো একটা সাপ, যা দৌড়াচ্ছিল। বললেন, ধরে ফেলো ওটা এবং ভয় করো না, আমি ওকে আবার ঠিক তেমনটিই করে দেবো যেমনটি সে আগে ছিল। আর তোমার হাতটি একটু বগলের মধ্যে রাখো, তা কোন প্রকার ক্লেশ ছাড়াই উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে, এটা দ্বিতীয় নিদর্শন। এ জন্য যে, আমি তোমাকে নিজের বৃহৎ নিদর্শনগুলো দেখাবো। এখন তুমি যাও ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। (সূরা ত্ব-হা-১৭-২৪)

আল্লাহ জানতেন হযরত মূসার হাতে লাঠি আছে। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাঁর হাতে যে লাঠি আছে অন্য কিছু নয় এ ব্যাপারে যেন

মূসা আলায়হিস্ সালাম নিশ্চিত হয়ে যান এবং এরপর দেখেন আল্লাহর কুদরতের খেলা কিভাবে শুরু হয়। যদিও জবাবে শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল যে, হে আল্লাহ! এটা একটা লাঠি। কিন্তু হযরত মূসা এ প্রশ্নের যে লম্বা জবাব দিলেন তা তাঁর সে সময়কার মানসিক অবস্থার একটা চমৎকার ছবি তুলে ধরেছে। সাধারণত দেখা যায়, মানুষ যখন কোন বড় ব্যক্তির সাথে বা তাঁর কাংখিত ব্যক্তির সাথে কথা বলার সুযোগ পায় তখন নিজের কথা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করে, যাতে তার সাথে বেশীক্ষণ কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করা যায়।

দীর্ঘ দিনের পরিচিত লাঠি, যা দিয়ে তিনি নিজের পশুপালকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং বৃক্ষের পাতা পেড়ে আহার করান। এই লাঠি তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন আর সাথে সাথে তা একটা বিশাল সাপের আকার ধারণ করে সাপের মতই মোচড় দিতে থাকলো। মূসা আলায়হিস্ সালাম এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। পবিত্র কোরআন বলছে তিনি পেছনের দিকে এমন শক্তিতে দৌড় দিয়েছিলেন যে, পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখার মত তার সাহস ছিল না যে, তাঁর সেই লাঠিটা সাপের মতই আচরণ করছে না স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছ। এই মু'জিযা প্রদানের ঘটনা মহান আল্লাহ এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ–فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ–يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ–اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ–اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ–وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَاۡئِهٖ–اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ–

আর (হুকুম দেয়া হলো) ছুঁড়ে দাও তোমার লাঠিটি। যখনই মূসা দেখলো লাঠিটি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে তখনই সে পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং একবার ফিরেও তাকালো না। বলা হলো, হে মূসা! ফিরে এসো এবং ভয় করো না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তোমার হাত বগলে রাখো উজ্জল হয়ে বের হয়ে আসবে কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই। এবং ভীতিমুক্ত হবার জন্য নিজের হাত দু'টি চেপে ধরো। এ দু'টি উজ্জল নিদর্শন তোমার রবের পক্ষ থেকে ফিরআউন ও তার সভাসদদের সামনে পেশ করার জন্য, তারা বড়ই নাফরমান। (সূরা কাসাস-৩১-৩২)

এ মু'জিযা দু'টি তখন হযরত মূসাকে দেখানোর কারণ হচ্ছে, প্রথমত যাতে তাঁর মনে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, প্রকৃতপক্ষে যে সত্তা বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থার স্রষ্টা, অধিপতি, শাসক ও পরিচালক তিনিই তাঁর সাথে কথা বলছেন। দ্বিতীয়ত এ মু'জিযাগুলো দেখে তিনি এ মর্মে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন যে, তাঁকে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার– ফেরাউনের কাছে যে ভয়াবহ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে সেখানে তিনি একেবারে খালি হাতে তার মুখোমুখি হবেন না বরং প্রচন্ড শক্তিশালী অস্ত্র নিয়ে যাবেন। আর সে অস্ত্র কোন মানুষের দান করা বা বানানো নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী মহান আল্লাহর পক্ষ হতে দান করা এই অস্ত্র।

এবং ভীতিমুক্ত হবার জন্য নিজের হাত দু'টি চেপে ধরো–অর্থাৎ যে দায়িত্ব তোমাকে প্রদান করা হলো, এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যখন কোন ভয়াবহ মুহূর্ত এসে উপস্থিত হবে, যার ফলে তোমার মনে ভীতির সঞ্চার হয় তখন নিজের বাহু চেপে ধরো। এর ফলে তোমার মন শক্তিশালী হবে এবং ভীতি ও আশংকার কোন রেশই তোমার মধ্যে থাকবে না। বাহু বা হাত বলতে সম্ভবত ডান হাত বুঝানো হয়েছে। কারণ সাধারণভাবে হাত বললে ডান হাতই বুঝানো হয়। চেপে ধরা দু'রকম হতে পারে। এক, হাত পার্শ্বদেশের সাথে লাগিয়ে চাপ দেয়া। দুই, এক হাতকে অন্য হাতের বগলের মধ্যে রেখে চাপ দেয়া। এখানে প্রথম অবস্থাটি প্রযোজ্য হবার সম্ভাবনা বেশি। কারণ এ অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি অনুভব করতে পারবে না যে, এ ব্যক্তি মনের ভয় দূর করার জন্য কোন বিশেষ কাজ করছে।

জালিম জাতির কাছে যাও

হযরত মূসাকে যেহেতু একটি জালেম সরকারের মোকাবিলা করার জন্য কোন সৈন্য সামন্ত ও পার্থিব সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই পাঠানো হচ্ছিলো তাই তাঁকে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়। বারবার এমন ভয়ানক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল যাতে একজন মহান দৃঢ়চেতা নবীও আতংকমুক্ত থাকতে পারতেন না। আল্লাহ বলেন, এ ধরনের কোন অবস্থা দেখা দিলে তুমি স্রেফ এ কাজটি করো, ফিরআউন তার সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করেও তোমার মনের জোর শিথিল করতে পারবে না।

এ নিদর্শনগুলো নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাও এবং আল্লাহর রাসূল হিসেবে নিজেকে পেশ করে তাকে ও তার রাষ্ট্রীয় প্রশাসকবৃন্দকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও দাসত্বের দিকে আহবান জানাও। তাই এখানে তাঁর নিযুক্তির বিষয়টি সুস্পষ্ট ও

বিস্তারিত বলা হয়নি। তবে কোরআনের অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ত্বা-হা ও সূরা নাযি'আতে বলা হয়েছে, ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। সূরা আশ্ শূ'আরায় বলা হয়েছে, যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বললেন, যাও জালেম জাতির কাছে, ফেরাউনের জাতির কাছে। সূরা শুআরার ১০-১১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ-قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلاَ يَتَّقُوْنَ-

তাদেরকে সে সময়ের কথা শুনাও যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বলেছিলেন, জালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও-ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে-তারা কি ভয় করে না?

ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى-وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ-اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ وَلاَ تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ-اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى-فَقُوْلاَ لَهٗ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى-

তারপর এখন তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছো হে মূসা! আমি তোমাকে নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছি। যাও, তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনগুলোসহ এবং দেখো আমার স্মরণে ভুল করো না। যাও, তোমরা দু'জন ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে। (সূরা ত্বা-হা-৪০-৪৪)

এ বর্ণনাভংগী ফেরাউনের সম্প্রদায়ের চরম নির্যাতনের কথা প্রকাশ করছে। জালেম সম্প্রদায় হিসেবে তাদেরকে পরিচিত করানো হচ্ছে। যেন তাদের আসল নামই হচ্ছে জালেম সম্প্রদায় এবং ফেরাউনের সম্প্রদায় হচ্ছে তার তরজমা ও ব্যাখ্যা। অর্থাৎ হে মূসা! দেখো কেমন অদ্ভুত ব্যাপার, এরা নিজেদেরকে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করে দুনিয়ায় জুলুম-নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে এবং ওপরে আল্লাহ আছেন, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এ ভয় তাদের নেই। মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস্ সালামকে তাঁর ওপরে দায়িত্ব অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দান করলেন। তারপর তাঁকে আদেশ দান করলেন, এবার যাও দায়িত্ব পালন করো। যে দায়িত্ব মূসা আলাইহিস্ সালামকে দান করা হলো, এ দায়িত্ব পালন কোন সহজ বিষয় ছিল না। যেখানে তাঁকে গিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে,

সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতারি পরোওয়ানা ঝুলছিল। তারপরেও বড় কথা ছিল, তাঁকে প্রেরণ করা হচ্ছিল একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে। সমকালিন পৃথিবীতে সে সরকার ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সমরাস্ত্রে সজ্জিত। বিশাল একটা অনুগত সেনাবাহিনী ছিল তার নিয়ন্ত্রণে। এমন ধরণের একটা সরকারের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে একা যেতে বলছেন সংগ্রাম করার জন্য।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যেতে অস্বীকার করলেন না। তিনি এ কথাও বললেন না যে, আমি একা একটা সরকারকে কিভাবে মোকাবেলা করবো? আমার সাথে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র এবং বিশাল সেনাবাহিনী দেয়া হোক।

এ সমস্ত কোন কথাই তিনি বললেন না। কারণ তিনি জানতেন, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে ময়দানে আন্দোলনে নামিয়ে দিয়ে বসে তামাশা দেখেন না। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর সাথে আছেন। তিনি শুধু নিজের একটা দুর্বলতার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করলেন। এ সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা হলো–

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي-وَيَسِّرْلِي اَمْرِي-وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوْا قَوْلِي-وَاجْعَلْ لِّي وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِي-هَارُوْنَ اَخِي-اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِي وَاَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِي-كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا-وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا-اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا-

মূসা বললো, হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার জন্য নিজের পরিবার থেকে সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করে দাও আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার হাত মজবুত করো এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দাও, যাতে আমরা খুব বেশী করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং খুব বেশী করে তোমার চর্চা করি। তুমি সব সময় আমাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক। (সূরা ত্বা-হা-২৫-৩৫)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীর আবেদন কবুল করে জানিয়ে দিলেন–

قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى-وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى-اِذْ

اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّكَ مَا يُوْحٰى-اَنِ اقْذِفِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ- وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ-وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ-

বললেন, হে মূসা! তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেওয়া হলো। আমি আর একবার তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলাম। সে সময়ের কথা মনে করো যখন আমি তোমার মা'কে ইশারা করেছিলাম, এমন ইশারা যা ওহীর মাধ্যমে করা হয়, এই মর্মে যে, এ শিশুকে সিন্দুকের মধ্যে রেখে দাও এবং আমার শত্রু ও এ শিশুর শত্রু একে তুলে নেবে। আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। (সূরা ত্বা-হা-৩৬-৩৯)

এবার হযরত মূসা ও তাঁর ভাই মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আবেদন করলেন—

قَالَ رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى-قَالَ لاَ تَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى-فَاْتِيٰهُ فَقُوْلاَ اِنَّا رَسُوْلاَ رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ-وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ-قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ-وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى-اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى-

উভয়েই বললো, হে আমাদের রব! আমাদের ভয় হয়, সে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে অথবা আমাদের ওপর চড়াও হবে। বললেন, ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি। যাও তার কাছে এবং বলো, আমরা তোমার রবের প্রেরিত, বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আমরা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি তোমার রবের নিদর্শন এবং শান্তি তার জন্য যে সঠিক পথ অনুসরণ করে। আমাদের ওহীর সাহায্যে জানানো হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা ত্বা-হা-৪৫-৪৮)

হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও—অর্থাৎ আমার মনে এ মহান দায়িত্বভার বহন করার মতো হিম্মত সৃষ্টি করে দাও। আমার উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দাও।

যেহেতু হযরত মূসাকে আলায়হিস্ সালাম একটি অনেক বড় কাজের দায়িত্ব সোপর্দ করা হচ্ছিল যা করার জন্য দুরন্ত সাহসের প্রয়োজন তাই তিনি দোয়া করেন, আমাকে এমন ধৈর্য, দৃঢ়তা, সংযম, সহনশীলতা, নির্ভীকতা ও দুর্জয় সংকল্প দান করো যা এ কাজের জন্য প্রয়োজন।

কোরআনের শব্দাবলী থেকে আমরা যে কথা বুঝতে পারি তা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজের মধ্যে বাগ্মীতার অভাব দেখছিলেন। ফলে তাঁর মনে আশংকা জেগেছিল যে, নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি তাঁর কখনো বক্তৃতা দেবার প্রয়োজন দেখা দেয় (এ পর্যন্ত যার কোন প্রয়োজন তাঁর দেখা দেয়নি) তাহলে তাঁর স্বভাবসুলভ সংকোচ বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও যাতে আমি নিজের কথা লোকদেরকে ভালোভাবে বুঝাতে পারি। এ বিষয়েই ফিরআউন একবার তাঁকে খোঁটা দিয়ে বলেছিল, এ ব্যক্তি তো নিজের কথাই সঠিকভাবে বলতে পারে না। এ দূর্বলতা অনুভব করেই হযরত মূসা নিজের ভাই হারুনকে সাহায্যকারী হিসাবে চান।

পরবর্তীতে হযরত মূসার এ দুর্বলতা দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি বেশ জোরদার ভাষণ দিতে শুরু করছিলেন। কোরআনে তাঁর পরবর্তীকালের যেসব ভাষন উদ্ধৃত হয়েছে তা উন্নত পর্যায়ের শাব্দিক অলংকার ও বাকপটুতার সাক্ষ্য দেয়। জিভে জড়তা আছে এমন একজন তোতলা ব্যক্তিকে আল্লাহ নিজের রাসূল নিযুক্ত করবেন, একথা স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি বিরোধী। রাসূলরা সব সময় এমন ধরনের লোক হয়েছেন যারা চেহারা, সুরত, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার দিক দিয়ে হয়েছেন সর্বোত্তম, যাদের ভেতর বাইরের প্রতিটি দিক অন্তর ও দৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে। কোন রাসূলকে এমন কোন দোষ সহকারে পাঠানো হয়নি এবং পাঠানো যেতে পারতো না যে কারণে তিনি লোকদের মধ্যে হাস্যাস্পদ হন অথবা লোকেরা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

তোমাদের দু'জনের রব কে

আল্লাহর নবী হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন মিশরের সরকার প্রধানকে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন, তখন সরকার প্রধান ফিরআউন কিন্তু এ প্রশ্ন করেনি যে, তোমাদের আল্লাহ কে? সে প্রশ্ন করেছিল, তোমাদের রব কে? অর্থাৎ এমন কোন শক্তি আছে যে, যার আইন কানুন

বিধান তোমরা অনুসরণ করছো? কারণ দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য যে আইন কানুনের প্রয়োজন হয়, সে আইন কানুন তথা যাবতীয় বিধান তো রচনা করি আমি। আমিই তো রব। মহান আল্লাহ এই কাহিনী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন। রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসেই তারা আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে নিজের বানানো তথা মানুষের বানানো আইন কানুন দেশের বুকে জারী করে। এরাও ঐ ফেরাউনের মতই। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে ফিরআউন যে প্রশ্ন করেছিল, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى–قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى–قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى–قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ–لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسٰى–

ফিরআউন বললো, আচ্ছা, তাহলে তোমাদের দু'জনের রব কে হে মূসা? মূসা জবাব দিল, আমাদের রব তিনি যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন। ফিরআউন বললো, আর পূর্ববর্তী বংশধর যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের তাহলে কি অবস্থা ছিল? মূসা বললো, সেজ্ঞান আমার রবের কাছে লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। আমার রব ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না। (সূরা ত্বা-হা-৪৯-৫২)

দুই ভাইয়ের মধ্যে যেহেতু মূল নবী ছিলেন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এবং দাওয়াতদানের তিনিই ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব তাই ফিরআউন তাঁকেই সম্বোধন করে। আর হতে পারে তাঁকে সম্বোধন করার তার আরো একটি কারণও থাকতে পারে। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, সে হযরত হারুনের বাকপটুতা ও উন্নত বাগ্মীতার মুখোমুখি হতে চাচ্ছিল না এবং বাগ্মীতার ক্ষেত্রে হযরত মূসার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে চাচ্ছিল। ফেরাউনের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা দু'জন আবার কাকে রব বানিয়ে নিয়েছো, মিশর ও মিশরবাসীদের রব তো আমিই।

اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى– হে মিশরবাসীরা! আমি তোমাদের প্রধানতম রব। (সূরা নাযিআত)

ফিরআউন দরবারের সমস্ত লোকদের সম্বোধন করে বলেছিল–يٰقَوْمِ اَلَيْسَ

لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ- হে আমার জাতি! মিশরের রাজত্বের মালিক কি আমি নই? আর এ নদীগুলো কি আমার নীচে প্রবাহিত হচ্ছে না? (সূরা যুখরুফ-৫১)

ফিরআউন নিজের সভাসদদের সামনে এভাবে হুংকার দিয়ে বলেছিল-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ-فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى-

হে জাতির নেতৃবৃন্দ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ আছে বলে আমি জানি না। হে হামান! কিছু ইট পোড়াও এবং আমার জন্য একটি উঁচু ইমরাত নির্মাণ করো। আমি উপরে উঠে একবার দেখি তো এই মূসা কাকে ইলাহ্ বানাচ্ছে। (সূরা কাসাস-৩৮)

এর অর্থ এ নয় যে, ফিরআউন তার জাতির একমাত্র মাবুদ ছিল এবং সেখানে তার ছাড়া আর কারো পূজা হতো না। এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, ফিরআউন নিজেকে সূর্য দেবতার অবতার হিসেবে বাদশাহের দাবীদার বলতো। তাছাড়া মিশরের ইতিহাস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, বহু দেবী ও দেবতার পূজা-উপাসানা করা ছিল এ জাতির ধর্ম। তাই একমাত্র পূজনীয় হবার দাবী ফেরাউনের ছিল না। বরং সে কার্যত মিশরের এবং আদর্শগতভাবে সমগ্র মানব জাতির রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের দাবীদার ছিল।

সে একথা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, অন্য কোন সত্তা তার ওপর কর্তৃত্ব করবে, তার প্রতিনিধি এসে তাকে হুকুম দেবে এবং তার কাছে এ হুকুমের আনুগত্য করার দাবী জানাবে। তার আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণে কোন কোন লোকের ধারণা হয়েছে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো এবং নিজে ইলাহ ও উপাস্য হবার দাবীদার ছিল। কিন্তু এ কথা কোরআন থেকে প্রমাণিত যে, সে উর্ধ জগতে অন্য কারো শাসন কর্তৃত্ব স্বীকার করতো। সে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। তবে তার রাজনৈতিক প্রভুত্বে কেউ হস্তক্ষেপ করবে এবং আল্লাহর কোন রাসূল এসে তার ওপর হুকুম চালাবে, এটা মেনে নিতে সে প্রস্তুত ছিল না।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও হযরত হারুণ আলাইহিস্ সালাম বলেছিলেন, আমরা সকল অর্থে একমাত্র তাঁকেই রব মানি। প্রতিপালক, প্রভূ, মালিক, শাসক ইত্যাকার সকল অর্থেই আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও রব বলে স্বীকার করি না। আমরা খন্ডিতভাবে আল্লাহকে রব হিসাবে গ্রহণ করিনি বরং জীবনের প্রতিটি বিভাগেই আল্লাহকে রব হিসাবে স্বীকৃতি দান করেছি ও তাঁর আদেশ পালন করছি।

মূসা জবাব দিল, আমাদের রব তিনি যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন−অর্থাৎ দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস তাঁরই নির্মাণ কৌশলে নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনিই আকার-আকৃতি, গঠনশৈলী, যোগ্যতা, গুণ ও বিশেষত্ব দান করেছেন। দুনিয়ায় কাজ করার জন্য হাতের যে গঠনাকৃতির প্রয়োজন ছিল তা তিনি তাকে দিয়েছেন। পায়ের জন্য যে সর্বাধিক উপযুক্ত গঠনাকৃতির দরকার তা তাকে দিয়েছেন। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, বাতাস, পানি, আলো, প্রত্যেককে তিনি এমন বিশেষ আকৃতি দান করেছেন যা এ বিশ্ব-জাহানে তার নিজের অংশের কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন ছিল।

তারপর তিনি প্রত্যেক জিনিসকে কেবল তার বিশেষ আকৃতি দান করেই এমনিভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনিই সবাইকে পথও দেখিয়েছেন। দুনিয়ায় এমন কোন জিনিস নেই যাকে তিনি নিজের গঠনাকৃতিকে কাজে লাগাবার এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পুর্ণ করার পদ্ধতি শেখাননি। কানকে শুনা ও চোখকে দেখা তিনিই শিখিয়েছেন। মাছকে সাঁতার কাটার ও পাখিকে উড়ার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। গাছকে ফুল ও ফল দেবার ও মাটিকে উদ্ভিদ উৎপাদন করার নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। মোটকথা তিনি সারা বিশ্ব-জাহান এবং তার সমস্ত জিনিসের শুধুমাত্র স্রষ্টাই নন বরং তাদের শিক্ষক ও পথ প্রদর্শকও।

এ অতুলনীয় ব্যাপক অর্থবহুল ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শুধু এ কথাই বলেননি যে, তাঁর রব কে? বরং এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি রব কেন এবং কেন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে রব বলে মেনে নেয়া যেতে পারে না। দাবীর সাথে সাথে তার যুক্তি-প্রমাণও এই ছোট্ট বাক্যটির মধ্যে এসে গেছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যখন ফিরআউন ও তার প্রত্যেকটি প্রজা তার নিজের বিশেষ অস্তিত্বের জন্য আল্লাহর অনুগৃহীত এবং যখন তাদের একজনেরও শ্বাসযন্ত্র,

পাকস্থলী ও হৃদযন্ত্র আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নিজের কাজ করে না যাওয়া পর্যন্ত সে এক মুহূর্তের জন্যও জীবিত থাকতে পারে না তখন ফেরাউনের নিজেকে লোকদের রব বলে দাবী করা এবং লোকদের কার্যত তাকে নিজেদের রব বলে মেনে নেয়া একটা নির্বুদ্ধিতা ও বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আবার এ ছোট্ট বাক্যে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ইশারায় রিসালাতের যুক্তিও পেশ করে দিয়েছেন ফিরআউন এই রিসালত মেনে নিতে অস্বীকার করছিল। হযরত মূসার যুক্তির মধ্যে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের পথনির্দেশক এবং যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে পথ নির্দেশনা দিচ্ছেন, তাঁর পথ নিদের্শনা দেবার বিশ্বজনীন দায়িত্বের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষের সচেতন জীবনের জন্যও পথনির্দেশনা দেবার ব্যবস্থা করবেন। আর মাছ ও মুরগীর জন্য যে ধরনের পথনির্দেশনা উপযোগী, মানুষের সচেতন জীবনের জন্য সে ধরনের পথনির্দেশনা উপযোগী হতে পারে না। এর সবচেয়ে মানানসই পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, একজন সচেতন মানুষ তাঁর পক্ষ থেকে মানুষদের পথ দেখবার জন্য নিযুক্ত হবেন এবং তিনি মানুষদের বুদ্ধি ও চেতনার প্রতি আবেদন জানিয়ে তাদেরকে সঠিক-সোজা পথ দেখাবেন।

ফিরআউন বললো, আর পূর্ববর্তী বংশধর যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের তাহলে কি অবস্থা ছিল—অর্থাৎ ব্যাপার যদি এটাই হয়ে থাকে যে, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে আকৃতি দিয়েছেন এবং তাকে দুনিয়ায় কাজ করার পথের সন্ধান দিয়েছেন তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন রব্ব নেই, তাহলে এ আমাদের সবার বাপ দাদারা, যারা বংশ পরম্পরায় ভিন্ন প্রভু ও ইলাহর বন্দেগী করে চলে এসেছে তোমাদের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থান কোথায় হবে? তারা সবাই কি পথভ্রান্ত ছিল? তারা সবাই কি আযাবের উপযোগী ছিল? তাদের সবার কি বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছিল? এ ছিল ফেরাউনের কাছে হযরত মূসার এ যুক্তির জবাব।

হতে পারে সে মূর্খতা ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে এ জবাব দিয়েছে। আবার দুষ্টামির কারণেও এ জবাব দিতে পারে। তাছাড়া এ উভয় কারণই এ জবাবের পিছনে সক্রিয় থাকতে পারে। অর্থাৎ সে নিজেও এ কথায় রাগান্বিত হয়েছে যে, এ ধর্মের কারণে আমাদের সমস্ত বুযর্গ যে পথভ্রষ্ট ছিল তা মেনে নিতে হবে আবার সাথে সাথে নিজের সভাসদ ও সাধারণ মিশরবাসীদের মনে হযরত মূসার দাওয়াতের বিরুদ্ধে

ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করাও এর উদ্দেশ্য হতে পারে। সত্যপন্থীদের সত্য প্রচারের বিরুদ্ধে এ অস্ত্রটি প্রত্যেক যুগেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মুর্খদের কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য এটা বড়ই প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে যে সময় কোরআনের এ আয়াতগুলো নাযিল হয় সে সময় মক্কায় নবী করীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সবচাইতে বেশি এ অস্ত্রটিকেও কাজে লাগানো হয়েছিল। তাই হযরত মূসার মোকাবিলায় ফেরাউনের এ ছলনার উল্লেখ যথার্থই ছিল।

মূসা বললো, সেজ্ঞান আমার রবের কাছে লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। আমার রব ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না–এটি হযরত মূসার সে সময় প্রদত্ত একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ জবাব। এ থেকে প্রচার কৌশল সম্পর্কে ভালো শিক্ষা লাভ করা যায়। উপরের বর্ণনা অনুসারে ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতাদের এবং তাদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির মনে বিদ্বেষের আগুন জ্বালানো। যদি হযরত মূসা বলতেন, হাঁ, তারা সবাই মুর্খ ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে, তাহলে এটা সত্য কথনের বিরাট আদর্শ হলেও এ জবাব হযরত মূসার পরিবর্তে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। তাই তিনি পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সহকারে এমন জবাব দেন যা ছিল একদিকে যথার্থ সত্য এবং অন্যদিকে ফেরাউনের বিষ দাঁতও উপড়ে ফেলতে সক্ষম।

তিনি বলেন, তারা যাই কিছু ছিল, নিজেদের কাজ করে আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের কার্যাবলী এবং কাজের পেছনে নিহিত অন্তরের ইচ্ছাসমূহ জানার কোন উপায় নেই। সুতরাং তাদের ব্যাপারে আমি কোন সিদ্ধান্ত দিই কেমন করে? তাদের সমস্ত রেকর্ড আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও তার কারণসমূহের খবর আল্লাহই জানেন। কোন জিনিস আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে থাকেনি এবং তাঁর স্মৃতি থেকেও কোন জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। আল্লাহই জানেন তাদের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে। আমাদের ভূমিকা কি ছিল এবং তাদের পরিণাম কি হবে, তোমার ও আমার এ কথা চিন্তা করা উচিত নয়। আমাদের চিন্তা করা উচিত। আমাদের ভূমিকা কি এবং আমরা কোন্ ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হবো।

কারাগারে তোমাকে পচিয়ে মারবো

এই ঘটনা পবিত্র কোরআনে চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ–قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا–اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ–قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ–قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ–قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ–قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ–قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ–

ফিরআউন বললো, রাব্বুল আলামীন আবার কে? মূসা জবাব দিল, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রব এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যা কিছু আছে তাদেরও রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী হও। ফিরআউন তার আশপাশের লোকদের বললো, তোমরা শুনছো তো? মূসা বললো, তোমাদেরও রব এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও রব যারা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ফিরআউন (উপস্থিত লোকদের) বললো, তোমাদের কাছে প্রেরিত তোমাদের এ রাসূল সাহেবটি তো দেখছি একেবারেই পাগল। মূসা বললো, পূর্ব ও পশ্চিম এবং যা কিছু তার মাঝখানে আছে সবার রব, যদি তোমরা কিছু বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী হতে। ফিরআউন বললো, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বলে মেনে নাও, তাহলে কারাগারে যারা পচে মরছে তোমাকেও তাদের দলে ভিড়িয়ে দেবো। (সূরা শু'আরা-২৩-২৯)

রব সম্পর্কিত এ প্রশ্নটি করা হয় হযরত মূসার উক্তির ওপর ভিত্তি করে। তিনি বলেন, আমি রাব্বুল আলামীনের তথা সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, প্রভু ও শাসকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি এবং এ জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দেবে। এটি ছিল সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য।

এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, হযরত মূসা যাঁর প্রতিনিধিত্বের দাবীদার তিনি সারা বিশ্ব-জাহানের সকল সৃষ্টির ওপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসনের অধিকারী এবং তিনি ফিরআউনকে নিজের অনুগত গণ্য করে তার শাসন কর্তৃত্বের পরিসরে একজন উর্ধতন শাসনকর্তা হিসেবে কেবল হস্তক্ষেপই করছেন না বরং তার নামে এ

ফরমানও পাঠাচ্ছেন যে, তোমার প্রজাদের একটি অংশকে আমার মনোনীত প্রতিনিধির হাতে সোপর্দ করো, যাতে সে তাদেরকে তোমার রাষ্ট্রসীমার বাইরে বের করে আনতে পারে। এ কথায় ফিরআউন জিজ্ঞেস করছে, এ সারা বিশ্ব-জাহানের মালিক ও শাসনকর্তাটি কে? যিনি মিশরের বাদশাহকে তার প্রজাকূলের অন্তরভুক্ত সামান্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে এ ফরমান পাঠাচ্ছেন?

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ফিরআউনকে জানিয়ে দিলেন, আমি পৃথিবীতে বসবাসকারী কোন সৃষ্টি ও ধ্বংসশীল শাসন কর্তৃত্বের দাবীদারের পক্ষ থেকে আসিনি রবং এসেছি আকাশ ও পৃথিবীর মালিকের পক্ষ থেকে। যদি তোমরা বিশ্বাস করো এ বিশ্ব-জাহানের কোন স্রষ্টা-মালিক ও শাসনকর্তা আছেন তাহলে বিশ্ববাসীর রব কে একথা বুঝা তোমাদের পক্ষে কঠিন হবার কথা নয়।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ফেরাউনের দরবারীদেরকে সম্বোধন করে এ ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ফিরআউন বলেছিল, তোমরা শুনছো? হযরত মূসা তাদেরকে বলেন, আমি এমন সব মিথ্যা রবের প্রবক্তা নই যারা আজ আছে, কাল ছিল না এবং কাল ছিল কিন্তু আজ নেই। তোমাদের এ ফিরআউন যে আজ তোমাদের সবার রব-এ পরিণত হয়েছে সে কাল ছিল না এবং কাল তোমাদের বাপ-দাদারা যেসব ফিরআউনকে রব-এ পরিণত করেছিল তারা আজ নেই। আমি কেবলমাত্র সেই রব-এর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসনাধিকার স্বীকার করি যিনি আজও তোমাদের এবং এই ফেরাউনের রব এবং পূর্বে তোমাদের ও এর যে বাপ-দাদারা চলে গেছেন তাদের সবারও রব ছিলেন।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের মুখে রব সম্পর্কে বর্ণনা শুনে ফিরআউন তাঁকে পাগল বলেছিল। মূসা আলাইহিস্ সালামের কথার অর্থ ছিল, আমাকে পাগল গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু আপনারা যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন, তাহলে নিজেরাই ভেবে দেখুন, প্রকৃতপক্ষে কি এ বেচারা ফিরআউন যে পৃথিবীর সামান্য একটু ভূখণ্ডের বাদশাহ হয়ে বসেছে সে রব্ব অথবা পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক এবং মিশরসহ পূর্ব ও পশ্চিম দ্বারা পরিব্যাপ্ত প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক যিনি তিনি রব্ব? আমি তো তাঁরই শাসন কর্তৃত্ব মানি এবং তাঁরই পক্ষ থেকে এ হুকুম তাঁর এক বান্দার কাছে পৌছিয়ে দিচ্ছি।

এই কথোপকথনটি বুঝতে হলে এ বিষয়টি সামনে থাকতে হবে যে, আজকের মতো প্রাচীন যুগেও উপাস্য-এর ধারণা কেবলমাত্র ধর্মীয় অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ উপাস্য শুধুমাত্র পূজা, আরাধনা, মানত ও নযরানা লাভের অধিকারী। তার অতি প্রাকৃতিক প্রাধান্য ও কর্তৃত্বের কারণে মানুষ নিজের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে তার কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের জন্য প্রার্থনা করবে, এ মর্যাদাও তার আছে। কিন্তু কোন উপাস্য আইনগত ও রাজনৈতিক দিক দিয়েও প্রাধান্য বিস্তার করার এবং পার্থিব বিষয়াদিতে তার ইচ্ছা মতো যে কোন হুকুম দেবে আর তার বিধি-নিষেধকে উচ্চতর আইন হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তার সামনে মানুষকে মাথা নত করতে হবে।

এ কথা পৃথিবীর ভুয়া শাসনকর্তারা আগেও কখনো মেনে নেয়নি এবং আজো মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা সব সময় একথা বলে এসেছে, আমরা পূর্ণ স্বাধীন। কোন উপাস্যের আমাদের রাজনীতিতে ও আইনে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। এটিই ছিল পার্থিব রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যসমূহের সাথে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁদের অনুসারী সংস্কারকদের সংঘাতের আসল কারণ।

তারা এদের কাছ থেকে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করেছেন এবং এরা এর জবাবে যে কেবলমাত্র নিজেদের স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের দাবী পেশ করতে থেকেছে তাই নয় বরং এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরাধী ও বিদ্রোহী গণ্য করেছে, যে তাদের ছাড়া অন্য কাউকে আইন ও রাজনীতির ময়দানে উপাস্য হিসেবে মেনে নিয়েছে। এ ব্যাখ্যা থেকে ফেরাউনের এ কথাবার্তার সঠিক মর্ম ভালোভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। যদি কেবলমাত্র পুজা-অর্চনা ও নযরানা-মানত পেশ করার ব্যাপার হতো, তাহলে হযরত মূসা অন্য দেবতাদের বাদ দিয়ে একমাত্র আর আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে এর হকদার মনে করেন এটা তার কাছে কোন আলোচনার বিষয়ই হতো না। যদি কেবলমাত্র এ অর্থেই মূসা আলাইহিস সালাম তাকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাওহীদমুখী হবার দাওয়াত দিতেন তাহলে তার ক্রোধোন্মত্ত হবার কোন কারণই ছিল না। বড় জোর সে যদি কিছু করতো তাহলে নিজের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করতো অথবা হযরত মূসাকে বলতো, আমার ধর্মের পণ্ডিতদের সাথে বিতর্ক করে নাও।

কিন্তু যে জিনিসটি তাঁকে ক্রোধোন্মত্ত করে দিয়েছে সেটি ছিল এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে পেশ করে তাকে এমনভাবে একটি রাজনৈতিক হুকুম পৌছিয়ে দিয়েছেন যেন সে একজন অধীনস্থ শাসক এবং একজন উর্ধতন শাসনকর্তার দূত এসে তার কাছে এ হুকুমের প্রতি আনুগত্য করার দাবী করছেন। এ অর্থে সে নিজের ওপর কোন রাজনৈতিক ও আইনগত প্রাধান্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বরং তার কোন প্রজা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে উর্ধতন শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেবে, এটাও সে বরদাশত করতে পারতো না।

তাই সে প্রথমে চ্যালেঞ্জ করলো 'রাব্বুল আলামীনের' পরিভাষাকে। কারণ তাঁর পক্ষ থেকে যে বার্তা নিয়ে আসা হয়েছিল তার মধ্যে শুধুমাত্র ধর্মীয় উপাসনার নয় বরং সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ভাবধারা সুস্পষ্ট ছিল। তারপর হযরত মূসা যখন বারবার ব্যাখ্যা করে বললেন, তিনি যে রব্বুল আলামীনের বার্তা এনেছেন তিনি কে? তখন সে পরিষ্কার হুমকি দিল, মিসর দেশে তুমি যদি আমার ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌম কর্তৃত্বের নাম উচ্চারণ করবে তাহলে তোমাকে জেলখানার ভাত খেতে হবে।

এই বিষয়টি বর্তমানেও করা হচ্ছে। বর্তমান পৃথিবীতে শাসকদল আল্লাহকে বিশেষ স্থানে গ্রহণ করতে রাজী আছে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহর কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে তারা কোন ক্রমেই রাজী নয়। এর নাম তারা দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এই ভাবেই তারা ফেরাউনের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

একটি সাক্ষাত অজগর

আল্লাহর নবীর প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে জালিম ফিরআউন হুমকি দিলো, তুমি যদি আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে আইন দাতা, বিধান দাতা তথা রব হিসাবে স্বীকৃতি দাও, আমাকে যদি রব হিসাবে মেনে নাও, তাহলে তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এ পর্যায়ে একান্ত বাধ্য হয়েই বললেন, নবী হিসাবে মহান আল্লাহ আমাকে নিদর্শন দান করেছেন। সে নিদর্শন তো প্রমাণ করবে যে, নবী হিসাবে, মানুষের পথ প্রদর্শক হিসাবে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সূরা শুআরার ৩০-৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ-قَالَ فَأْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ-فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ-وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ-

মূসা বললো, আমি যদি তোমার সামনে একটি সুস্পষ্ট জিনিষ আনি তবুও? ফিরআউন বললো, বেশ, তুমি আনো যদি তুমি সত্যবাদী হও। (তার মুখ থেকে একথা বের হতেই) মূসা নিজের লাঠিটি ছুড়ে মারলো। তৎক্ষণাৎ সেটি হলো একটি সাক্ষাত অজগর। তারপর সে নিজের হাত (বগলের ভেতর থেকে) টেনে বের করলো এবং তা সকল প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে চক্‌মক্ করছিল।

অর্থাৎ যদি সত্যিই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের, আকাশ ও পৃথিবীর এবং পূর্ব ও পশ্চিমের রব-এর পক্ষ থেকে যে আমাকে পাঠানো হয়েছে এর সপক্ষে সুস্পষ্ট আলামত পেশ করি, তাহলে এ অবস্থায়ও কি আমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করা হবে এবং আমাকে কারাগারে পাঠানো হবে? হযরত মূসার প্রশ্নের জবাবে ফেরাউনের এই কথা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে যে, প্রাচীন ও আধুনিক কালের মুশরিকদের থেকে তার অবস্থা ভিন্নতর ছিল না। অন্যসব মুশরিকদের মতোই সে আল্লাহকে অতিপ্রাকৃত অর্থে সকল উপাস্যের উপাস্য বলে বিশ্বাস করতো এবং তাদের মতো এ কথাও স্বীকার করতো যে, বিশ্ব-জাহানের সকল দেবতার থেকে তাঁর শক্তি বেশী।

তাই হযরত মূসা তাঁকে বলেন, যদি তুমি আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত বলে বিশ্বাস না করো, তাহলে আমি এমন সব নিদর্শন পেশ করবো যা থেকে আমি যে তাঁর প্রেরিত তা প্রমাণ হয়ে যাবে। আর এ কারণে সে-ও জবাব দেয়, ঠিক আছে যদি তোমার দাবী সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আনো তোমার নিদর্শন। অন্যথায় সোজা কথা, যদি সে আল্লাহর অস্তিত্ব অথবা তাঁর বিশ্ব-জাহানের মালিক হবার ব্যাপারেই সন্দিহান হতো, তাহলে নিদর্শনের প্রশ্নই উঠতে পারতো না। নিদর্শনের প্রশ্ন তো তখনই সামনে আসতে পারে যখন আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হওয়া স্বীকৃত হয় কিন্তু হযরত মূসা তাঁর প্রেরত কি না এ ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দেয়।

মূসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর নিজের লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং সহসাই তা এক জীবন্ত অজগরে পরিণত হলো। তারপর তিনি নিজের হাত বগলে প্রবেশ করিয়ে

তারপর নিজের হাত টেনে বের করলেন আর সব দৃষ্টিমান লোকের সম্মুখে তা ঝকমক করতে লাগলো। এই দু'টি নিদর্শন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে দেয়া হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই কথা প্রমাণ করা যে, তিনি বিশ্ব-ভূমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা ও সার্বভৌম আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, নবী-পয়গাম্বরগণ যখনই নিজদেরকে রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ হিসাবে পেশ করেছেন, তখনই লোকেরা তাঁদের কাছে দাবি জানিয়েছে যে, তুমি যদি সত্যই রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হয়ে থাকো, তাহলে তোমার হাতে প্রাকৃতিক নিয়মের সাধারণ ক্রিয়াশীলতার বিপরীত ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়া উচিত। তা দ্বারা এই কথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হবে যে, তোমার সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ নিজেই সরাসরি হস্তক্ষেপের সাহায্যে এই ঘটনা সংঘটিত করিয়েছেন।

এই লোকটি দেশ দখল করবে

ইতিহাস থেকে জানা যায় মিশরে যে জাতিয়তাবাদী বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, সে বিপ্লবের ফলে বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে কিবতীগণ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়ে বনী ইসরাঈলীদের ওপরে নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালাচ্ছিল। মূসা আলাইহিস্ সালাম ছিলেন যেহেতু বনী ইসরাঈলী সন্তান, এ কারণে ফিরআউন তার জাতিকে হযরত মূসার আহ্বান হতে ফিরিয়ে রাখার জন্য বলেছিল যে, এই ব্যক্তি এ দেশ দখল করার জন্য এসেছে এবং কিবতীদেরকে সে এদেশ থেকে বের করে দেবে। তার এ কথা বলার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ ঘটনা পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى-قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى-فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لاَّ نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلاَ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى-قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى-فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى-قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ-وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى-فَتَنَازَعُوْا

اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى-قَالُوْا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى- فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا-وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى-قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى-قَالَ بَلْ اَلْقُوْا-فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى-فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى-قُلْنَا لاَ تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى-وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ-وَلاَ يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى-

আমি ফিরআউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখালাম কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করতে থাকলো এবং মেনে নিল না। বলতে লাগলো, হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছো যে, নিজের যাদুর জোরে আমাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে দেবে? বেশ, আমরাও তোমার মোকাবিলায় অনুরূপ যাদু আনছি, ঠিক করো কবে এবং কোথায় মোকাবিলা করবে, আমরাও এ চুক্তির অন্যথা করবো না, তুমিও না। খোলা ময়দানের সামনে এসে যাও। মূসা বললো, উৎসবের দিন নির্ধারিত হলে এবং পূর্বাহ্নে লোকদেরকে জড়ো করা হবে। ফিরআউন পেছনে ফিরে নিজের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করলো এবং তারপর মোকাবিলায় এসে গেলো। মূসা (যথা সময় প্রতিপক্ষ দলকে সম্বোধন করে) বললো, দুর্ভাগ্য পীড়িতরা! আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ো না, অন্যথায় তিনি কঠিন আযাব দিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন। যে-ই মিথ্যা রচনা করেছে সে-ই ব্যর্থ হয়েছে। একথা শুনে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেলো এবং তারা চুপিচুপি পরামর্শ করতে লাগলো শেষে কিছু লোক বললো এরা দু'জন তো নিছক যাদুকর, নিজেদের যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা এবং তোমাদের আদর্শ জীবন যাপন পদ্ধতি ধ্বংস করে দেয়াই এদের উদ্দেশ্য। আজ নিজেদের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করে নাও এবং একজোট হয়ে ময়দানে এসো। ব্যস, জেনে রাখো, আজকে যে প্রাধান্য লাভ করবে সেই জিতে গেছে। যাদুকররা বললো, হে মূসা! তুমি নিক্ষেপ করবে, না কি আমারই আগে নিক্ষেপ করবো? মূসা বললো-

না, তোমরাই নিক্ষেপ করো। অকস্মাৎ তাদের যাদুর প্রভাবে তাদের দড়ি-দড়া ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে বলে মূসার মনে হতে লাগলো এবং মূসার মনে ভীতির সঞ্চার হলো আমি বললাম, ভয় পেয়ো না, তুমিই প্রাধান্য লাভ করবে। ছুঁড়ে দাও তোমার হাতে যা কিছু আছে, এখনই এদের সব বানোয়াট জিনিসগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে, এরা যা কিছু বানিয়ে এনেছে এতো যাদুকরের প্রতারণা এবং যাদুকর যেভাবেই আসুক না কেন কখনো সফল হতে পারে না। (সূরা ত্বা-হা-৫৬-৬৯)

যাদু বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে লাঠি ও সাদা হাতকে। সূরা আ'রাফ ও সূরা শু'আরায় বিস্তারিতভাবে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা প্রথম সাক্ষাতের সময় প্রকাশ্য দরবারে এ কথা পেশ করেছিলেন। এ মু'জিযা দেখে ফিরআউন যেরকম দিশেহারা হয়ে পড়েছিল তা কেবলমাত্র তার এ একটি বাক্য থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে যে, তোমার যাদুর জোরে তুমি আমাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে দিতে চাও। কোন যাদুকর যাদুর জোরে কোন দেশ জয় করে নিয়েছে, দুনিয়ার ইতিহাসে পূর্বে কখনো এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি এবং পরবর্তীকালেও ঘটতে দেখা যায়নি।

ফেরাউনের নিজের দেশে শত শত যাদুকর ছিল, যারা যাদুর খেলা দেখিয়ে পুরস্কার নেবার জন্য হাত পাততো। এ জন্য ফেরাউনের একদিকে হযরত মূসাকে যাদুকর বলা এবং অন্যদিকে তিনি তার রাজ্য ছিনিয়ে নিতে চান বলে আশংকা প্রকাশ করা তার স্পষ্ট দিশেহারা হয়ে যাবার আলামত পেশ করে। আসলে হযরত মূসার ন্যায়সংগত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা এবং মু'জিয়াগুলো দেখে সে বুঝতে পেরেছিল যে, শুধুমাত্র তার সভাসদরাই নয় বরং তার সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সকল প্রজাই এ থেকে প্রভাবিত না হয়ে পারবে না। তাই সে মিথ্যা, প্রতারণা ও হিংসার পথে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা শুরু করলো।

সে বললো, এসব মু'জিযা নয়, যাদু এবং আমার রাজ্যের প্রত্যেক যাদুকরই এভাবে লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখাতে পারে। সে বললো, হে জনতা! ভেবে দেখো, এ ব্যক্তি তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট ও জাহান্নামী গণ্য করছে। সে আরো বললো, হে জনতা! সাবধান হয়ে যাও, এ ব্যক্তি নবী-রাসূল কিছুই নয়, এ আসলে ক্ষমতালোভী। এ ব্যক্তি ইউসুফের যামানার মতো আবার বনী ইসরাঈলকে এখানে শাসন কর্তৃত্বে বসিয়ে দিতে এবং কিবতীদের হাত থেকে কর্তৃত্ব ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায়। এসব অস্ত্র ব্যবহার করে ফিরআউন সত্যের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন

করতে চাচ্ছিল। ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল, একবার যাদুকরদের লাঠি ও দড়ি-দড়ার সাহায্যে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দেই তাহলে মূসার মু'জিযার যে প্রভাব লোকদের ওপর পড়েছে তা তিরোহিত হয়ে যাবে। হযরত মূসাও মনে-প্রাণে এটাই চাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এ জন্য কোন পৃথক দিন ও স্থান নির্ধারণ করার দরার নেই। উৎসবের দিন কাছেই এসে গেছে। সারা দেশের লোক এদিন রাজধানীতে চলে আসবে। সেদিন যেখানে জাতীয় মেলা অনুষ্ঠিত হবে সেই ময়দানেই এই প্রতিযোগিতা হবে। সমগ্র জাতিই এ প্রতিযোগিতা দেখবে। আর সময়টাও এমন হতে হবে যখন দিনের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, যাতে কারো সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করার কোন অবকাশই না থাকে।

ফিরআউন ও তার সভাসদদের দৃষ্টিতে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। তারা এর ফায়সালার সাথে নিজেদের ভাগ্যের ফায়সালা জড়িত মনে করছিল। সারা দেশে লোক পাঠানো হয়। যেখানে যে অভিজ্ঞ-পারদর্শী যাদুকর পাওয়া যায় তাকেই সংগে করে নিয়ে আসার হুকুম দেয়া হয়। এভাবে জনগণকে হাযির করার জন্যও বিশেষভাবে প্রেরণা দান করা হয়। এভাবে বেশি বেশি লোক একত্র হয়ে যাবে এবং তারা স্বচক্ষে যাদুর তেলেসমাতি দেখে মূসার লাঠির ভয় ও প্রভাব থেকে নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখতে পারবে। প্রকাশ্যে বলা হতে লাগলো, আমাদের আদর্শ এখন যাদুকরদের তেলেসমাতির ওপর নির্ভর করছে। তারা জিতলে আমাদের আদর্শ বা ধর্ম বেঁচে যাবে, নয়তো মূসার ইসলামী আদর্শ চারদিকে ছেয়ে যাবেই।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর যে সম্বোধনের কথা উল্লেখিত আয়াতে করা হয়েছে, এই সম্বোধন জনগণের প্রতি ছিল না। কারণ হযরত মূসা মু'জিযা দেখাচ্ছেন, না যাদু দেখাচ্ছেন-তখনো পর্যন্ত জনগণ এ ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি। কাজেই এ সম্বোধন ছিল ফিরআউন ও তার সভাসদদের প্রতি। কারণ তারাই তাঁকে যাদুকর গণ্য করছিল।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বলেছিলেন, দুর্ভাগ্য পীড়িতরা! আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ো না—অর্থাৎ এ মু'জিযাকে যাদু এবং নবীকে যাদুকর গণ্য করো না।

আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের কথা শুনে তাঁর প্রতিপক্ষের ভেতরে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা গোপনে পরামর্শ করছিল।

এ থেকে জানা যায়, এরা মনে মনে নিজেরাই নিজেদের দুর্বলতা অনুভব করছিল। এরা জানতো, হযরত মূসা যা কিছু দেখিয়েছেন তা যাদু নয়। এরা প্রথম থেকেই দোটানা মনোভাব ও ভীতি সহকারে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। তারপর যখন নির্ধারিত সময়ে হযরত মূসা তাদেরকে উচ্চস্বরে আহ্বান জানিয়ে সতর্ক করে দিলেন তখন অকস্মাত তাদের দৃঢ় সংকল্প কেঁপে উঠলো।

সম্ভবত তারা এ বিষয়ে মতবিরোধ করে থাকবে যে, এত বড় উৎসবে, যেখানে সারা দেশের লোক জমা হয়ে গেছে সেখানে খোলা ময়দানে দিনের উজ্জ্বল আলোকে এ প্রতিযোগিতায় নামা ঠিক হবে কি না। যদি এখানে আমরা পরাজিত হয়ে যাই এবং সবার সামনে যাদু ও মু'জিযার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে তখন আর করার কিছুই থাকবে না।

দু'টি বিষয় ছিল তাদের মূল প্রতিপাদ্য। এক, যদি যাদুকররাও মূসার মতো লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দেয় তাহলে সাধারণ জনসমাবেশে মূসার যাদুকর হওয়া প্রমাণ হয়ে যাবে। দুই, তারা হিংসার আগুন জ্বালিয়ে শাসক শ্রেণীর মনে অন্ধ আবেগ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল। তাদেরকে এই মর্মে ভয় দেখাচ্ছিল যে, মূসার বিজয় দেশের কর্তৃত্ব ক্ষমতা তোমাদের হস্তচ্যুত হওয়া এবং তোমাদের আদর্শ জীবন যাপন পদ্ধতির অপমৃত্যুর নামান্তর। তারা দেশের প্রভাবশালী শ্রেণীকে ভয় দেখাচ্ছিল এই বলে যে, মূসা যদি দেশের কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে তাহলে তোমাদের এ শিল্প, চারুকলা, সুন্দর ও মোহময় সংস্কৃতি এবং তোমাদের নারী স্বাধীনতা তথা এমন সবকিছু যেগুলো ছাড়া জীবনের সুখ ও আনন্দ উপভোগই করা যায় না, একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর তো শুরু হবে নিছক "কাঠমোল্লাদের" রাজত্ব, যা সহ্য করার চাইতে মরে যাওয়াই ভালো।

আজ নিজেদের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করে নাও এবং একজোট হয়ে ময়দানে এসো–অর্থাৎ এদের মোকাবিলায় সংযুক্ত মোর্চা গঠন করো। এ সময় যদি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ দেখা দেয় এবং প্রতিযোগিতার সংগীন মুহূর্তে সাধারণ জনতার সামনে তোমাদের মধ্যে যদি এ ধরনের কানাকানি ও ইতস্তত ভাব চলতে থাকে তাহলে এখনই পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে এবং লোকেরা মনে করতে থাকবে তোমাদের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই নিশ্চিত নও বরং সংশয় দোলায়িত চিত্তে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছো।

বর্ণনার ধরণ দেখে অনুমান করা যায় যে, যখনই হযরত মূসার মুখ থেকে "নিক্ষেপ করো' শব্দ বের হয়েছে তখনই যাদুকররা অকস্মাৎ নিজেদের লাঠিসোটা ও দড়ি-দড়াগুলো তাঁর দিকে ছুড়ে দিয়েছে এবং হঠাৎই তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে যেন শত শত সাপ কিল বিল করতে করতে তাঁর দিকে দৌড়ে চলে আসছে। এ দৃশ্য দেখে হযরত মূসা তাৎক্ষণিকভাবে নিজের মধ্যে যদি একটি আশংকার ভাব অনুভব করে থাকেন তাহলে এটা কোন অবাক হবার কথা নয়। মানুষ তো সর্বাবস্থায় একজন মানুষই। একজন নবী–নবী হলেও মানবিক আবেগ-অনুভূতি এবং অন্যান্য মানবিক চাহিদা থেকে তিনি কখনোই মুক্ত নন। তাছাড়া এ সময় হযরত মূসা স্বাভাবিকভাবে এ আশংকাও করে থাকতে পারেন যে, মু'জিয়ার সাথে এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ দৃশ্য দেখে জনসাধারণ নিশ্চয়ই বিভ্রাটে পড়ে যাবে এবং তাদের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

ছুঁড়ে দাও তোমার হাতে যা কিছু আছে, এখনই এদের সব বানোয়াট জিনিসগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে–হতে পারে, মু'জিযার মাধ্যমে যে অজগর সৃষ্টি হয়েছিল তা সামনের যেসব লাঠি ও দড়িদড়া সাপের মতো দেখাচ্ছিল সেগুলোকে গিলে ফেলেছিল। কিন্তু এখানে এবং কোরআনের অন্যান্য স্থানে যেসব শব্দের সাহায্যে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে বাহ্যত অনুমিত হয় যে, এ অজগরটি লাঠি ও দড়িগুলো গিলে ফেলেনি বরং যে যাদুর প্রভাবে সেগুলো সাপ বলে মনে হচ্ছিল সে প্রভাবটিই নষ্ট করে দিয়েছিল।

এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন দক্ষ যাদুকর

সূরা আশ্ শু'আরার ৩৪-৪৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهُ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ-يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ-فَمَا ذَا تَاْمُرُوْنَ-قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ-يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ-فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ-وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ-لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ-فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ-قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ

اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ–قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ– فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ–فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ–

ফেরাউন তার চারপাশে উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে বললো, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন দক্ষ যাদুকর। নিজের যাদুর জোরে সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এখন বলো তোমরা কী হুকুম দিচ্ছো? তারা বললো, তাকে ও তার ভাইকে আটক করো এবং শহরে শহরে সংবাদদাতা পাঠাও। তারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে তোমার কাছে নিয়ে আসুক। তাই একদিন নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদেরকে একত্র করা হলো। এবং লোকদের বলা হলো, তোমরাও কি সমাবেশে যাবে? হয়তো আমরা যাদুকরদের আদর্শের অনুসরণের ওপরই বহাল থাকবো, যদি তারা বিজয়ী হয়। যখন যাদুকররা ময়দানে এলো, তারা ফেরাউনকে বললো, আমরা কি পুরস্কার পাবো, যদি আমরা বিজয়ী হই? সে বললো- হ্যাঁ, আর তোমরা তো সে সময় নিকটবর্তীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। মূসা বললো, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো। তারা তখনই নিজেদের দড়ি-দড়া ও লাঠিসোঁটা নিক্ষেপ করলো এবং বললো, ফেরাউনের ইজ্জতের কসম, আমরাই বিজয়ী হবো। তারপর মূসা নিজের লাঠিটি নিক্ষেপ করলো। আকস্মাৎ সে তাদের কৃত্রিম কীর্তিগুলো গ্রাস করতে থাকলো। (আল কোরআন)

মু'জিযা দু'টির শ্রেষ্ঠত্ব এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। মাত্র এক মুহূর্ত আগে নিজের এক সাধারণ প্রজাকে দরবারের মধ্যে রিসালাতের কথাবার্তা ও বনী ইসরাঈলের মুক্তির দাবী করতে দেখে ফেরাউন তাঁকে পাগল ঠাউরিয়েছিল। কারণ তার দৃষ্টিতে একটি গোলাম জাতির কোন ব্যক্তির পক্ষে তার মতো পরাক্রমশালী বাদশাহর সামনে এ ধরনের দুঃসাহস করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা।

এ কারণে সে এই বলে ধমক দিচ্ছিল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে আইনদাতা বিধানদাতা হিসেবে মেনে নাও, তাহলে তোমাকে কারাগারে আটকে মারবো। আর এখন মাত্র এক মুহূর্ত পরে এ নিদর্শনগুলো দেখার সাথে সাথেই তার মধ্যে এমন ভীতির সঞ্চার হলো যে, নিজের বাদশাহী ও রাজ্য হারাবার ভয়ে

সে ভীত হয়ে পড়লো এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রকাশ্য দরবারে নিজের অধস্তন কর্মচারীদের সামনে সে যে কেমন অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে চলছে সে অনুভূতিই সে হারিয়ে ফেললো।

বনী ইসরাঈলের মতো একটি নির্যাতিত-নিপীড়িত জাতির দু'টি লোক যুগের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী বাদশাহর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের সাথে কোন লোক-লস্কর ছিল না। তাদের জাতির মধ্যে কোন সক্রিয়তা ও প্রাণশক্তি ছিল না। দেশের কোথাও বিদ্রোহের সমান্যতম আলাতমও ছিল না। দেশের বাইরের অন্য কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিও তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল না। এ অবস্থায় শুধুমাত্র একটি লাঠিকে সর্পে পরিণত হতে ও একটি হাতকে ঔজ্জ্বল্য বিকীরণ করতে দেখে অকস্মাৎ তার এই বলে চিৎকার করে ওঠা যে, এ দু'টি সহায়-সম্বলহীন লোক আমাকে হিংসাহনচ্যুত করবে এবং সমগ্র শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বেদখল করে দেবে-একথার কী অর্থ হতে পারে? এ ব্যক্তি যাদুবলে এসব করে ফেলবে-একথা বলাও তার অধ্যতিক হতবুদ্ধি হওয়ারই প্রমাণ।

যাদুবলে দুনিয়ায় কখনো কোথাও কোন রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়নি, কোন দেশ বিজিত হয়নি, কোন যুদ্ধ জয়ও হয়নি। যাদুকররা তো তার নিজের দেশেই ছিল এবং তারা বড় বড় তেলেসমাতি দেখাতে পারতো। কিন্তু সে নিজে জানতো, ভেল্কিবাজীর খেলা দেখিয়ে পুরস্কার নেয়া ছাড়া তাদের আর কোন কৃতিত্ব নেই। রাজ্য তো দূরের কথা, সে বেচারারা তো রাজ্যের একজন সামান্য পুলিশ কনস্টেবলকেও চ্যালেঞ্জ করার হিম্মত রাখতো না। ফেরাউন তার পরামর্শদাতাদের কাছে আবেদন করেছিল, মুসার সাথে কিভাবে মোকাবেলা করা যায়—তার এ কথায় বুঝা যায় যে, সে অত্যধিক হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। সে নিজেকে আইনদাতা, বিধানদাতা, উপাস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল এবং এদের সবাইকে করে রেখেছিল নিজের গোলাম। কিন্তু এখন উপাস্য সাহেব ভয়ের চোটে অস্থির হয়ে বান্দাদের কাছেই জিজ্ঞেস করছে তোমরা কি হুকুম দাও। অন্য কথায় বলা যায়, সে যেন বলতে চাচ্ছে, আমার বুদ্ধি তো এখন বিকল হয়ে গেছে, তোমরাই বলো আমি কিভাবে এ বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

কিবতীদের জাতীয় ঈদের দিনকে এ প্রতিদ্বন্দ্বীতার দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে উৎসব ও মেলা উপলক্ষে আগত সমস্ত লোকেরা এ বিরাট প্রতিযোগিতা দেখতে পাবে এটাই ছিল উদ্দেশ্য। এ জন্য সময়

নির্ধারিত করা হয়েছিল সূর্য আকাশে উঠে চারদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ার পর। এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে সবার চোখের সামনে উভয় পক্ষের শক্তির প্রদর্শনী হবে এবং আলোর অভাবে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবার অবকাশ থাকবে না। যে সময়ে এই প্রতিযোগিতা হয়েছিল, তখন ফেরাউনের পক্ষ হতে শুধুমাত্র ঘোষণা ও বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করা হয়নি বরং জনগণকে উদ্দীপিত ও উত্তেজিত করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখার জন্য ময়দানে হাজির করার উদ্দেশ্যে লোকও নিয়োগ করা হয়। এ থেকে জানা যায়, প্রকাশ্য দরবারে হযরত মূসা যেসব মু'জিযা দেখিয়েছিলেন সেগুলোর খবর সাধারণ লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশের লোকেরা এতে প্রভাবিত হতে চলেছে বলে ফেরাউনের মনে আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই সে চাচ্ছিল বেশি বেশি জনসমাগম হোক এবং লোকেরা দেখে নিক লাঠির সাপে পরিণত হওয়া কোন বড় কথা নয়, আমাদের দেশের প্রত্যেক যাদুকরও এ ভেল্কিবাজী দেখাতে পারে।

হয়তো আমরা যাদুকরদের আদর্শের অনুসরণের ওপরই বহাল থাকবো, যদি তারা বিজয়ী হয়–এ বাক্যাংশটি প্রমাণ করছে যে, ফেরাউনের দরবারের যেসব লোক হযরত মূসার মু'জিযা দেখেছিল এবং দরবারের বাইরের যেসব লোকের কাছে এর নির্ভরযোগ্য খবর পৌঁছে গিয়েছিল, নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ও আদর্শের ওপর তাদের বিশ্বাসের ভিত নড়ে যাচ্ছিল এবং এখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে কাজ করেছেন তাদের যাদুকররাও কোনক্রমে তা করিয়ে দেখিয়ে দিক, এরই ওপর তাদের ধর্মের ও আদর্শের ওপর টিকে থাকা নির্ভর করছিল।

ফেরাউন ও তার রাজ্যের কর্মকর্তাগণ একে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর মোকাবিলা মনে করছিল। তাদের প্রেরিত লোকেরা সাধারণ মানুষের মগজে এ চিন্তা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করছিল যে, যাদুকররা যদি কামিয়াব হয়ে যায়, তাহলে মূসার ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করার হাত থেকে আমরা বেঁচে যাবো, অন্যথায় আমাদের ধর্ম ও আদর্শের অপমৃত্যু ঘটবে।

যখন যাদুকররা ময়দানে এলো, তারা ফেরাউনকে বললো, 'আমরা কি পুরস্কার পাবো, যদি আমরা বিজয়ী হই–এই কথাগুলো ছিল ফেরাউনের যাদুকরদের। এরাই এসেছিল হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের মোকাবেলায় ফেরাউনের শাসন এবং আদর্শ টিকিয়ে রাখার জন্য। আর এরাই ছিল মুশরিকী ধর্মের রক্ষক এবং এই ছিল

মুশরিকী ধর্মের রক্ষকদের অবস্থা। মূসা আলাইহিস সালামের হামলা থেকে তারা নিজেদের ধর্মকে বাঁচাতে চাচ্ছিল। এ জন্য চূড়ান্ত মোকাবিলার সময় তাদের মধ্যে যে লোভের সঞ্চার হয়েছিল তা ছিল এই যে, তারা বাজী জিততে পারলে সরকার বাহাদুর থেকে কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে। তারা তাদের সরকার ফেরাউন এবং তাদের ধর্ম ও আদর্শ রক্ষার উদ্দেশ্যে আসেনি এবং মনে হয় এসবের প্রতি তাদের মনের শ্রদ্ধাও ছিল না।

ফেরাউন তাদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিল যে, তোমরা তো সে সময় নিকটবর্তীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে–আর এ ছিল সমকালীন বাদশাহর পক্ষ থেকে ধর্ম ও জাতির সেবকদেরকে প্রদান করার মতো সবচেয়ে বড় পুরস্কার। অর্থাৎ কেবল টাকা পয়সাই পাওয়া যাবে না, দরবারে আসনও পাওয়া যাবে। এভাবে ফেরাউন ও তার যাদুকররা প্রথম পর্যায়েই নবী ও যাদুকরের বিরাট নৈতিক পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। একদিকে ছিল উন্নত মনোবল। তিনি নির্ভীক কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে পাঠিয়েছেন, বনী ইসরাঈলকে আমার হাতে সোপর্দ করে দাও। এরপর ফেরাউনের সাথে মুখোমুখি বিতর্ক করতে তিনি সামান্যতম সংকোচ অনুভব করছেন না। তার হুমকি ধমকিকে তিলার্ধও গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

অনদিকে ফেরাউনের দলবলের হীন মনোবলের প্রকাশ। বাপ-দাদার ধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে যাদুকরদেরকে ফেরাউনের দরবারেই ডেকে পাঠানো হচ্ছে। এরপরও হাত জোড় করে তারা বলছে, জনাব! কিছু ইনাম তো মিলবে? আর জবাবে অর্থ পুরস্কার ছাড়াও রাজ নৈকট্যও লাভ করা যাবে শুনে খুশীতে বাগবাগ। নবী কোন্ প্রকৃতির মানুষ এবং তাঁর মোকাবিলায় যাদুকররা কেমন ধরনের লোক, এ দু'টি বিপরীত চরিত্র আপনা আপনি একথা প্রকাশ করে দিচ্ছে। কোন ব্যক্তি নির্লজ্জতার সকল সীমালংঘন না করলে নবীকে যাদুকর বলার দুঃসাহস দেখাতে পারে না।

মিথ্যাবাদীরা লাঞ্ছিত হলো

আল্লাহর নবী হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে সমকালিন ইসলাম বিরোধী শক্তি পরাজিত করার জন্য একত্রিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের কৌশল মহান আল্লাহ্ এমনভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন যে, তাদের শতাব্দী ব্যাপী অর্জিত যাদুবিদ্যা

মুহূর্তের মধ্যে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন–

قَالَ اَلْقُوْا-فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ-وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ-فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ-فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ-

তারা যে যাদুর 'বান' ছাড়লো, তা লোকদের দৃষ্টিকে যাদু করলো ও তাদের হৃদয়কে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিল। এক কথায়, তারা খুব সাংঘাতিক যাদু দেখালো। আমি মুসাকে বললাম, তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। সেটা নিক্ষিপ্ত হয়েই সহসা তাদের এই মিথ্যা 'তেলেসমাত'কে গিলে ফেলতে লাগলো। এইভাবে যা হক ছিল, তাই হক প্রমাণিত হলো। আর তারা যা কিছু বানিয়ে রেখেছিল, তা সবই বাতিল হয়ে গেল। ফিরাউন এবং তার সঙ্গীরা মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং (বিজয়ী হওয়ার পরিবর্তে) লাঞ্ছিত হলো। (সূরা আরাফ-১১৬-১১৯)

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে। ফিরাউন তখনকার সিরিয়া হতে লিবিয়া পর্যন্ত এবং রোম সাগরের বেলাভূমি হতে আবিসিনিয়া পর্যন্ত বিরাট সাম্রাজ্যের একমাত্র বাদশাহই শুধু নয় উপাস্য দেবতাও ছিল। এই ধরনের ক্ষমতা সম্পন্ন এক বাদশাহর দরবারে গোলাম জাতির এক সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তি যদি সহসা উঠে দাঁড়ায়, তাহে এত বড় সাম্রাজ্যের উপর কি বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসতে পারে আর এই এক ব্যক্তিই বা কি করে মিশর সরকারের আসন টলিয়ে দিতে পারে? শাসক-শ্রেণীর লোকজনসহ গোটা রাজ পরিবারকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মসনদ হতে কি করে বেদখল করতে পারে? তাছাড়া এই ব্যক্তি তো কেবলমাত্র নবুয়্যাতের ও বনী-ইসরাঈলের মুক্তির দাবিই পেশ করেছিলেন। কেবল এইটুকু কথায়ই কোন রাষ্ট্র বিপ্লবের বিপদ ঘনীভূত হতে পারে কি করে? তিনি তো কোন প্রকার রাষ্ট্র-সম্পর্কিত কথাই তুলেননি, তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনে এই আতংক জাগ্রত হলো কেন?

এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নবুয়্যাতের দাবির মধ্যেই এর কারণ অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপকভাবে নিহিত ছিল। কেননা তাঁর এই নবুয়্যাতের দাবির অর্থ ছিল এই যে, তিনি সম-সাময়িক জীবন ব্যবস্থাকে

সমগ্রিকভাবে পরিবর্তন করতে চান, তাতে অবশ্যই রাজনৈতিক ব্যবস্থাও শামিল রয়েছে। আর নিজেকে রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধিরূপে পেশ করার অনির্বার্য অর্থই হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষের কাছে স্থায়ী ও নিরংকুশ আনুগত্যের দাবি করছেন। কেননা রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি কখনো অপর কারো অনুগত ও প্রজা-সাধারণ হয়ে থাকার জন্য আসেন না-আসেন অনুগত্য 'রাখাল' তথা নেতা হয়ে থাকার উদ্দেশ্যে। পক্ষান্তরে কোন কাফির বাদশাহের শাসনাধিকার মেনে নেয়া তাঁর নবী বা রাসূল হবারও পরিপন্থী।

এই কারণেই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের মুখে নবী ও রাসূল হবার দাবি শুনতেই ফিরাউন ও তার রাজন্যবর্গের সম্মুখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও তামুদ্দুনিক বিপ্লবের আশংকা দেখা দিল। কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে যখন তার ভাই ছাড়া আর কেউই সাহায্যকারী হিসাবে ছিল না এবং সাপে রূপান্তরিত একখানা লাঠি ও উজ্জ্বল আলোকমণ্ডিত একখানা হাত ছাড়া তাঁর জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি হবার অপর কোন প্রমাণও ছিল না, তখন তার এই দাবিকে মিশরের শাহী দরবারে এতদূর গুরুত্ব দেয়া হলো কেন?

এর কারণ হলো, মূসা আলাইহিস্ সালামের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ফিরাউন এবং তার দরবারের লোকেরা খুব ভালভাবেই ওয়াকিফহাল ছিল। তাঁর পবিত্র ও দৃঢ় চরিত্র সমন্বিত ব্যক্তি সত্তা, তার অসাধারণ যোগ্যতা, নেতৃত্ব ও জন্মগত শাসন ক্ষমতার খবর সকলেরই জানা ছিল। তালমুদ ও ইউসীফুস-এর বর্ণনাকে নির্ভুল হিসাবে গ্রহণ করা হলে বলা যেতে পারে যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এই সব জন্মগত যোগ্যতা-প্রতিভা ছাড়াও ফিরাউনের শাসনাধীনে নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, দেশ শাসন ও সৈন্যবাহিনী পরিচালনার পূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছিলেন।

কেননা তিনি শাহী পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং শাহী পরিবারের লোকদেরকে সেই শিক্ষাই দেয়া হতো। শাহজাদা রূপে পরিগণিত হবার সময় তিনি আবিসিনিয়া অভিযানে গিয়ে নিজেকে একজন সুদক্ষ সেনাধ্যক্ষরূপে প্রমাণ করেছিলেন। আর শাহী প্রাসাদে লালিত-পালিত হবার ও ফিরাউনী শাসনাধীনে দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে অভিষিক্ত থাকার কারণে কম-বেশী যতটুকু দুর্বলতাই পাওয়া যাচ্ছিল, আট-দশ বৎসর পর্যন্ত মাদইয়ান অঞ্চলে মরুজীবন অতিবাহিত করা ও ছাগল চরানোর কারণে তা এতদিনে দূর হয়ে গিয়েছিল। এখন ফিরাউনের দরবারে এমন একজন

বয়ঃপ্রাপ্ত, ধিরস্থির বুদ্ধিসম্পন্ন ও শান্তশিষ্ট ফকীরবেশী ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবি নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন যে, তার কথা আর যা-ই হোক বাতাসের আগায় চলে আসা কথা মনে করে উড়িয়ে দেয়ার কোন উপায় ছিল না।

লাঠি ও উজ্জ্বল আলোকমণ্ডিত হস্তের নিদর্শন দেখে ফিরাউন এবং তার দরবারী লোকেরা সকলেই বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়েছিল। তারা প্রায় নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করছিল যে, এই ব্যক্তির প্রকৃতই কোন অতি-প্রাকিৃতিক শক্তির সাহায্য ও পৃষ্টপোষকতা লাভ করেছে। তারা একদিকে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে যাদুকর বলতো, অপরদিকে এই ব্যক্তি তাদেরকে এই যমীনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হতে বেদখল করে দিতে চায় বলে ভয়ও করছিল। এটা সুস্পষ্টরূপে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। এইসব বক্তব্যের কারণ এই ছিল যে, নবুয়্যাতের প্রথম প্রকাশ দেখেই তারা রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারা প্রকৃত পক্ষেই যদি হযরত মূসাকে যাদুকর মনে করতো, তা হলে তার দ্বারা কোন রাষ্ট্রবিপ্লব সাধিত হতে পারে বলে তারা আজ কোন আশংকা বোধ করতো না। কেননা যাদুর বলে যে দুনিয়ায় কখনো কোন রাষ্ট্রবিপ্লব সাধিত হয়নি, তা সর্বজনবিদিত।

সমস্ত দক্ষ যাদুকরদের এখানে নিয়ে আসবে-ফিরাউনের দরবারী লোকদের এই কথা হতে পরিষ্কার মনে হয় যে, খোদায়ী নিদর্শন ও যাদুর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, সেই সম্পর্কে তাদের মনে সুস্পষ্ট ধারণা বর্তমান ছিল। খোদায়ী নিদর্শন দ্বারা যথার্থ পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্ভব আর যাদু শুধু দৃষ্টিশক্তি আর মনকেই বিভ্রান্ত করে বস্তুর মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটায় মাত্র, এই কথা তারা জানতো।

এই কারণেই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নবুয়্যাতের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তারা বললো, এই ব্যক্তি যাদুকর। অর্থাৎ লাঠি প্রকৃতই সাপ হয়ে যায়নি; অতএব এই মুজিযাকে খোদায়ী নিদর্শন বলে মেনে নেয়ার প্রয়োজন নেই; বরং আমাদের কাছে এই মুজিযাকে সাপ বলে মনে হয়েছিল মাত্র, যেমন যাদুকরেরা করে থাকে। অতঃপর তারা পরামর্শ দিল যে, সারা দেশের যাদুকরদের একত্রিত করে তাদের দ্বারাও লাঠি ও রশিকে সাপে পরিবর্তন করে লোকদের দেখাতে হবে। তাহলে সাধারণ মানুষের মনে নবীর মুজিযা দেখিতে পাওয়ায় যে ভয়-বিহ্বলতার উদ্ভব হয়েছে তা সম্পূর্ণ দূর না হলেও অন্তত তারা সন্দেহ-সংশয়ে পড়ে যাবে।

তোমাদেরকে শূলে চড়াবো

স্বৈরাচারী শাসক তার প্রতিপক্ষকে পদে পদে লাঞ্ছিত করতে চায়। এ কারণে সে নানা ধরণের ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বৈরাচারী ফেরাউনও এই ধরণের ষড়যন্ত্র করেছিল আল্লাহর নবী হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের বিরুদ্ধে। মহান আল্লাহ তার সে ষড়যন্ত্র গোটা জাতির সামনে কিভাবে বানচাল করে দিয়েছিলেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ-قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ-قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ-اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا-فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ-لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ-قَالُوْا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ-وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا-رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ-

আর যাদুকরদের অবস্থা এই হলো যে, কোন কিছু যেন ভিতর হতেই তাদের মাথাকে সিজদায় নোয়াইয়া দিল। তারা বলতে লাগলো, আমরা রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনলাম, যাঁকে মূসা ও হারুন উভয়ই মানে। ফিরাউন বললো, তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলে আমার অনুমতি গ্রহণের পূর্বেই? নিশ্চয়ই এটা কোন ষড়যন্ত্র ছিল, যা তোমরা এই রাজধানীতে বসে করেছো-এই উদ্দেশ্যে যে, এর মালিকদেরকে ক্ষমতা হতে বিচ্যুত করে দিবে। আচ্ছা, এখনই এর পরিণাম তোমরা জানতে পারবে। আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলবো এবং অতপর তোমাদেরকে শূলে চড়াবো। তাঁরা জওয়াব দিলো, যা হয় হোক, আমাদেরকে তো আমাদের আল্লাহ্র দিকেই ফিরে যেতে হবে। তুমি যে কারণে আমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও, তা এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, আমাদের রব-এর সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ যখন আমাদের সম্মুখে আসলো, তখন আমরা তা গ্রহণ করলাম। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ধৈর্য ধারণের গুণদান করো আর আমাদেরকে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় উঠিয়ে নাও, যখন আমরা তোমারই অনুগত। (সূরা আরাফ-১২০-১২৬)

এইভাবে আল্লাহ তা'আলা ফিরাউনীদের অপকৌশল ও ষড়যন্ত্রকে তাদেরই বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছেন। তারা সমগ্র দেশের সুবিজ্ঞ যাদুকরদের ডেকে প্রকাশ্য ময়দানে নামিয়ে দিয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যে, লোকেরা যেন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর যাদুকর হবার কথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে, অন্ততঃ তারা যেন এই ব্যাপারে একটা সন্দেহে পড়ে যায়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মুকাবিলায় পরাজয় বরণের পর তাদের নিজেদের ডাকা দক্ষ যাদুকররাই এক বাক্যে সিদ্ধান্ত ঘোষনা করলো যে, হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম যা কিছু পেশ করেছেন তা আর যাই হোক এর মুকাবিলায় কোন যাদুকরের যাদু কোন ক্ষমতা দেখাতে সক্ষম নয়।

যাদু কি জিনিস তা স্বয়ং যাদুকরদের অপেক্ষা ভালো আর কে জানতে পারে? অতএব এই যাদুকররাই যখন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরিক্ষা-নিরীক্ষার পর সাক্ষ্য দিল যে, এটা যাদু নয়, তখন রেফরাউন এবং তার দরবারীদের পক্ষে দেশবাসীকে এই কথা বুঝানো যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম একজন যাদুকর ছাড়া আর কিছুই নয়–তাদের এ কথা একেবারে অসম্ভব–অচল হয়ে গেল।

ফিরাউন অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে দেখে শেষ পর্যন্ত একটি অভিনব কৌশল প্রয়োগ করেছিল। এ সমস্ত ঘটনাকে অর্থাৎ তার নিয়োগকৃত যাদুকরদের পরাজয়ের ঘটনাকে সে মূসা আলাইহিস্ সালাম এবং যাদুকরদের ষড়যন্ত্র বলে ঘোষনা করেছিল, বর্তমানে যেমন স্বৈরাচারী শাসক কোন আন্দোলন ঠেকাতে ব্যর্থ হলে করে এবং কোন ষড়যন্ত্রকারী দল নির্বাচনে পরাজিত হলে করে থাকে। পরে যাদুকরদের শারীরিক যন্ত্রণাদান ও হত্যা করার ধমক দিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রক্রিয়ায় সে তার আরোপিত অভিযোগের সত্যতা তাদের দ্বারা স্বীকার করিয়ে নিবে যেমন বর্তমান কালে কোন কোন দেশে পুলিশ কোন নির্দোষ মানুষকে নির্যাতনের মাধ্যমে মিথ্যা স্বীকৃতি আদায় করে।

কিন্তু এই কৌশলও ফিরাউনেরই বিরুদ্ধে গেল। যাদুকররা নিজদেরকে সব রকমের দণ্ড গ্রহণের জন্য পেশ করে দিল। এতে এই কথা প্রমাণিত হলো যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে সত্য বলে মেনে নেয়ার এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার পশ্চাতে কোন ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব নেই; বরং তারা প্রকৃত সত্যকে জানতে ও চিনতে পেরেই তাঁকে মেনে নিয়েছে। তারপর ফিরাউন সত্য ও সততার নামে প্রবঞ্চার, যে গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি করেছিল তা সব পরিত্যাগ করে সোজাসুজি

অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করা ছাড়া তার আর কোনই উপায় থাকলো না। প্রতিটি যুগেই স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী ফেরাউনের মতই এই ভূমিকা গ্রহণ করছে। প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য প্রথমে তারা নানা কৌশল প্রয়োগ করে ব্যর্থ হয়ে মরণ কামড় হিসাবে নির্যাতনের পথ গ্রহণ করেছে।

কিন্তু সত্যের প্রতি ঈমান এতবড় যাদুকরদের চরিত্রে সহসা কেমন করে বিপ্লব সৃষ্টি করলো, তা বাস্তবিকই প্রণিধান যোগ্য। কিছুক্ষণ পূর্বেও তারা অত্যন্ত নীচতা ও হীনতার পরিচয় দিয়েছিল। এমনকি তাদের বাপ-দাদার ধর্মের সংরক্ষণ ও সাহায্যের জন্য মুকাবিলার ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েই তারা ফিরাউনকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আমরা যদি আমাদের ধর্মকে আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারি, তা হলো সরকার আমাদেরকে পুরস্কার দিবেন তো? আর এখন ঈমানের মহান নিয়ামত লাভ করতে পেরে তারা এতদূর সত্যনিষ্ঠ ও দৃঢ় সাহসী হয়ে পড়লো যে, কিছুক্ষণ সামনে তারা অর্থ লোভে নত হয়ে পড়েছিল, বর্তমানে সেই বাদশাহের সমস্ত দাপট ও প্রতাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করছিল এবং তার সব রকম দৈহিক শাস্তিও অকাতরে ভোগ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু যে সত্যকে তারা লাভ করেছিল তা মুহূর্তের তরেও ত্যাগ করতে রাযী হলো না।

সকলেই সিজদায় নত হয়ে গেল

এই ঘটনা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন। ইসলামী আন্দোলনে জড়িত লোকদের জন্য এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রচুর উপকরণ রয়েছে বলে কোরআনে কয়েক স্থানে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى-قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ-اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ- فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ-وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى-قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا-اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا

خَطٰيٰنَا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى-

শেষ পর্যন্ত এই হলো যে, সমস্ত যাদুকর সিজদাবনত করে দেয়া হলো এবং তারা বলে উঠলো, আমরা মেনে নিলাম হারুন ও মূসার রবকে। ফেরাউন বললো, তোমরা ঈমান আনলে, আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগেই? দেখছি এ তোমাদের গুরু এ-ই তোমাদের যাদুবিদ্যা শিখিয়েছিল। এখন আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটাচ্ছি এবং খেজুর গাছের কাণ্ডে তোমাদের শূলীবিদ্ধ করছি এরপর তোমরা জানতে পারবে আমাদের দু'জনের মধ্যে কার শাস্তি বেশী কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী। (অর্থাৎ আমি না মূসা, কে তোমাদের বেশী কঠিন শাস্তি দিতে পারে!) যাদুকররা জবাব দিল, সেই সত্তার কসম! যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, উজ্জ্বল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সামনে এসে যাওয়ার পরও আমরা (সত্যের ওপর) তোমাকে প্রাধান্য দেবো, এটা কখনো হতে পারে না। তুমি যা কিছু করতে চাও করো। তুমি বড় জোর এ দুনিয়ার জীবনের ফায়সালা করতে পারো আমরা তো আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো মাফ করে দেন এবং এ যাদু বৃত্তিকেও ক্ষমা করে দেন, যা করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছিলে। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই স্থায়িত্ব লাভকারী। (সূরা ত্বা-হা-৭০-৭৩)

যাদুকরদের মনের অবস্থার একটা সুন্দর চিত্র এই আয়াতে ফুটে উঠেছে। মূসার লাঠির কৃতিত্ব দেখার সাথে সাথেই তাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, এটি নিশ্চিতভাবেই মুজিযা, যাদু কোনক্রমেই নয়। তাই তারা হঠাৎ স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদাবনত হয়, যেন কেউ তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। আমরা মেনে নিলাম হারুন ও মূসার রবকে–যাদুকরদের ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাবার পরে তারা এ কথা বলেছিল। তাদের এ কথার মানে হচ্ছে, সেখানে সবাই জানতো কিসের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

সমগ্র জনসমাবেশে একজনও এ ভুল ধারণা পোষন করতো না যে, মূসার ও যাদুকরদের কলাকৌশলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে এবং কার কৌশল শক্তিশালী সেটিই এখন দেখার বিষয়। সবাই জানতো, একদিকে মূসা নিজেকে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহর নবী হিসেবে পেশ করছেন এবং নিজের নবুয়্যতের প্রমাণ স্বরূপ দাবী করছেন যে, তাঁর লাঠি অলৌকিকভাবে অজগরে পরিণত হয়। অন্যদিকে যাদুকরদেরকে জনসমক্ষে আহবান করে ফেরাউন এ কথা প্রমাণ করতে

চায় যে, লাঠির অজগরে পরিণত হওয়া অলৌকিক কর্ম নয় বরং নিছক যাদুর তেলেসমাতি। অন্য কথায়, সেখানে ফেরাউন ও যাদুকর এবং সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সমগ্র দর্শকমণ্ডলী মুজিযা ও যাদুর পার্থক্য অবগত ছিল।

কাজেই সেখানে এ মর্মে পরীক্ষা চলছিল যে, মূসা যা কিছু দেখাচ্ছেন তা যাদুর পর্যায়ভুক্ত, না রব্বুল আলামীনের অসীম ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতার সাহায্যে যে মুজিযা দেখানো যেতে পারে না তার পর্যায়ভুক্ত? এ কারণে যাদুকররা নিজেদের যাদুকে পরাভূত হতে দেখে এ কথা বলেনি, 'আমরা মেনে নিলাম, মূসা আমাদের চাইতে বড় যাদুকর।' বরং সংঙ্গে সংগেই তাদের বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, মূসা যথার্থই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সত্য পয়গম্বর। তারা চিৎকার করে বলে উঠেছে, আমরা সে আল্লাহকে মেনে নিয়েছি, যার পয়গম্বর হিসেবে মূসা ও হারুন এসেছেন।

এ থেকে সাধারণ জনসমাবেশে এ পরাজয়ের কি প্রভাব পড়ে থাকবে এবং সারা দেশবাসী এর দ্বারা কি সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকবে তা অনুমান করা যেতে পারে। ফেরাউন দেশের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রীয় মেলায় এ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেছিল এ আশায় যে, মিশরের সব এলাকা থেকে আগত লোকেরা স্বচক্ষে দেখে নেবে লাঠি দিয়ে সাপ তৈরি করা মূসার একার কোন অভিনব কৃতিত্ব নয়, প্রত্যেক যাদুকরই এটা করতে পারে। ফলে মূসার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। কিন্তু তার এ কৌশলের ফাঁদে সে নিজেই আটকে গেছে এবং গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আগত লোকদের সামনে যাদুকররাই এক যোগে এ কথার সত্যতা প্রকাশ করেছে যে, মূসা যা কিছু দেখাচ্ছেন তা যাদু নয়, তা হচ্ছে মুজিযা। কেবলমাত্র আল্লাহর নবীগণই এ মুজিযা দেখাতে পারেন।

সূরা আরাফে বলা হয়েছে, এটি একটি ষড়যন্ত্র, তোমরা রাজধানীতে বসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে তার মালিকদেরকে হটিয়ে দেবার জন্য এ ষড়যন্ত্র করেছো। এখানে এ উক্তিটির বিস্তারিত বর্ণনা আবার এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যে শুধু পারস্পরিক যোগ-সাজশ আছে তাই নয় বরং মনে হচ্ছে এ মূসা তোমাদের দলের চাঁই ও গুরু। তোমরা মুজিযার কাছে পরাজিত হওনি বরং নিজেদের গুরুর যাদুর পাতানো খেলার কাছে পরাজিত হয়েছো। বুঝা যাচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে এ মর্মে পরামর্শ করে এসেছো যে, নিজেদের

গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এবং একে তার নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করে এখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা করবে। শূলীবিদ্ধ করার প্রাচীন পদ্ধতি ছিল এমন যে, একটি লম্বা কড়িকাঠ মাটিতে গেড়ে দেয়া হতো। অথবা পুরাতন গাছের গুড়ি একাজে ব্যবহৃত হতো। এর মাথার ওপর একটি তখতা আড়াআড়িভাবে বেঁধে দেয়া হতো। অপরাধিকে উপরে উঠিয়ে তার দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে তখ্তার গায়ে পেরেক মেরে আটকে দেযা হতো। এভাবে অপরাধী তখতার সাথে ঝুলতে থাকতো এবং ঘন্টার পর ঘন্টা কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুবরণ করতো। লোকদের শিক্ষালাভের জন্য শূলীদন্ডপ্রাপ্ত অপরাধিকে এভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হতো।

ফিরআউন যাদুকরদেরকে ভয়াবহতম শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাদের মুখ থেকে এ স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাচ্ছিল যে, সত্যি তাদের ও মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে গোপন যোগসাজশ ছিল এবং তারা তাঁর সাথে মিলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল। এটা ছিল হেরে যাওয়া খেলায় জয়লাভ করার জন্য ফেরাউনের সর্বশেষ চাল। কিন্তু যাদুকরদের দৃঢ় সংকল্প ও অবিচল নিষ্ঠা তার এ চাল উলটে দিল। তারা এ ভয়ংকর শাস্তি বরদাশ্ত করতে প্রস্তুত হয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে এ কথা নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, নিছক হেরে যাওয়া খেলায় জয়লাভ করার জন্য একটি নির্লজ্জ রাজনৈতিক চাল হিসেবে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য এই যে, তারা সাচ্চা দিলে মূসা আলাইহিস সালামের নবুয়্যাতের প্রতি ঈমান এনেছে।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক যে মুজিযা প্রদর্শন করা হয়েছিল, তা দেখে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ যাদুকররা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, তাদের অর্জিত জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছিলো যে, এই ব্যক্তি ফেরাউনের কথা অনুযায়ী মোটেও যাদুকর নয়, এই ব্যক্তি এসেছেন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। তারা ঘোষণা করলো, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম মূসা ও হারুনের রব-এর প্রতি– যাদুকরদের এ কথা হযরত মূসার মোকাবিলায় তাদের পক্ষ থেকে নিছক পরাজয়ের স্বীকৃতি ছিল না।

ব্যাপারটা এমন ছিল না যে, কেউ বলতো, আরে ছেড়ে দাও, একজন বড় যাদুকর ছোট যাদুকরদেরকে হারিয়ে দিয়েছে। বরং তাদের সিজদানত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনা যেন প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে হাজ... হাজার মিশরবাসীর

সামনে এ কথার স্বীকৃতি ও ঘোষনা দিয়ে দেয়া যে, মূসা যা কিছু এনেছেন তা আমাদের যাদু শিল্পের অন্তরগত নয়, এ কাজ তো একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুদরতেই হতে পারে।

অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম

হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর জাতি যে সময় গোপনে হিজরত করে মিশর ত্যাগ করছিল, সে সময় ফেরাউন তার সঙ্গী সাথীসহ এবং বিশাল এক সেনাবাহিনী সাথে নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করেছিল। মহান আল্লাহ হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর জাতিকে কিভাবে রক্ষা করলেন এবং জালিম শাহি ফেরাউন ও তার দলবলের কিভাবে সলিল সমাধি ঘটালেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ-فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ-قَالَ كَلاَّ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ-فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ-وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ-وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ اَجْمَعِيْنَ-ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ-اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ-وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ-

সকাল হতেই তারা এদের পিছু নিয়ে বের হয়ে পড়লো। দু'দল যখন পরস্পরকে দেখতে পেলো তখন মূসার সাথিরা চিৎকার করে উঠলো, আমরা তো পাকড়াও হয়ে গেলাম। মূসা বললো, কখ্খনো না, আমার সাথে আছেন আমার রব, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাবেন। আমি মূসাকে অহীর মাধ্যমে হুকুম দিলাম, মারো তোমার লাটি সাগরের বুকে। সহসাই সাগর দীর্ণ হয়ে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরা হয়ে গেলো এক একটি বিশাল পাহাড়ের মতো। সে জায়গায়ই আমি দ্বিতীয় দলটিকেও নিকটে আনলাম। মূসা ও তার সমস্ত লোককে যারা তার সংগে ছিল আমি উদ্ধার করলাম এবং অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। এ ঘটনার মধ্যে আছে একটি নিদর্শন কিন্তু এদের অধিকাংশ মান্যকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালীও আবার দয়াময়ও। (সূরা আশ্ শু'আরা- ৬০-৬৮)

মূসা বললো, কখ্খনো না, আমার সাথে আছেন আমার রব, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাবেন—অর্থাৎ এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পথ আমাকে জানাবেন। সহসাই সাগর দীর্ণ হয়ে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরা হয়ে গেলো এক একটি বিশাল পাহাড়ের মতো—এই আয়াতের মূলে 'কাত্বাওদিল আযিম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় বড় পাহাড়কে 'তওদ' বলা হয়। লিসানুল আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে 'আত্বাওদ' 'আল জিবাল' অর্থাৎ 'তওদ' মানে বিশাল পাহাড়। কাজেই এর পরে আবার 'আল আযিম' গুণবাচক শব্দটি ব্যবহার করার অর্থ দাঁড়ায়—পানি উভয় দিকে অত্যন্ত উঁচু উঁচু পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

তারপর আমরা এ বিষয়টিও চিন্তা করি যে, হযরত মূসার লাঠির আঘাতে সমুদ্রে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। এ কাজটি একদিকে বনী ইসরাঈলের সমগ্র কাফেলাটির সাগর অতিক্রম করার জন্য করা হয়েছিল এবং অন্যদিকে এর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সমস্ত সৈন্য সামন্তকে ডুবিয়ে দেয়া। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, লাঠির আঘাতে পানি বিশাল উঁচু পাহাড়ের আকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং এতটা সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল, যতটা সময় লেগেছিল হাজার হাজার লাখো লাখো বনী ইসরাঈল তার মধ্যে দিয়ে সাগর অতিক্রম করতে। তারপর ফেরাউনের সমগ্র সেনাবাহিনী তার মাঝখানে পৌঁছে গিয়েছিল। এ কথা সুস্পষ্ট যে, সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে যে ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হয় তা যতই তীব্র ও বেগবান হোক না কেন তার প্রভাবে কখনো সাগরের পানি এভাবে বিশাল পাহাড়ের মতো এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না। এই পথ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا–

তাদের জন্য সমুদ্রের বুকে শুকনো পথ তৈরি করে দাও। (সূরা ত্বাহা)

এর অর্থ দাঁড়ায়, সাগরের ওপর লাঠির আঘাত করার কারণে কেবল সাগরের পানি ফাঁক হয়ে গিয়ে দু'দিকে পাহাড় সমান উঁচু হয়ে যায়নি বরং মাঝখানে যে পথ বের হয় তা শুকনো খটখটেও হয়ে যায় এবং কোথায় এমন কোন কাদা থাকেনি যার ওপর দিয়ে হেঁটে চলা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে নির্দেশ দেন— وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا–اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ–

সমুদ্র অতিক্রম করার পর তাকে এ অবস্থার ওপরই ছেড়ে দাও, ফেরাউনের সেনাদল এখানে নিমজ্জিত হবে। (সূরা দুখান-২৪)

এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মূসা সমুদ্রের অপর পারে উঠে যদি সমুদ্রের ওপর লাঠির আঘাত করতেন, তাহলে উভয় দিকে খাড়া পানির দেয়াল ভেংগে পড়তো এবং সাগর সমান হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ্ তাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন, যাতে ফেরাউনের সেনাদল এ পথে নেমে আসে এবং তারপর পানি দু'দিক থেকে এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়। এটি একটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন মু'জিযার বর্ণনা। যারা সাধারণ প্রকৃতিক নিয়মের আওতায় এ ঘটনাটির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তাদের চিন্তার গলদ এ থেকে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

এ ঘটনার মধ্যে আছে একটি নিদর্শন কিন্তু এদের অধিকাংশ মান্যকারী নয়–অর্থাৎ কুরাইশদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে শিক্ষা। এ শিক্ষাটি হচ্ছে, হঠকারী লোকেরা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট মুজিযাসমূহ দেখেও কিভাবে ঈমান আনতে অস্বীকার করে যেতে থাকে এবং তারপর এ হঠকারিতার ফল কেমন ভয়াবহ হয়। ফেরাউন ও তার জাতির সমস্ত সরদার ও হাজার হাজার সেনার চোখে এমন পট্টি বাঁধা ছিল যে, বছরের পর বছর ধরে যেসব নিদর্শন তাদেরকে দেখিয়ে আসা হয়েছে সেগুলো তারা উপেক্ষা করে এসেছে, সবশেষে পানিতে ডুবে যাবার সময়ও তারা একথা বুঝলো না যে, সমুদ্র ঐ কাফেলার জন্য ফাঁক হয়ে গেছে, পানি পাহাড়ের মতো দু'দিকে খাড়া হয়ে আছে এবং মাঝখানে শুকনা রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। এ সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও তাদের জ্ঞানোদয় হলো না যে, মূসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে এবং এহেন শক্তির সাথে তারা লড়াই করতে যাচ্ছে। তাদের চেতনা জাগ্রত হলো এমন এক সময় যখন পানি দু'দিক থেকে তাদেরকে চেপে ধরেছিল এবং তারা আল্লাহ গযবের মধ্যে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল।

অন্যদিকে ঈমানদারদের জন্যও এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। সেটি হচ্ছে, জুলুম ও তার শক্তিগুলো বাহ্যত যতই সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিক না কেন শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য-সহায়তায় সত্য এভাবেই বিজয়ী হয় এবং মিথ্যার শির এভাবেই নত হয়ে যায়। ইসলামকে যারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদেরকে একটি কথা মনে রাখতে হবে, অন্ধকার যতো গভীর হয়, রাতের আঁধার যতো বেশী হবে সূর্যের আগমন তত দ্রুত হয়। সুতরাং জুলুমের অন্ধকার দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। কেননা অন্ধকারের পরেই রয়েছে আলোর পথ।

মহান আল্লাহ বলেন, আমি ফেরাউনের লাশ রেখে দিয়েছি, কিয়ামত পর্যন্ত এই ঘটনা জীবন্ত সাক্ষী হয়ে থাকবে যে, যে শক্তি আমার বিধানের সাথে অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে, যারা সত্য পন্থীদের সাথে এমন বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা পালন করবে, তাদের শেষ পরিণতি তোমরা দেখে নাও। পৃথিবীতে যারা ছোট ছোট ফেরাউন গজাবে, তাদের পরিণতিও এমনই হবে। কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো, মানুষ ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করেনা।

এখন তোমার লাশকেই রক্ষা করবো

যে মিশরের বুকে এই ঘটনা ঘটেছিল, যে মিশরেই ফেরাউনের লাশ রক্ষিত রয়েছে, সেই মিশরের বুকেই ইসলামের সাথে চরম ধৃষ্টতামূলক আচরণ করা হয়েছে। শাসকগোষ্ঠী ইসলামকে সহ্য করতে প্রস্তুত হচ্ছে না। ইসলামকে যারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ময়দানে কাজ করছে, তাদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে আবদ্ধ করা হচ্ছে। তাদের ওপরে অকথ্য নির্যাতন করা হচ্ছে। ফাঁসির রশি তাদের কণ্ঠে পরিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরণের জালিমদের লক্ষ্য করেই মহান আল্লাহ বলেছেন, যদিও অনেক লোকই এমন, যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি চরম গাফিলতির আচরণ দেখাচ্ছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَجوَزْنَا بِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا-حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَه الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَائِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-اٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ-فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ

আর আমি বনী-ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে নিলাম। ঐদিকে ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার জন্য তাদের পিছনে ছুটে চললো, শেষ পর্যন্ত ফিরাউন যখন ডুবে যেতে লাগলো, তখন বলে উঠলো, আমি মানছি যে, প্রকৃত খোদা তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যার প্রতি বনী-ইসরাঈলের লোকেরা ঈমান এনেছে আর আমিও আনুগত্যের মস্তক নতকারীদের মধ্যে একজন। (জওয়াব দেওয়া হলো) এখন ঈমান আনছো, অথচ এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে

আর বিপর্যয়কারীদের একজন ছিলে। এখন তো আমি কেবল তোমার লাশকেই রক্ষা করবো, যেন তুমি পরবর্তী বংশধরদের জন্য উপদেশ লাভের প্রতীক হয়ে থাকো। যদিও অনেক লোকই এমন, যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি চরম গাফিলতির আচরণ দেখাচ্ছে। (সূরা ইউনুস-৯০-৯২)

ফেরাউন যখন সাগরের অতল তলদেশে ডুবে যাচ্ছিল, সে সময় সে চিৎকার করে বলেছিল, আমি মুসা ও হারুনের রবের প্রতি ঈমান আনছি। সীনা উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে ফিরাউনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। স্থানটি এখনও বর্তমান রয়েছে। বর্তমানে এই স্থানকে বলা হয় 'ফিরাউন পর্বত'। এই পর্বতের কাছে একটি উষ্ণ কূপ রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই কূপকে 'ফিরাউনের হাম্মাম' বা 'ফিরাউনের স্নানাগার' বলে। এই কূপ আবু যনীমা নামক স্থান হতে কয়েক মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা নির্দিষ্টভাবে বলে যে, এখানেই ফিরাউনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল।

ডুবে মরা ফিরাউন যদি সেই 'মুনফাতা' ফিরাউনই হয়ে থাকে, যাকে 'মূসার ফিরাউন' বলা হয়েছে, তা হলে তার লাশ বর্তমানে কায়রো'র যাদুঘরে রয়েছে। ১৯০৭ সালে স্যার গ্রাফটন ইলিয়ট স্মীথ এই মমি'র উপর হতে যখন আচ্ছাদন খুলে ফেলেছিলেন, তখন সেই লাশের উপর লবনের একটা পুরু স্তর জমে থাকতে দেখা গিয়েছিল। লাশের ওপর লবনের স্তর লবনাক্ত পানিতে ডুবে মরার এক বাস্তব প্রমাণ।

ব্যর্থতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত

আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে মানুষকে ধন-সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করেন এবং না দিয়েও পরীক্ষা করেন। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে একজন লোক ছিলো, পবিত্র কোরআন যাকে 'কারূণ' নামে উল্লেখ করেছে। এই লোকটি নিজ জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করে ফেরাউনের সাথে হাত মিলিয়ে নিজ জাতির বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছিলো। সরকারী অনুকম্পা লাভ করে এই ব্যক্তি বিপুল ধন-ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়েছিলো। তার ইতিহাস আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ–وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ

الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِى الْقُوَّةِ-اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ-وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلاَتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ-اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ-

এ কথা সত্য, কারূণ ছিলো মূসার সম্প্রদায়ের লোক, তারপর সে নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। আর আমি তাকে এতটা ধনরত্ন দিয়ে রেখেছিলাম যে, তাদের চাবিগুলো বলবান লোকদের একটি দল বড় কষ্টে বহন করতে পারতো। একবার যখন এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বললো, 'অহঙ্কার করো না, আল্লাহ অহঙ্কারীদেরকে পসন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈরী করার কথা চিন্তা করো এবং পৃথিবী থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা কাসাস-৭৬-৭৭)

নিজ জাতির সাথে বিশ্বাঘাতকতা করে কারূণ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর পদলেহনে ব্যস্ত ছিলো। আর এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ ফেরাউন তাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেছিলো এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে লোকটি তৎকালীন যুগে শ্রেষ্ঠ ধনকুবের-এ পরিণত হয়েছিলো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারীরা যখন তাকে অসৎ কর্ম থেকে বিরত থেকে আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য 'হক'-এর দাওয়াত দিলেন, তখন লোকটি আপন রব মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করে দম্ভভরে জবাব দিয়েছিলো–

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ-

এতে সে বললো, 'এসব কিছু তো আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তার ভিত্তিতে আমাকে দেয়া হয়েছে।' (সূরা কাসাস-৭৮)

অর্থাৎ আমি আমার জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষমতা, কলা-কৌশল কাজে লাগিয়ে এসব ধন-সম্পদ অর্জন করেছি। কেউ আমাকে অনুগ্রহ করে এসব দান করেনি।

এই দাম্ভিক ও অহঙ্কারী লোক এবং তার অনুরূপ লোকদের সম্পর্কে সূরা কাসাস-এর ৭৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا-وَلاَ يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ-

সে কি এ কথা জানতো না যে, আল্লাহ্ এর পূর্বে এমন বহু লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা এর চেয়ে বেশী বাহু বল ও জনবলের অধিকারী ছিলো? অপরাধীদেরকে তো তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় না।

ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের অহঙ্কারে যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের ঐসব গোষ্ঠীর ধ্বংসের ইতিহাস জানা উচিত, যারা তার তুলনায় অনেক গুণ বেশী অর্থ-সম্পদ ও শক্তির অধিকারী ছিলো। অহঙ্কারের পদভারে তারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। মহান আল্লাহ পৃথিবী থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন অপরাধীদের ওপরে আযাবের চাবুক হানেন, তখন তাদেরকে এ কথা বলা হয় না যে, 'তোমরা অমুক অপরাধে লিপ্ত ছিলে, এই কারণে তোমাদের ওপরে আঘাত হানা হচ্ছে।' বরং আচমকা তাদের ওপরে আযাবের চাবুক হানা হয়।

কারুণের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখে এক শ্রেণীর লোভী লোকজন মনে করতো, লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। নিজেদের ধন-সম্পদ না থাকার কারণে তারা আক্ষেপ করতো। তাদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা শোনাচ্ছেন–

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنَ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ-

একদিন সে (কারুণ) তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে। যারা পৃথিবীর জীবনের ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত ছিলো তারা তাকে দেখে বললো, আহা! কারুণকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমরা পেতাম! সে তো বড়ই সৌভাগ্যবান। (সূরা কাসাস-৭৯)

সফলতা ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদন্ড যাদের জানা ছিল না বা যারা পৃথিবীর জীবনে সম্মান-মর্যাদা ও বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের অধিপতি হওয়াকেই প্রকৃত সফলতা বলে

বিশ্বাস করতো, তারা ধারণা করতো, কারুণ বড়ই সফল ব্যক্তি—লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। তারা আক্ষেপ করে বলতো, আমরাও যদি কারুণের অনুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারতাম! ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত এই মূর্খ লোকগুলোর মূর্খতা দেখে হকপন্থীরা তাদেরকে বলতো, তোমরা যাকে সফলতা বলে ধারণা করছো তা সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতা হলো মহান আল্লাহ প্রতি ঈমান আনা এবং আমলে সালেহ্ করা। আর ঈমান আনা ও আমলে সালেহ্ করা কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা ধৈর্যশীল। হকপন্থীরা কিভাবে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছিলো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা কাসাসের ৮০ নং আয়াতে তা শোনাচ্ছেন—

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ-

কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বলতে লাগলো, তোমাদের অবস্থা দেখে আফসোস হয়। আল্লাহর সওয়াব তার জন্য ভালো যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর এ সম্পদ সবরকারীরা ব্যতীত আর কেউ লাভ করতে পারে না।

অর্থাৎ মহান আল্লাহর পুরস্কার শুধুমাত্র ঐ লোকগুলোর জন্যই নির্ধারিত যাদের মধ্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা রয়েছে। বৈধ পন্থায় উপার্জন করার ব্যাপারে যারা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। এই পথে দিন শেষে যদি তাদের ভাগ্যে একটি শুক্‌নো রুটি জোটে তবুও তারা আল্লাহর শোকর আদায় করে আর যদি বৈধ পথে উপার্জনের মাধ্যমে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়ে যায়, তবুও তারা মহান আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করে। সারা পৃথিবীর সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস, অর্থ-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ার সুযোগ দেখা দিলেও তারা অবৈধ পথের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। অবৈধভাবে তদবীর-তাগাদা করে এবং প্রভাব বিস্তার করে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, তারা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। বৈধ পথে উপার্জন তা যতো সামান্যই হোক না কেনো, এতেই তারা তৃপ্তি লাভ করে।

পৃথিবীতে যারা অবৈধ পন্থায় উপার্জন করে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে, তাদের শান-শওকত দেখে মনের মধ্যে ঈর্ষা ও কামনা-বাসনার জ্বালায় ব্যাকুল হবার পরিবর্তে ঐসব অবৈধ জাঁকজমকের প্রতি চোখ তুলে না তাকানো এবং ধীর স্থির মস্তিষ্কে এ কথা অনুধাবন করা যে, মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদারের জন্য পৃথিবীর এ চাকচিক্যময় আবর্জনার তুলনায় এমন নিরাভরণ পবিত্রতাই সর্বাধিক

উত্তম যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে তাকে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক কারূণের ধন-সম্পদ দেখে যেসব লোক তার অনুরূপ ধন-সম্পদ লাভের জন্য লালায়িত ছিলো, কারূণকে যারা সফল ব্যক্তি মনে করতো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা খুব দ্রুত তাদের ধারণা পরিবর্তন করে দিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা আর বিপর্যয় সৃষ্টির শেষ সীমা অতিক্রম করলো কারূণ। মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে তার ওপরে আযাবের চাবুক হানা হলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা কাসাসের ৮১-৮২ নং আয়াতে বলেন–

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ–فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ–وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ–وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ–لَوْ لَا اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ–

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার গৃহকে ভূগর্ভে পুঁতে ফেললাম। তখন আল্লাহর মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারীদের কোনো দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারলো না। যারা আগের দিন তার মতো মর্যাদা লাভের আকাংখা পোষণ করছিলো তারা বলতে লাগলো, 'আফসোস, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সীমিত রিযিক দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমাদেরও ভূগর্ভে পুঁতে ফেলতেন। আফসোস, আমাদের মনে ছিলো না, কাফিররা সফলকাম হয় না।

অর্থাৎ আমরা এই ভুলে নিমজ্জিত ছিলাম যে, পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করাই হলো সফলতা। এ কারণে আমরা ধারণা করে ছিলাম যে কারূণ বিরাট সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা দেখে আমাদের ধারণা পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমরা আসল সত্য অনুধাবন করতে পারলাম যে, প্রকৃত সফলতা ভিন্ন জিনিস, যা আল্লাহ বিরোধিদের ভাগ্যে কখনো জোটে না।

'হক'-এর দাওয়াত যারা দেন, তারাও মানুষ এবং মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নন। 'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার পথ কন্টকাকীর্ণ পথ-এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথে

চলতে গেলে নানা ধরনের বিপদ-মুসিবতে নিমজ্জিত হতে হবে। নিন্দা, অপবাদ আর কটুবাক্য বৃষ্টির মতোই বর্ষিত হতে থাকবে। এতে করে ক্ষণিকের জন্য হলেও 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর মন-মানসিকতায় বিসন্নতা ছেয়ে যেতে পারে। মনে এই চিন্তা জাগতে পারে যে, 'আমি যে লোকগুলোকে ধ্বংস আর ক্ষতির পথ থেকে ফিরিয়ে কল্যাণ আর সফলতার পথের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি, সেই লোকগুলোই আমাকে এভাবে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে জর্জরিত করছে।' মনে এই ধরনের চিন্তা জাগরূক হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহর রাসূলও দাওয়াতের ময়দানে লোকদের কাছ থেকে এমন আঘাত পেতেন। তাঁর মনও ব্যথাভারাক্রান্ত হতো। এই অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার পথনির্দেশনা মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এভাবে দিয়েছেন-

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ-فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ-وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ-

আমি জানি, এরা তোমার সম্পর্কে যেসব কথা বানিয়ে বলে তাতে তুমি মনে ভীষণ ব্যথা পাও। এর প্রতিকার এই যে, তুমি নিজের রব-এর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে থাকো, তাঁরই সকাশে সিজ্‌দাবনত হও এবং যে চূড়ান্ত সময়টি আসা অবধারিত সেই সময় পর্যন্ত নিজের রব-এর বন্দেগী করে যেতে থাকো। (সূরা হিজ্‌র-৯৭-৯৯)

অর্থাৎ 'হক'-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে যে বিপদ-মুসিবত, নিন্দা-অপবাদ, কলঙ্ক হকপন্থীদের প্রতি ছুড়ে দেয়া হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যাচার প্রচার করা হচ্ছে, তার মোকাবেলা করার শক্তি তারা একমাত্র নামায ও মহান আল্লাহর বন্দেগী করার ক্ষেত্রে অবিচল দৃঢ়তার পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই অর্জন করা যাবে। নামায-রোযা আদায়, আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণই 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর মন-মানসিকতা থেকে বিসন্নতা দূর করে প্রশান্তিতে ভরে দেবে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করবে, সাহসিকতা ও বীরত্ব সৃষ্টি করবে এবং 'হক'-এর দাওয়াত পেশকারীকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলবে, যার ফলশ্রুতিতে গোটা পৃথিবীর মানুষের ছুড়ে দেয়া নিন্দাবাদ, অপবাদ আর প্রতিরোধের মোকাবেলায় দাওয়াত দানকারী অটুট মনোবলের সাথে তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। আর এই পদ্ধতি অবলম্বনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি।

তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই

ঈমানদার ব্যক্তি এই পৃথিবীতে টিকে থাকেই আশার ওপর। আল্লাহর ওপরে সে থাকে আশাবাদী। কারণ সে জানে, তার ওপরে যতবড় বিপদই আসুক না কেন আশ্রয় লাভ করার একটি স্থান তার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত উন্মুক্ত রয়েছে, তাঁর আশ্রয় দাতা হলেন আল্লাহ। আমরা ইউনুস আলাইহিস্ সালামের জীবনে দেখতে পাই, যখন তাঁকে বিশাল আকৃতির একটি মাছ উদরস্থ করে পানির অতল তলদেশে চলে গেল—এমন বিপদ তার ওপরে নেমে এলো যে, এমন ধরনের ভয়ঙ্কর বিপদে কোন মানুষ কখনও নিমজ্জিত হয়নি। কোন মানুষ এই ধরনের বিপদের কথা কল্পনাও করেনি। তার ওপরে যখন এমন বিপদ দেখা দিল, তখন তিনি অধৈর্য হননি। ভয়ে আতঙ্কে তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় নি। তিনি সাহস হারাননি। আল্লাহর ওপরে ছিল তার অবিচল আস্থা।

ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে তিনি বিপদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। একদিকে রাতের ঘন অন্ধকার। অপরদিকে পানির নিচের অন্ধকার। আরেকদিকে মাছের পেটের অন্ধকার। এই ত্রিবিধ অন্ধকারে বিপদে নিমজ্জিত হয়ে তিনি মাছের পেটের ভেতরে বসে স্থির বিশ্বাসে আর্তচিৎকার করে উঠেছিলেন।

মহান আল্লাহ তাঁকেই শুধু বিপদ হতে উদ্ধার করেছিলেন, বিষয়টি এমন নয়, বরং আয়াতে বলা হয়েছে, আমার মুমিন বান্দাদের মধ্যে যারা ভুল করবে এবং সেই ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে আমার কাছে ক্ষমা ও সাহায্য চাইবে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে সাহায্য করবো। মহান আল্লাহ বলেন—

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ-اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ-فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ-وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ-وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ-

আর মাছওয়ালাকেও আমি অনুগ্রহভাজন করেছিলাম। স্মরণ করো যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করবো না। শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে উঠলো, 'তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ

নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি।' তখন আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং দুঃখ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, আর এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আল্ আম্বিয়া-৮৭-৮৮)

এমন একস্থান থেকে হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম সাহায্যের আবেদন করেছিলেন, যেখান থেকে আবেদন করলে সে আবেদন কেউ শুনতে পাবে না এবং সে আবেদন শোনার মত শক্তি ও ক্ষমতাও কারো নেই। তার সে করুণ আর্তনাদ পানির ভেতরে কেউ শুনতে পেল না, পৃথিবীর কেউ শুনতে পেল না। আকাশের কেউ শুনলো না। কিন্তু আরশে আযীমের অধিপতি মহাশক্তিধর আল্লাহ সে আবেদন শুনেছিলেন। তিনি মাছের পেটের ভেতরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে দিলেন যে, মাছ বাধ্য হলো তাকে উদগীরণ করে দিতে।

মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার ইউনুসের ডাকে সাড়া দিলাম, তাকে বিপদ মুক্ত করলাম। এমনিভাবে আমার কোন মুমিন বান্দাহ যখন কোন অপরাধ করে বসে এবং এ কারণে সে পৃথিবীতে বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে, আর সে নিজের ভুল অনুভব করতে পেরে আমার কাছে যখন সাহায্য কামনা করে, তখন আমি তাকে সাহায্য করি। এটাই আমার নীতি, আমি আমার বিপদগ্রস্থ বান্দার আহ্বান শুনে নীরব থাকি না। আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন-

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا-اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا-

জেনে রাখো, দুঃখ আর কষ্টের পরে রয়েছে সুযোগ সুবিধা আর অস্বচ্ছলতার সাথেই রয়েছে উদার সচ্ছলতা। (সূরা আলাম নাশরাহ্)

যত বড় বিপদই আসুক না কেন, এই বিপদের পরেই মহান আল্লাহ তাঁর গোলামদের ওপরে রহমত নাযিল করে থাকেন। মনে রাখতে হবে, অন্ধকার যত গভীর হয়, পূর্বাশার প্রান্তে সূর্যের উদয় লগ্ন ততই এগিয়ে আসে। আল্লাহ পাক তাঁর গোলামদের কাছে অঙ্গীকার করেছেন-

وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ-

তোমরা মন ভাঙা হয়োনা, চিন্তাগ্রস্থ হয়োনা, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অংশ

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, লুকমান ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। তাঁর মনিবের কাছে কিছু সংখ্যক লোকজন এসে তাঁর সম্পর্কে জানালো, আপনার গোলামটি খুব জ্ঞানী লোক। সে মানুষকে নানা ধরনের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে থাকে।

লোকজনের কথা শুনে মনিব তাঁর গোলাম লুকমানের জ্ঞানের পরিধি যাচাই করার উদ্দেশ্যে একদিন তিনি হযরত লুকমানকে বললেন, একটি ছাগল জবেহ্ করো এবং ছাগলের দেহের সবথেকে উৎকৃষ্ট অংশ আমার সামনে উপস্থিত করো। হযরত লুকমান মনিবের কথা অনুসারে ছাগল জবেহ্ করে ছাগলের কলিজা একটি পাত্রে মনিবের সামনে উপস্থিত করে বললেন, এটাই ছাগলের গোটা দেহের মধ্যে উৎকৃষ্ট অংশ।

এরপর মনিব হযরত লুকমানকে আদেশ দিলেন, আরেকটি ছাগল জবেহ্ করো এবং সেই ছাগলের দেহের সবথেকে নিকৃষ্ট অংশ আমার সামনে উপস্থিত করো। মনিবের আদেশে হযরত লুকমান আরেকটি ছাগল জবেহ্ করে ছাগলের কলিজা একটি পাত্রে মনিবের সামনে উপস্থিত করলেন।

মনিব অবাক দৃষ্টিতে তাঁর গোলাম হযরত লুকমানের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, লোকজনের মুখে তোমার জ্ঞানের প্রশংসা শুনি। তুমি নাকি লোকজনকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে থাকো। এখন দেখছি, তোমার মাথায় কিছুই নেই। তোমাকে আমি বললাম, ছাগলের দেহের উৎকৃষ্ট অংশ আমার সামনে উপস্থিত করো। তুমি আমাকে ছাগলের কলিজা এনে দিলে। আবার যখন তোমাকে আমি আদেশ দিলাম একটি ছাগল জবেহ্ করে তার দেহের সবথেকে নিকৃষ্ট অংশ আমার সামনে আনো। তুমি এবারও ছাগলের কলিজা এনে আমার সামনে রাখলে।

হযরত লুকমান মনিবের কথার উত্তরে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– আপনি ছাগলের দেহের উৎকৃষ্ট অংশ ও নিকৃষ্ট অংশ আনতে বলেছেন। আমি আপনার আদেশ অনুসারেই কাজ করেছি। মনিব অবাক কণ্ঠে বললেন, বিষয়টি কি আমাকে বুঝিয়ে বলো। হযরত লুকমান বললেন, দেহের মধ্যে কলিজাই হলো সবথেকে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অংশ। কারণ এই কলিজা যদি কারো ভালো থাকে, তাহলে তার গোটা শরীর

সুস্থ থাকে। আর এই কলিজা যদি কারো খারাপ হয়ে যায়, তাহলে তার গোটা শরীরই খারাপ হয়ে যায়। মনিব তার গোলামের জ্ঞানের পরিধি দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানবদেহে একটি গোস্তের টুকরো রয়েছে, সেই টুকরোটি যদি স্বচ্ছ বা কালিমা মুক্ত থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি হয় উত্তম চরিত্রের। আর সেই গোস্তের টুকরোটি যদি অস্বচ্ছ এবং কালিমা যুক্ত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি হয় অসৎ চরিত্রের। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই গোস্তের টুকরোটি কি? আল্লাহর হাবীব বললেন, সেই টুকরোটি হলো কাল্‌ব।

আপন সন্তানের প্রতি উপদেশ

পবিত্র কোরআন হযরত লুকমানের নাম উল্লেখ করে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেছে এবং তিনি তাঁর সন্তানকে কি শিক্ষা দিয়েছিলেন, এ সম্পর্কে আলোচনা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ–وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ–وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ–وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ............

আমি লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম সুক্ষ্মজ্ঞান। যাতে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত। স্মরণ করো যখন লুকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিলো, সে বললো, হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম। আর প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার অধিকার চিনে নেবার জন্য নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা দুর্বলতার পর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে এবং দু'বছর লাগে তার দুধ ছাড়তে। (এ জন্য আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতিও, আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু যদি তারা তোমার প্রতি আমার সাথে এমন

কাউকে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যাকে তুমি জানো না, তাহলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। পৃথিবীতে তাদের সাথে সদাচার করতে থাকো কিন্তু মেনে চলো সে ব্যক্তির পথ যে আমার দিকে ফিরে এসেছে। তারপর তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে আমারই দিকে। সে সময় তোমরা কেমন কাজ করছিলে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো। (আর লুকমান বলেছিলো) 'হে পুত্র! কোন জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে, আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তাহলে আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন। হে পুত্র! নামায কায়েম করো, সৎ কাজের আদেশ দান করো, খারাপ কাজে নিষেধ করো এবং যা কিছু বিপদই আসুক সে জন্য ধৈর্য ধরো। এ কথাগুলোর জন্য বড়ই তাকিদ করা হয়েছে। আর মানুষের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না, পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভঙ্গীতে, আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্মম্ভরী ও অহংকারীকে। নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ। (সূরা লুকমান-১২-১৯)

আমি লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম সূক্ষ্মজ্ঞান। যাতে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়–অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও অন্তর দৃষ্টির প্রাথমিক চাহিদা এই ছিল যে, মানুষ তার রবের মোকাবিলায় কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত হবার নীতি অবলম্বন করবে, অনুগ্রহ অস্বীকার করার ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অবলম্বন করবে না। আর তার কৃতজ্ঞতা নিছক মৌখিক হিসেব-নিকেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং চিন্তা কথা ও কাজ তিন পর্যায়েই পরিব্যপ্ত হবে। আমি যা কিছু লাভ করেছি, তা সবই আল্লাহর দান, নিজের হৃদয় ও মস্তিকের গভীরে তার এ বিশ্বাস ও চেতনা ও সঞ্চারিত হবে। তার কণ্ঠে সদা সর্বদা আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতিও উচ্চারিত হবে। কার্যক্ষেত্রেও সে আল্লাহর আদেশ মেনে চলে, তাঁর আদেশ অমান্য করা থেকে দূরে থেকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনা করতে থেকে, তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়ে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এ কথা প্রমাণ করে দেবে যে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত।

যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ

অমুখাপেক্ষী এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত–অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফুরি করে তার কুফুরি তার নিজের জন্যই ক্ষতিকর। এতে মহান আল্লাহর কোন ক্ষতি হয়না। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন–অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন, কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে তাঁর কোন ক্ষতি হয় না বা কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কোন বৃদ্ধি ঘটে না। বান্দার যাবতীয় নিয়ামত যে একমাত্র তাঁরই দান কারো অকৃতজ্ঞতা ও কুফুরী এ জাজ্বল্যমান সত্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা নাই করুক তিনি আপনা আপনিই প্রশংসিত। বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-কণিকা তাঁর পূর্ণতা ও সৌন্দর্য এবং তাঁর স্রষ্টা ও অন্নদাতা হবার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তু নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে তাঁর প্রশংসা গেয়ে চলছে।

যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম

يٰبُنَىَّ لَاتُشْرِكْ-بِاللّٰهِ-اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ-

হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না–লুকমানের পান্ডিত্যপূর্ণ উপদেশমালা থেকে এ বিশেষ উপদেশ বাণীটিকে এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে দু'টো বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে। এক, তিনি নিজ সন্তানকে এ উপদেশটি দিয়েছিলেন। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, মানুষ যদি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী কারো ব্যাপারে আন্তরিক হতে পারে তাহলে সে হচ্ছে তাঁর নিজের সন্তান। এক ব্যক্তি অন্যকে ধোঁকা দিতে পারে, অন্যের সাথে মুনাফেকি আচরণ করতে পারে, পক্ষান্তরে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোকটিও নিজ সন্তানকে ধোঁকা প্রতারণা দেবার চেষ্টা কখনই করতে পারে না। এ কারণে লুকমানের তাঁর নিজ পুত্রকে এ নসীহত করা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁর মতে আল্লাহর সাথে অন্য কিছুর অংশীস্থাপন করা প্রকৃত অর্থেই একটা নিকৃষ্ট কাজ এবং এ জন্য তিনি সর্বপ্রথম নিজের প্রাণাধিক সন্তানকে এই ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকার উপদেশ দান করেন।

যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম–জুলুমের প্রকৃত অর্থ হলো, কারো অধিকার হরণ করা এবং ইনসাফ বিরোধী কাজ করা। শিরক এ জন্য বৃহত্তর জুলুম যে, মানুষ এসব সত্তাকে তার নিজের স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও নিয়ামতদানকারী হিসেবে বরণ করে নেয়, তার সৃষ্টিতে যাদের কোন অংশ নেই তাকে রিযিক দান করার ক্ষেত্রে যাদের

কোন দখল নেই এবং মানুষ এ পৃথিবীতে যেসব নিয়ামত লাভে ধন্য হচ্ছে সেগুলো প্রদান করার ব্যাপারে যাদের কোন ভূমিকাই নেই। এটা এতবড় অন্যায়, যার চেয়ে বড় কোন অন্যায়ের কথা চিন্তাই করা যায়-না। তারপর মানুষ একমাত্র তার স্রষ্টারই দাসত্ব ও পূজা-অর্চনা করে তাঁর অধিকার হরণ করে। তারপর স্রষ্টা ব্যতীত অন্যসত্তার দাসত্ব ও পূজা করতে গিয়ে মানুষ যে কাজই করে তাতে সে নিজের দেহ ও মন থেকে শুরু করে পৃথিবী ও আকাশের বহু জিনিষ ব্যবহার করে। অথচ এ সমস্ত জিনিস এ লা-শরীক আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে কোন জিনিসকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্বে ব্যবহার করার অধিকার তার নেই। তারপর মানুষ নিজেকে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দেবে না, তার নিজের ওপর এ অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে স্রষ্টাকে ত্যাগ করে সৃষ্টির দাসত্ব করে নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিতও করে এবং এই সঙ্গে শাস্তির যোগ্যও বানিয়ে নেই। এভাবে একজন মুশরিকের সমগ্র জীবন একটি সর্বমুখী ও সার্বক্ষণিক জুলুমে পরিণত হয়। তার কোন একটি মুহূর্তও জুলুমমুক্ত নয়।

يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا-اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ-

হে পুত্র! কোন জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে, আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তাহলে আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন, তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন।

অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর গ্রেফতারের বাইরে কেউ যেতে পারে না। পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটি কণা তোমার দৃষ্টির অগচোরে থাকতে পারে কিন্তু তাঁর কাছে থাকতে পারে না, তাঁর কাছে তা সুস্পষ্ট। আকাশ মন্ডলে একটি ক্ষুদ্রতম কণিকা তোমার থেকে বহু দূরবর্তী হতে পারে কিন্তু তা আল্লারহ অত্যন্ত কাছে, আল্লাহর একেবারে নিয়ন্ত্রণের ভেতরে। ভূমির বহু নিম্ন স্তরে পতিত কোন জিনিস তোমার কাছে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু তাঁর কাছে তা রয়েছে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে। সুতরাং তুমি কোথাও কোন অবস্থায়ও এমন কোন সৎ বা অসৎ কাজ করতে পারো না যা আল্লাহর অগোচরে থেকে যায়। তিনি কেবল তা জানেন শুধু তাই নয় বরং যখন হিসেব-নিকেশের সময় আসবে তখন তিনি তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের ও নড়াচড়ার রেকর্ড সামনে নিয়ে আসবেন।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, মানুষের প্রতি মুহূর্তের কর্মকান্ড রেকর্ড করা হচ্ছে। কিয়ামতের দিনে যখন মানুষের হাতে আমল নামা দান করা হবে, মানুষ দেখবে এর ভেতরে কোন কিছুই বাদ পড়েনি। এই পৃথিবীতে মানুষ ক্ষুদ্র একটা কিছু করেছে, রাতের অন্ধকারে সংগোপনে একটা কিছু করেছে, বা বড় ধরনের কিছু করেছে, কোথায় কোথায় সে গিয়েছে, সমস্ত কিছুরই রেকর্ড হয়ে আছে। এরপর মানুষ মানুষ চালাকি করে কৃত অপরাধ অস্বীকার করতে থাকবে। কোরআনে বলা হয়েছে, মানুষের প্রতিটি মুহূর্তের কর্মকান্ডের ছবি উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে। সে সময় এসব ছবি তাকে প্রদর্শন করা হবে।

কিভাবে সে ঘুষ গ্রহণ করছে, কিভাবে সে আরেকজনের অধিকার হরণ করছে, কিভাবে সে মদ পান করছে, কিভাবে সে ইসলাম বিরোধিদের হাতে হাত দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করছে। এসব ছবি তার সামনে প্রদর্শন করা হবে। এরপর তার জবান বন্ধ করে দেয়া হবে। সূরা ইয়াসিনে বলা হয়েছে, তখন দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দান করতে থাকবে, কিভাবে তাকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ইসলামের বিপক্ষে এবং বাতিল শক্তির স্বপক্ষে কিভাবে হাত উঁচু করে কথা বলা হয়েছে, হাত তা বলে দেবে। সুতরাং মহান আল্লাহর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকবে না। মানুষ নিজের মনের গহীনে কি কল্পনা করেছিল, তাও সেদিন মহান আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন। কেননা, মানুষ নিজের মনে যা কল্পনা করে, তা আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।

হে পুত্র! নামায কায়েম করো

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ-اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ-

হে পুত্র! নামায কায়েম করো, সৎ কাজের আদেশ দান করো, খারাপ কাজে নিষেধ করো এবং যা কিছু বিপদই আসুক সে জন্য ধৈর্য ধরো। এ কথাগুলোর জন্য বড়ই তাকিদ করা হয়েছে।

এ কথার মধ্যে এদিকে একটি সুক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, সৎ কাজের আদেশ দান করা এবং অসৎ কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখা বা নিষেধ করার দায়িত্ব যে ব্যক্তিই ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে পালন করবে, তাকে অনিবার্যভাবে নানা ধরণের

সমস্যা ও বিপদের মোকাবেলা করতে হবে। সৎ কাজের আদেশ দান করা এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখার দায়িত্ব একাকী পালন করা যায় না। এ দায়িত্ব পালন করতে হলে সংঘবদ্ধ হতে হয় এবং ইসলামী দল গড়ে তুলতে হয় বা প্রতিষ্ঠিত ইসলামী দলে যোগ দিতে হয়। অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলন করতে হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহর বিধান দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করে সৎ কাজের আদেশ জারি করতে হয় এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখার জন্য আদেশ জারি করতে হয়। আর এ কাজ তথা ইসলামী আন্দোলন যখনই কোন ব্যক্তি করতে যাবে, তখন গোটা পৃথিবীর অন্য সমস্ত শক্তি তার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তার বিরোধিতা করবে। তার পরিবারের পক্ষ হতে বিরোধিতা আসবে, সমাজের পক্ষ হতে বিরোধিতা করা হবে, ধর্ম ব্যবসায়ীগণ বিরোধিতা করবে, রাষ্ট্রের পক্ষ হতে বিরোধিতা করা হবে, জেল জুলুম সহ্য করতে হবে। নানা ধরণের অপবাদ সহ্য করতে হবে, অভাব অনটনে পড়তে হবে, শারীরিক শাস্তি বরদাস্ত করতে হবে।

আর একাজ কোন কাপুরুষের দ্বারা সম্ভব নয়। যাদের সাহস নেই, তারা এ কাজ করতে পারেনা। মানবতার সংশোধন এবং তার সংকট উত্তরণে সাহায্য করার কাজ কম হিম্মতের অধিকারী লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কাজ তথা ইসলামী আন্দোলন করার জন্য বুকের পাটা অত্যন্ত মজবুত হতে হবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহর এই কোরআন এবং কোরআনের এই বিধান কোন ভীরু কাপুরুষদের জন্য অবতীর্ণ হয়নি। নিজের মনের দাস এবং পৃথিবীর গোলামদের জন্য এ বিধান অবতীর্ণ হয়নি। বাতাসের বেগে উড়ে চলা খড়কুটো, পানির স্রোতে ভেসে চলা কীট-পতঙ্গ এবং প্রতি রঙে রঙিন হওয়া তথা পৃথিবী যে দিকে চলছে সেদিকেই চলা যাদের স্বভাব তাদের জন্যও এ বিধান অবতীর্ণ হয়নি।

এ বিধান এমন অসীম সাহসী-দুঃসাহসী ব্যঘ্র মানব-নরশার্দুলদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বাতাসের গতি পরিবর্তন করে দেবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, যারা নদীর তরঙ্গের সাথে লড়তে এবং তার স্রোতধারা ঘুরিয়ে বোর মত সৎ সাহস ও হিম্মত রাখে। যুগের গতি যারা বদলে দেবার সাহস রাখে। যারা আল্লাহর রঙকে পৃথিবীর সমস্ত রঙের চেয়ে বেশী ভালোবাসে এই সেই আল্লাহর রঙেই গোটা পৃথিবীকে রাঙিয়ে তুলতে প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা করে।

একটা কথা ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, যে ব্যক্তি মুসলমান তাকে যুগের নদীর স্রোতের সাথে ভেসে যাবার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যই হলো জীবন নদীকে তাঁর ঈমান, তার বিশ্বাস, তার আদর্শ, তার ঈমান ও প্রত্যয় নির্দেশিত সোজা ও সরল পথে পরিচালিত করবে। যদি সেই সোজা পথ থেকে নদী তার স্রোত ফিরিয়ে নেয় আর সেই পরিবর্তিত স্রোত-ধারায় কেউ যদি ভেসে চলতে সম্মত হয় তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবী করার কোন অর্থ থাকতে পারে না। তার সে দাবী একেবারেই মিথ্যা।

যে ব্যক্তি সত্যই মুসলমান এবং আল্লাহর রাসূলের অনুসারী হিসেবে নিজেকে দাবী করবে, সে এই ভ্রান্তমুখী স্রোতের সাথে লড়াই করবে, তার গতি ঘুরিয়ে নিজের আদর্শের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করবে, এর এ পথে সে সাফল্য ও ব্যর্থতার কোন হিসেব কষতে বসবে না, কোন লাভ ক্ষতির পরোওয়া সে করবে না। এই পথে লড়াই করতে গিয়ে যে কোন সাম্ভাব্য ক্ষতিই সে হাসি মুখে বরণ করে নেবে। এমনকি নদীর স্রোতের সাথে লড়াই করতে করতে তার বাহু যদি ভেঙ্গেও যায় অথবা তার শক্তি শিথিল হয়ে পড়ে এবং পানির তরঙ্গঘাত তাকে আধমরা করে কোন তীরের দিকে ছুঁড়েও ফেলে দেয়, তবু তার আত্মা মুহূর্তের জন্যও পরাজয় বরণ করবে না। তার মনে এই বাহ্যিক পরাজয়ের জন্য সামান্যতম কোন অনুতাপ বা আফসোস জাগবে না, ইসলাম বিরোধী শক্তির দাপট ও বিলাসিতা দেখে তার মনে কোন ঈর্ষার ভাবধারা সৃষ্টি হবে না। এই কথাগুলোই হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দান করেছিলেন।

মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ আর মানুষের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না। এই আয়াতে আরবী 'সাই'র' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সাই'র বলতে আরবী ভাষায় একটি রোগকে বুঝায়। এ ধরণের রোগ হয় উটের ঘাড়ে। এ রোগ যখন উটের ঘাড়ে হয় তখন উট ঘাড় সব সময় একদিকে বাঁকা করে রাখে বা ঘুরিয়ে রাখে। এ কারণে আরব দেশে বলা হয়, অমুক ব্যক্তি উটের মতো তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ অহংকারপূর্ণ ব্যবহার করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে কথা বলেছে। হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দিলেন, মানুষের সাথে অহংকারভরে উদ্ধত ভঙ্গীতে কথা বলো না।

পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভঙ্গীতে

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا–اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ–

পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভঙ্গীতে, আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্মম্ভরী ও অহংকারীকে–এই আয়াতে ফাখুর ও মুখতাল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবীতে মুখতাল মানে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে নিজেই নিজেকে বড় কিছু মনে করে। আর ফাখুর তাকেই বলে, যে নিজের বড়াই করে অন্যের কাছে। মানুষের চাল-চলনে অহংকার, দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ তখনই অনিবার্য হয়ে ওঠে, যখন তার মাথায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস ঢুকে যায় এবং সে অন্যদেরকে নিজের বড়াই ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

নিজের চলনে ভারসাম্য আনো

وَاقْصِدْ فِى مَشْيِكَ – নিজের চলনে ভারসাম্য আনো।

কোন কোন মুফাস্সীর এই আয়াতের অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, 'দ্রুত চলো না এবং ধীরেও চলো না বরং মাঝারি ভঙ্গিতে চলো।' কিন্তু আয়াতের পরবর্তী আলোচনা হতে পরিষ্কার জানা যায় যে, এখানে ধীরে বা দ্রুত চলা আলোচ্য বিষয় নয়। ধীরে বা দ্রুত চলার মধ্যে কোন নৈতিক গুণ বা দোষ নেই এবং এ জন্য কোন নিয়মও বেঁধে দেয়া যায় না। কাউকে দ্রুত কোন কাজ করতে হলে সে দ্রুত ও জোরে চলবে না কেন। আর যদি নিছক বেড়াবার জন্য চলতে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে ধীরে চলায় ক্ষতি কি? মাঝারি চালে চলার যদি কোন মানদন্ড থেকেই থাকে, তাহলে প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাকে একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত করা যায় কেমন করে? আসলে উল্লেখিত আয়াতে বলা কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রবৃত্তির এমন অবস্থার সংশোধন যার প্রভাবে চলার মধ্যে দম্ভ অথবা দীনতার প্রকাশ ঘটে। অহংকার বা বড়াই করার অহমিকা যদি ভেতরে থেকে যায় তাহলে অনিবার্যভাবে তা একটি বিশেষ ধরণের চাল-চলনের মাধ্যমে বের হয়ে আসে।

এ অবস্থা দেখে লোকটি যে কেবল অহংকারে মত্ত হয়েছে, এ কথাই জানা যায় না, বরং তার চাল-চলনের রং ঢং তার অহংকারের স্বরূপটিও তুলে ধরে। ধন-দৌলত, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সৌন্দর্য, জ্ঞান, শক্তি এবং এ ধরণের অন্যান্য যত জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকারের সৃষ্টি করে তার প্রত্যেকটির দম্ভ তার চাল-চলনে একটি

বিশেষ ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে। পক্ষান্তরে চাল-চলনে দীনতার প্রকাশও কোন কোন দুষণীয় মানসিক অবস্থার প্রভাবজাত হয়ে থাকে। কখনো মানুষের মনের সুপ্ত অহংকার একটি লোক দেখানো বিনয় এবং কৃত্রিম দরবেশী ও আল্লাহ প্রেমিকের রূপ লাভ করে এবং এ জিনিসটি তার চাল-চলনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

আবার কখনো মানুষ যথার্থই পৃথিবী ও তার অবস্থার মোকাবেলায় পরাজিত হয় এবং নিজের চোখে নিজেই হেয় দুর্বল চালে চলতে থাকে। হযরত লুকমান (রাহঃ)-এর কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের মনের এসব অবস্থার পরিবর্তন করো এবং একজন সোজা-সরল-যুক্তিসংগত ভদ্রলোকের মতো চলো, যেখানে নেই কোন অহংকার ও দম্ভ এবং কোন দুর্বলতা, লোক দেখানো বিনয় ও ত্যাগ।

এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের যে রুচি গড়ে উঠেছিল তা একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একবার এক ব্যক্তিকে মাথা হেঁট করে চলতে দেখলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন, 'মাথা উঁচু করে চলো, ইসলাম রোগী নয়।' অর্থাৎ রোগীর মতো দুর্বল ভঙ্গীতে চলো না, ইসলাম মুসলমানদেরকে রোগীর মতো চলতে শিক্ষা দান করেনি। আরেকজনকে তিনি দেখলেন সে কুঁকড়ে চলছে। তিনি বললেন, 'ওহে জালেম ! আমাদের দীনকে মেরে ফেলছো কেন?

এ দুটো ঘটনা থেকে জানা যায়, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কাছে দীনদারীর অর্থ মোটেও এটা ছিল না যে, পথ চলার সময় রোগীর মতো আচরণ করবে এবং অযথা নিজেকে দীনহীন করে মানুষের সামনে পেশ করবে। কোন মসলমানকে এভাবে চলতে দেখে তাঁর ভয় হোত, এভাবে চললে অন্যদের সামনে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করা হবে এবং মুসলমানদের মধ্যেই নিস্তেজ ভাবধারা সৃষ্টি হয়ে যাবে। এমনই ঘটনা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর ব্যাপারেও একবার ঘটেছিল।

তিনি দেখলেন একজন লোক কুঁকুড়ে মুকড়ে রোগীর মতো পথ চলছে। তিনি জানতে চাইলেন, তোমার কি হয়েছে যে এমনভাবে রোগীর মতো চলছো? তাকে জানানো হলো, ইনি একজন কারী (অর্থাৎ কোরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং শিক্ষাদান ও ইবাদাত করার মধ্যে মশগুল থাকেন)। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছিলেন

কারীদের নেতা। কিন্তু তাঁর অবস্থা ছিল, পথে চলার সময় জোরে জোরে হাঁটতেন। যখন কথা বলতেন, তখন জোরে জোরে কথা বলতেন। যখন কাউকে মারধর করতেন, তখন অত্যন্ত জোরে আঘাত করতেন।

নিজের আওয়াজ নীচু করো

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ-اِنَّ اَنْكَرَ الاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ-

নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।

এর মানে এ নয় যে, মানুষ সবসময় আস্তে নীচু কণ্ঠে কথা বলবে। এবং কখনো জোরে বা উচ্চ কণ্ঠে কথা বলবে না। বরং গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করে কোন ধরণের ভাব-ভঙ্গিমা ও কোন ধরণের আওয়াজে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে তা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। ভঙ্গী ও আওয়াজের এক ধরণের নিম্নগামিতা ও উচ্চগামিতা এবং কঠোরতা ও কোমলতা হয়ে থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজনের খাতিরে। যেমন কাছের বা কম সংখ্যক লোকের সাথে কথা বললে আস্তে ও নীচু স্বরে বলবেন। দূরের অথবা অন্য লোকের সাথে কথা বলতে হলে অবশ্যই জোরে বলতে হবে। উচ্চারণ ভঙ্গীর পার্থক্যের ব্যাপারটাও এমনি স্থান কাল পাত্রের সাথে জড়িত। প্রশংসা বাক্যের উচ্চারণ ভঙ্গী নিন্দা বাক্যের উচারণ ভঙ্গী থেকে এবং সন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং এবং অসন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং বিভিন্ন হওয়াই উচিত। এ ব্যাপারটা কোন অবস্থায়ই আপত্তিকর নয়।

হযরত লুকমানের উপদেশের অর্থ এ নয় যে, এ পার্থক্যটা উঠিয়ে দিয়ে মানুষ সব সময় একই ধরণের নীচু কণ্ঠে ও কোমল ভঙ্গীমায় কথা বলবে। আসলে আপত্তিকর বিষয় হচ্ছে অহংকার প্রকাশ, ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যকে অপমানিত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য গলা ফাটিয়ে গাধার মতো বিকট স্বরে কথা বলা।

তুমি তো মহাপাপ করে ফেলেছো

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই পৃথিবীতে অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাচ্ছেন। এর ভেতরে এই ঘটনাটি এমন যে, ইতোপূর্বে পৃথিবীবাসী এমন কোন ঘটনা অবলোকন করার সুযোগ লাভ করেনি, যা করেছিল শিশু নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিশু কণ্ঠে। পিতা ব্যতীত তিনি মাতৃগর্ভ থেকে আল্লাহর

আদেশে এই পৃথিবীতে এলেন। মানুষ তাঁর পবিত্র জন্ম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করবে। মহান আল্লাহ এ কারণে তাঁর শিশু কণ্ঠেই বাকশক্তি দিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং তাঁর পরিচয় কিভাবে দিয়েছিলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন বলছে–

يَاُخْتَ هٰرُوْنَ مَاكَانَ اَبُوْكِ امْرَاَسَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا– فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ–قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا–قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ–اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا–وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ–وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا–وَّبَرًّا بِوَالِدَتِىْ–وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا–وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا–ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ–مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ–اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ–

তারপর সে এই শিশুটি নিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে এলো। লোকেরা বলতে লাগলো, হে মারয়াম! তুমি তো মহাপাপ করে ফেলেছো। হে হারুনের বোন! না তোমার বাপ কোন খারাপ লোক ছিল, না তোমার মা ছিল কোন ব্যভিচারিণী। মারয়াম শিশুর প্রতি ইশারা করলো। লোকেরা বললো, কোলের শিশুর সাথে আমরা কি কথা বলবো? শিশু বলে উঠলো, 'আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন এবং বরকতময় করেছেন যেখানেই আমি থাকি না কেন আর যতদিন আমি বেঁচে থাকাবো ততদিন নামায ও যাকাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। আর নিজের মায়ের হক আদায়কারী করেছেন এবং আমাকে অহংকারী ও হতভাগা করেননি। শান্তি আমার প্রতি যখন আমি জন্ম নিয়েছি ও যখন আমি মরবো এবং যখন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে। এ হচ্ছে মারয়ামের পুত্র ঈসা এবং এ হচ্ছে তার সম্পর্কে সত্য কথা, যে ব্যাপারে লোকেরা সন্দেহ করছে। কাউকে সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র সত্তা। তিনি যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন বলেন, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়। (সূরা মারয়াম-২৭-৩৫)

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শিশু থাকা অবস্থায় দোলনায় শায়িত থেকে লোকদেরকে বলেছিলেন, আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন এবং বরকতময় করেছেন যেখানেই আমি থাকি না কেন আর যতদিন আমি বেঁচে থাকাবো ততদিন নামায ও যাকাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। আর নিজের মায়ের হক আদায়কারী করেছেন এবং আমাকে অহংকারী ও হতভাগা করেননি।

কোরআনের এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাঁর কোন পিতা ছিল না। কারণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এ কথা বললেন না যে, 'আল্লাহ্ আমাকে পিতা-মাতার হক আদায়কারী করেছেন' বরং তিনি বললেন, আমাকে মায়ের হক আদায়কারী করেছেন। এ কথাটিও প্রমাণ করে যে, হযরত ঈসার কোন পিতা ছিল না। পবিত্র কোরআনে যেখানেই তাঁর প্রসঙ্গ এসেছে সেখানেই তাঁকে মার্‌য়ামের পুত্র ঈসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে-সুতরাং কোরআনের এসব বর্ণনাও প্রমাণ করে যে, তাঁর কোন পিতা ছিল না। কোরআন বলছে, শিশু কালে দোলনায় থেকে হযরত ঈসা বলেছিলেন, শান্তি আমার প্রতি যখন আমি জন্ম নিয়েছি ও যখন আমি মরবো এবং যখন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে।

কোরআনের এ আয়াত দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, এটাই সেই নিদর্শন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সত্তার মাধ্যমে যা বনী ইসরাঈলদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। বনী ইসরাঈলের অব্যাহত দুষ্কৃতির কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবার আগে তাদের সামনে সত্যকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে পেশ করতে চাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেন তা হচ্ছে এই যে, হারুন গোত্রের এমন এক মুত্তাকী, ধর্মনিষ্ঠ ও ইবাদাতগুজার মেয়েকে যিনি বাইতুল মাকদিসে ইতিকাফরত এবং হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের প্রশিক্ষণাধীন ছিলেন, তাঁর কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী করে দিলেন। এটা এ জন্য করলেন যে, যখন সে শিশু সন্তান কোলে করে নিয়ে আসবে তখন সমগ্র জাতির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং আকস্মিকভাবে সবার দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে।

তারপর এ কৌশল অবলম্বন করার ফলে বিপুল সংখ্যক লোক যখন হযরত মার্‌য়ামের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালো তখন আল্লাহ্ এই নবজাত শিশুর মুখ দিয়ে কথা

বলালেন, যেন এ শিশু বড় হয়ে যখন নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করবে তখন জাতির হাজার হাজার লোক এ মর্মে সাক্ষ্য দেবার জন্য উপস্থিত থাকে যে, এই ছেলের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তারা আল্লাহর একটি বিস্ময়কর অলৌকিকত্ব দেখেছিল। এ ছেলের জন্ম ও শিশুকালে দোলনায় শুয়ে কথা বলার মধ্যে দিয়েই তখন প্রকাশ পেয়েছিল যে, এই ছেলে বড় হয়ে এমন একটা কিছু হবে। এই নিদর্শন দেখার পরও এই জাতি যখন তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করবে এবং তাঁর আনুগত্য করার পরিবর্তে তাকে অপরাধী সাজিয়ে শূলবিদ্ধ করার চেষ্টা করবে তখন তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দেয়া হবে যা পৃথিবীতে কোন জাতিকে দেয়া হয়নি।

মহান আল্লাহ বলেন, এ হচ্ছে মারইয়ামের পুত্র ঈসা এবং এ হচ্ছে তার সম্পর্কে সত্য কথা, যে ব্যাপারে লোকেরা সন্দেহ করছে। কাউকে সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র সত্তা। তিনি যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন বলেন, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।

এ পর্যন্ত খৃষ্টানদের সামনে যে কথাটি সুস্পষ্ট করা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র মনে করার যে আকিদা তারা অবলম্বন করেছে তা মিথ্যা। যেভাবে একটি মুজিযার মাধ্যমে হযরত ইয়াহ্ইয়ার জন্মের কারণে তা তাঁকে আল্লাহর পুত্রে পরিণত করেনি ঠিক তেমনিভাবে অন্য একটি মুজিযার মাধ্যমে হযরত ঈসার জন্মও এমন কোন জিনিস নয় যে জন্য তাঁকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করতে হবে। খৃষ্টানদের নিজেদের বর্ণনাসমূহেও এ কথা রয়েছে যে, হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা উভয়েই এক এক ধরণের মুজিযার মাধ্যমে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

এটিই সোজা পথ

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে আহ্বান করে বলেছিলেন, তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো। আর এটাই হলো সহজ সরল পথ। তিনি কখনো তাঁর পূজা করার জন্য বলেননি। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ-هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ
-فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ-

আর (ঈসা বলেছিল) আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। সুতরাং তোমরা তার বন্দেগী করো। এটিই সোজা পথ। কিন্তু তারপর বিভিন্ন দল পরস্পর মতবিরোধ করতে থাকলো। (সূরা মার্‌য়াম-৩৬-৩৭)

পবিত্র কোরআন বলছে, পৃথিবীর সমস্ত নবী ও রাসুল সেই একই ইসলাম প্রচার করেছেন, ইসলামী আদর্শের দিকেই মানুষকে আহ্বান করেছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও সেই ইসলামের দিকেই মানুষকে আহ্বান করেছেন। তিনি তাঁর জাতির লোকদেরকে যে দিকে আহ্বান করেছিলেন, সে সম্পর্কে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'আর (ঈসা বলেছিল) 'আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব।

সুতরাং তোমরা তাঁর বন্দেগী করো। এটিই সোজা পথ।' কিন্তু তারপর বিভিন্ন দল পরস্পর মতবিরোধ করতে থাকলো। খৃষ্টানদেরকে জানানো হচ্ছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতও তাই ছিল যা অন্য নবীগণ এনেছিলেন। তিনি এ ছাড়া আর কিছুই শিখাননি যে, কেবলমাত্র এক আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে। এখন তোমরা যে তাঁকে বান্দার পরিবর্তে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছো এবং তাঁকে আল্লাহর সাথে ইবাদাতে শরীক করছো এসব তোমাদের নিজেদের উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট আবিষ্কার। তোমাদের নেতা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কখনোই তোমাদেরকে এ কথা শিক্ষা দেননি।

খৃষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করা যে তাদের চরম বাড়াবাড়ি এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বয়ং প্রতিবাদ করেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لاَ تَغْلُوْا فِى دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ- اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ- اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ- فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ- وَلاَ تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ- اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ- اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ- سُبْحٰنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ- لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ- وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً
لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ-

হে আহ্‌লি কিতাব! তোমরা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর প্রতি খালেস সত্য ছাড়া আর কিছু আরোপ করো না। মরিয়াম পুত্র ঈসা মসীহ অন্য কিছুই ছিল না, ছিল আল্লাহ্‌র একজন রাসূল। সে ছিল আল্লাহর একটি 'ফরমান' যা আল্লাহ মরিয়মের প্রতি নাযিল করেছিলেন। সে ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রূহ (যা মরিয়ামের গর্ভে সন্তানের আকার ধারণ করেছে) অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না, তিন জন আছে। বিরত হও, এটা তোমাদেরই পক্ষে কল্যাণকর। আল্লাহ্‌ই তো একমাত্র ইলাহ্। কেউ তাঁর সন্তান হবে, এসব থেকে তিনি পবিত্র। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁরই মালিকানাধীন; সেসবের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট। (ঈসা) মসীহ আল্লাহ্‌র বান্দাহ হওয়ার ব্যাপারে কখনো বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেনি। (সূরা নিছা-১৭১-১৭২)

হে আহ্‌লি কিতাব! তোমরা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না–এখানে আহ্‌লি কিতাব বলতে খৃষ্টানদের বুঝানো হয়েছে এবং 'বাড়িবাড়ি' অর্থ কোন জিনিসের সমর্থন ও সাহায্য করতে গিয়ে সীমালংঘন করা। ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে অমান্য করা ও তাঁর বিরোধিতা করার ব্যাপারে সীমা লংঘন করে গিয়েছিল। এটা ছিল ইয়াহুদীদের অপরাধ। পক্ষান্তরে খৃষ্টানদের অপরাধ এই ছিল যে, তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি আকিদা ও ব্যক্তি-ভালবাসার সীমা লংঘন করে গিয়েছিল।

মরিয়াম পুত্র ঈসা মসীহ্ অন্য কিছুই ছিল না, ছিল আল্লাহর একজন রাসূল। সে ছিল আল্লাহর একটি 'ফরমান' যা আল্লাহ মরিয়মের প্রতি নাযিল করেছিলেন–এখানে মূল শব্দ হচ্ছে 'কালেমা'। মরিয়ামের প্রতি কালেমা (ফরমান) পাঠানোর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ মরিয়ামের গর্ভাধারকে কোন পুরুষের শুক্রকীট গ্রহণ ব্যতীতই গর্ভধারণ করার নির্দেশ দিলেন।

পিতা ছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মগ্রহণের মূল রহস্য সম্পর্কে খৃষ্টানদেরকে প্রথমে এই কথাই বলা হয়েছিল (এবং এ ব্যাপারে এটাই ছিল তাদের আকীদা) কিন্তু তারা গ্রীক দর্শনের প্রভাবে পড়ে প্রথমে 'কালেমা' অর্থ 'কথা' অথবা 'বাক'-এর সমার্থক মনে করে নিয়েছে। এরপর এই 'কথা' ও 'বাক' হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র এই সত্তাগত গুণ হযরত মরিয়ামের গর্ভাধারে প্রবেশ করে আল্লাহ নিজেই

ঈসা আলাইহিস সালামের দৈহিক রূপ ধারণ করেছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ্ মনে করার ভ্রান্ত ও পংকিল ধারণা খৃষ্টানদের মধ্যে ঠিক এভাবেই সৃষ্টি হয় এবং এই ভুল ধারণাও বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ্ নিজেই নিজেকে অথবা তার নিজের চিরন্তন গুণাবলী হতে কথার গুণকে ঈসা আলাইহিস সালামের রূপে প্রকাশ করেছেন।

সে ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রূহ–এখানে স্বয়ং মসীহ আলাইহিস সালামকে 'রুহু মিনহু, অর্থাৎ আল্লাহর কাছ থেকে আগত রূহ বলা হয়েছে। সুরা আল-বাকারায় এই কথাটিকে এভাবে বলা হয়েছে 'আইদিয়ান্নাহু বিরুহেল কুদ্স' অর্থাৎ পবিত্র রূহ দ্বারা আমি মসীহর সাহায্য করেছি। উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যে পবিত্র রূহ দিয়েছিলেন তা সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ হতে মুক্ত ছিল; পরিপূর্ণ সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়পন্থী ছিল এবং আগাগোড়া নৈতিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে ভরপুর ছিল।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এই পরিচয়ই ঈসায়ী বা খৃস্টানদেরকে বলা হয়েছিল; কিন্তু এই ব্যাপারেও তারা বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন করেছে। 'রূহুম্‌মিনাল্লাহ' শব্দকে বিকৃত করে তারা এর অর্থ করেছে সরাসরি আল্লাহর রূপ এবং 'রুহুল কুদুস'-এর অর্থ করা হয়েছে যে, মসীহ আলাইহিস সালামের মধ্যে প্রবিষ্ট আল্লাহ্‌রই পবিত্র রুহ। এভাবে আল্লাহ ও মসীহ আলাইহিস সালামের সাথে রুহুল কুদসকে তৃতীয় এক আল্লাহর স্থানে বসানো হয়েছে। এটা ইসায়ী বা খৃস্টানদের আর একটি বিরাট ও মারাত্মক সীমালংঘন। এ কারণে তারা কঠিন গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে।

অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন–অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ্ বলে মানো ও সকল রাসূলের রিসালাতকে কবুল কর। এই ঈসা মসীহ আলাইহিস সালাম তাঁদেরই মধ্য হতে একজন; অতএব তাকেও মেনে চল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এটাই ছিল প্রকৃত শিক্ষা। আর এই সত্য ব্যাপারটি মসীহ আলাইহিস সালামের অনুসারণকারী প্রতিটি ব্যক্তিরই মেনে নেয়া আবশ্যক।

এবং বলো না, তিন জন আছে–অর্থাৎ তিন আল্লাহর ধারণা পরিত্যাগ কর। এই ধারণা যে রকমেরই হোক না কেন ও তোমাদের মধ্যে যেভাবেই পাওয়া যাক না

কেন তা পরিহার কর। বস্তুত প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ঈসায়ীগণ একই সময় তওহীদও মানতো এবং ত্রিত্ববাদও (তিন আল্লাহ্র ধারণাও) স্বীকার করতো। ইনজীল গ্রন্থসমূহে হযরত ইসা আলাইহিস সালামের যেসব সুস্পষ্ট কথা পাওয়া যায়, তাঁর ভিত্তিতে কোন ঈসায়ীই আল্লাহকে এক ও একক এবং তিনি ছাড়া আর কেউ আল্লাহ্ নেই-এটা অস্বীকার করতে পারে না। তওহীদ যে দ্বীনের মূল কথা, তা স্বীকার না করে তাদের কোনই উপায় নেই।

কিন্তু প্রথম দিন হতেই এই ভুল ধারণা তাদের মন-মগজে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ্র বাণী মসীহ্ আলাইহিস সালামের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং আল্লাহ্র রূহ তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। এই কারণ তারা ঈসা মসীহ্ এবং রুহুল কুদুস-এর খোদায়ীকেও বিশ্ব প্রভু মহান আল্লাহ্র খোদায়ীর সঙ্গে মেনে নেয়া অহেতুক নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নিয়েছে। এরূপ জোরপূর্বক বাধ্যবাধকতা আরোপের ফলে তওহীদী আকীদার সাথে ত্রিত্ববাদ আকীদা ও ত্রিত্ববাদী আকীদার সাথে তওহীদী আকীদা কেমন করে চালানো যেতে পারে এটা তাদের জন্য একটি জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রায় ১৮ শত বছর যাবত খৃস্টান আলিমগণ নিজেদের সৃষ্ট এই জটিলতার মীমাংসা করার জন্য মাথা ঘামাচ্ছেন। এর বিভিন্ন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন ফিরকা তথা দল-উপদল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তদুপরি এদের এক দল অপর দলকে কাফির বলে প্রচার করে আসছে। এই ঝগড়ার কারণেই গির্জাসমূহ পরস্পর স্বতন্ত্র ও ছিন্নভিন্ন হয়ে চলেছে। আর এর উপরই তাদের সমগ্র যুক্তি বিজ্ঞান ব্যয়িত হয়েছে। অথচ এই জটিলতা না আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, না তাঁর প্রেরিত ঈসা মসীহ্ আলাইহিস সালাম। আর একই সঙ্গে আল্লাহ্র একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদকে মেনে নেয়া হলে এই সমস্যার কোন সমাধানও হতে পারে না।

মূলত ধর্মের ব্যাপারে ঈসায়ীদের চরম বাড়াবাড়িই এই জটিলতা সৃষ্টি করেছে এবং এই বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকাই হচ্ছে এই জটিলতার একমাত্র মীমাংসা। সেই সঙ্গে তাদেরকে ঈসা মসীহ ও রূহুল কুদুস-এর খোদায়ীর ধারণা পরিহার করতে হবে। কেবলমাত্র আল্লাহকে একক ইলাহ্ মানতে হবে এবং মসীহ্ আলাইহিস সালামকে কেবলমাত্র তাঁর রাসূল স্বীকার করতে হবে এবং কোন দিক দিয়েই তাকে খোদায়ীর ব্যাপারে অংশীদার মনে করা যাবে না।

কোরআনের পরিচয়

সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাবের নাম হলো আল কোরআনুল কারীম। এ কিতাব মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। এ জন্য এর নাম হলো কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব। এই কোরআনকে অবতীর্ণের সময় কাল থেকে পৃথিবী ধ্বংস হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কোরআনের পূর্বেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনুল কারীমে সেসব আসমানি কিতাবের নাম তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন প্রধান ফেরেশ্তা হযরত জিবরাইল আলাইহিস্ সালাম মহান আল্লাহর আদেশে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে অবতীর্ণ করেছেন। এ কিতাবকে সহীহ শুদ্ধভাবে পড়ে শুনানো এবং এর প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের ওপরে দেয়া হয়েছিল। এ কিতাব পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন এ কিতাবের সঠিক ব্যাখ্যাতা। সারা পৃথিবীর মানব মন্ডলীর পৃথিবীতে শান্তি এবং আলমে আখিরাতে মুক্তি এই কোরআনের শিক্ষা অনুসরণের ওপরে পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এ কারণেই পবিত্র কোরআন যে কোন ধরনের মানুষের পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ–

আমি এ কোরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। এখন উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা ক্বামার-৪০)

মানুষের জন্য এ কোরআন হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হলেও সবার পক্ষে এ কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করা সম্ভব নয়। হেদায়েত লাভ করতে হলে যেসব শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন, সেসব শর্ত যাঁদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, কেবল তাঁরাই এ কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে সক্ষম হবেন। এ কোরআন একদিনে বা একই সময়ে অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে প্রয়োজন অনুসারে, ঘটিতব্য বা সংঘটিত কারণে, সময়ের বিভিন্ন পর্যায়ে অল্প অল্প করে রাসূলের ওপরে অবতীর্ণ করেছেন।

পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলেও তার বর্ণনাশৈলী, বাচনভঙ্গী পৃথিবীতে প্রচলিত আরবী ভাষার অনুরূপ নয়। এই কিতাবের ভাষা প্রচলিত আরবী ভাষা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কোরআনের ভাষা নির্ধারণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাব্বুল আলামীন। এই কোরআনের ভাষা যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তেমনি কোরআন যে ভাব প্রকাশ করে, সে ভাবও এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকেই। এ কোরআন যাঁর ওপরে অবতীর্ণ হয়েছে নিঃসন্দেহে তিনি মানব জাতির বাইরের কেউ ছিলেন না। তিনিও মানুষ ছিলেন, তবে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ থেকে তিনি ছিলেন ভিন্ন। কোরআনের বাহক মানুষ ছিলেন এ কথা স্বয়ং আল্লাহ তাঁকেই বলতে বলেছেন--قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ বলো, আমিও তোমাদের অনুরূপ একজন মানুষ। (সূরা আল কাহ্‌ফ-১১০)

কোরআনের বাহক মানুষ ছিলেন বলে এর ভাষা ও বাচনভঙ্গী, বর্ণনাশৈলী, শব্দ চয়ন, ভাব মানুষের রচিত কোন কিতাবের মতো নয়–বরং তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও আগত। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে অবগত করেছেন--ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيْهِ এটা সেই কিতাব যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। (সূরা আল বাকারা-২)

অর্থাৎ এটা সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর কিতাব, এটা এমন একটি কিতাব, যে কিতাবে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টিকারী একটি বাক্যও সংযোজন করা হয়নি। পৃথিবীর চিন্তাবিদগণ, গবেষকগণ নানা ধরনের গ্রন্থ রচনা করে থাকেন। তাঁদের গবেষণালব্ধ বিষয় বস্তু গ্রন্থাকারে মানব জাতির সামনে প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু তাঁরা গ্রন্থাকারে যেসব তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সে সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে এ কথা বলতে সক্ষম নন যে, 'তাঁদের বিবৃত বিষয় সম্পূর্ণ সংশয় মুক্ত'।

কিন্তু পবিত্র কোরআন তার বিবৃত বিষয়, তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে সকল সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত বলে স্পষ্ট ঘোষণাই শুধু দেয়নি, এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। কারণ এই কোরআন যাঁর বাণী তিনি সব ধরনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও অতিন্দ্রীয় তথ্য, তত্ত্ব ও নির্ভুল জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি যে কোন ধরনের দুর্বলতা, দোষ-ত্রুটি, অক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং তিনি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সে কিতাবে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। দুর্বলতা, ভ্রান্তি, অজ্ঞতা ও অক্ষমতার বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। মানুষ সন্দেহ আর সংশয়ের আবর্তে আবর্তিত হয় এবং এটা মানুষের স্বভাবজাত। এ কারণে মানুষের চিন্তার জগতে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে যদি কোন সংশয় সৃষ্টি হয়, এ সংশয় মানুষেরই অজ্ঞতা আর অক্ষমতার প্রত্যক্ষ ফসল। এর সাথে আল্লাহর কোরআনের ন্যূনতম কোন সম্পর্ক নেই। গগন চুম্বী বিশাল অট্টালিকার সামনে একজন মানুষ যদি তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করে চোখের সামনে তুলে ধরে, তাহলে সে মানুষের দৃষ্টির সামনে থেকে আকাশ চুম্বী সেই শততলা অট্টালিকা আড়াল হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে অট্টালিকার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অট্টালিকা বিদ্যমান, এটা অটল বাস্তবতা। দুর্বলতা পরিবেষ্টিত সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানুষ নিজের অক্ষমতার কারণে যদি কোরআনের সততা নিরূপণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার যাবতীয় ব্যর্থতা মানুষের ওপরেই আপতিত হয়, আল্লাহর কোরআনকে তা স্পর্শ করতে পারে না।

কোরআন আল্লাহর বাণী

মানব জাতির সর্বকালের এবং সর্বযুগের জন্য যে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা কোন মানুষের রচনা করা কিতাব নয়। পবিত্র কোরআন যে যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল, তদানীন্তন যুগের বিভ্রান্ত লোকজন বলতো, 'এ কিতাব মানুষের রচিত।' এ ধরনের কথা প্রতিটি যুগেই বিভ্রান্ত লোকজন বলে থাকে। যারা এ ধরনের ধারণা পোষণ করে থাকে, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'য়ালা –

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ-

আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না, সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আন। (সূরা বাকারা-২৩)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কথা পরিষ্কার করে দিলেন। কোরআন অবতীর্ণের যুগে যারা ধারণা করতো যে, এটা মানুষের রচনা করা কিতাব–তাহলে যারা এ ধরনের ধারণা পোষণ করছে, তারাও মানব জাতির বাইরের কেউ নয়। তারাও তো মানুষ। সুতরাং মানুষ হিসেবে তারাও এ ধরনের কোরআন রচনা করতে সক্ষম, অতএব

কোরআনের একটি সূরার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে তারা প্রমাণ করে দিক যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোরআন আল্লাহর বাণী বলে দাবি করছেন, তা আল্লাহর বাণী নয়—বরং তা মানুষের রচনা করা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবিশ্বাসীদের লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের মনে যদি এ ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, এ কোরআন 'মানুষের কথা' তাহলে তো জ্ঞানী, বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ, পন্ডিত বলে দাবিদার সব মানুষেরই এ ধরনের কথা বলার ক্ষমতা থাকা উচিত যে, 'আমি এই কিতাব রচনা করেছি।' অথচ এ ধরনের কোন ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে কারো নেই। তবুও তোমরা আমার কিতাবের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করছো। তোমাদের দাবি তো তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন তোমরা তোমাদের দাবির অনুকুলে আমার কিতাবের ন্যায় একটি কিতাব রচনা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আমি উপর্যুপরি চ্যালেঞ্জ দিয়েছি, গোটা মানব মন্ডলী মিলিত হয়েও এমন ধরনের একটি কিতাব রচনা করতে অক্ষম।

সুতরাং নিজেদের অক্ষমতার প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে প্রকৃত সত্য গ্রহণ করে আমার প্রেরিত কিতাবের প্রতি অনুগত হয়ে যাও—এতেই তোমার জীবনের সার্বিক উন্নতি ও মুক্তি নির্ভরশীল। কোরআন যাঁর বাণী সেই আল্লাহ বলেন, তোমরা যারা আমার দাসত্ব পরিত্যাগ পূর্বক নানা ধরনের অসার বস্তুকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছো। অথচ প্রভু হওয়ার যাবতীয় যোগ্যতা কেবল মাত্র আমারই রয়েছে। তোমরা যাদেরকে প্রভু মনে করে দাসত্ব করছো, তোমাদের সেসব প্রভুদেরকে বলো, কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুক। কিন্তু তারা তোমাদেরকে কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আর এ থেকেই তো তোমাদের অনুভব করা উচিত যে, তোমাদের কোন দাবীর অনুকূলে যখন তারা এগিয়ে আসতে সক্ষম নয়, তখন তারা দাসত্ব লাভের যোগ্য হতে পারে না। দাসত্ব লাভের একমাত্র যোগ্য তো তিনিই—যিনি অনুগ্রহ করে তোমাদেরকে সত্য সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য কোরআনের মতো একটি অতুলনীয় কিতাব প্রেরণ করেছেন।

কোন কোন মানুষ এ ধারণা পোষণ করে যে কোরআনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন, সে চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র পবিত্র কোরআনের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য, সাহিত্যিক মান ও সৌন্দর্য এবং উচ্চাঙ্গের ভাষার ব্যাপারে প্রযোজ্য। এ ধরনের ভুল ধারণা যারা পোষণ করে, তারা মূলতঃ কোরআনের গভীরে প্রবেশ

করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারায় আবর্তিত হয়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কোরআনের মর্যাদা এসব ক্ষুদ্র চিন্তা-চেতনা থেকে অনেক উর্ধ্বে। কোরআনের শব্দ, ভাষা এবং সাহিত্যিক মান, বর্ণনাশৈলীর দিক দিয়ে যে অনবদ্য, অতুলনীয় এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে যে কারণে এ কথা বলা হয়েছে যে, 'মানবীয় চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এ ধরনের কিতাব রচনা করা সম্ভব নয়' সে কারণগুলো পবিত্র কোরআনে আলোচিত বিষয়াদি, কোরআন কর্তৃক উপস্থাপিত জীবনাদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য ও তত্ত্বসমূহ।

কোরআন যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছে, যে শিক্ষা মানব জাতির সম্মুখে পেশ করেছে, যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার মানব সভ্যতার সামনে উন্মোচন করেছে, যে আদর্শের দিকে মানব জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তা কোন মানবীয় মন-মস্তিষ্ক কল্পনাও করতে পারে না।

শুধু মানব জাতিই নয়–জ্বিন ও মানব জাতি সম্মিলিতভাবে কিয়ামত পর্যন্তও চেষ্টা-সাধনা করতে থাকে, তবুও আল্লাহর কোরআনের অনুরূপ কোন কিতাব রচনা করতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا–

বলে দাও, মানব ও জ্বিন জাতি সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে কোরআনের মতো একটি জিনিস আনার চেষ্টা করে তবুও তারা আনতে সক্ষম হবে না, তারা পরস্পরের সহযোগী হয়ে গেলেও। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮৮)

পবিত্র কোরআন যাঁর ওপরে অবতীর্ণ হলো, তিনি হঠাৎ করে আকাশ থেকে অবতরণ করে এ দাবী করেননি যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব নিয়ে এসেছি। বরং সেই পূত ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব জীবনের চল্লিশটি বছর সেই লোকগুলোর মাঝেই অতিবাহিত করেছেন, যে লোকগুলো এ অপবাদ দিচ্ছে যে, কোরআন তাঁর নিজের রচনা করা। যারা এ অপবাদ দিচ্ছে, তারাও এ কথা ভালো করে জানতো, এই ব্যক্তির পক্ষে এমন ধরনের কোন কিতাব রচনা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয় এবং এই ব্যক্তির পক্ষে সামান্যতম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব।

তবুও তারা যখন এই অপবাদের কালিমা আল্লাহর রাসূলের ওপরে লেপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো, তখন স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে বলতে বললেন–

قُلْ لَّوْشَاءَ اللّٰهُ مَاتَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَاأَدْرٰكُمْ بِهٖ-فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ-اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-

হে রাসূল! আপনি ওদেরকে জানিয়ে দিন, আমি তোমাদেরকে এ কোরআন শুনাবো এটা যদি আল্লাহ না চাইতেন, তাহলে আমি কোন ক্রমেই তা তোমাদেরকে শুনাতে সক্ষম হতাম না এমনকি এই কোরআন সম্পর্কে কোন সংবাদও তোমাদেরকে জানাতে পারতাম না। আমি তো তোমাদের মধ্যেই আমার জীবনের সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করে আসছি। তোমরা কি এ বিষয়টিও অনুভব করতে সক্ষম হচ্ছো না? (সূরা ইউনুছ-১৬)

যারা এ অপবাদ আরোপ করছিল যে, নিজের রচনা করা কিতাব তিনি আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, আমি যদি আমার রাসুলের ওপরে এ কোরআন অবতীর্ণ না করতাম তাহলে তিনি তোমাদেরকে এ কোরআন শুনাতে পারতেন না এমনকি এ কোরআন সম্পর্কে কোন সংবাদও তোমাদেরকে জানাতে পারতেন না। আমি না জানালে তিনি যে কোরআন শুনাতে সক্ষম হতেন না, এ কথা তোমাদের চেয়ে আর বেশী ভালো কে জানে? কেননা, তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কাল তোমাদের মাঝেই অতিবাহিত হয়েছে। যে ব্যক্তি তার জীবনের সুদীর্ঘকাল তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করলো, সে ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে তোমরা তো পরিপূর্ণভাবে অবগত রয়েছো।

আমি যাঁর ওপরে আমার কোরআন অবতীর্ণ করেছি, সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অদৃশ্য জগৎ থেকে হঠাৎ করে তোমাদের মাঝে আবির্ভূত হননি বা তিনি তোমাদের কাছে কোন অপরিচিত ব্যক্তিত্ব নন। তিনি যখন তোমাদেরকে শুনালেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে নবী নির্বাচিত করা হয়েছে, তার ক্ষণপূর্বেও কি তোমরা তোমাদের এই সুপরিচিত ব্যক্তিত্বের মুখে কোরআনের কোন আয়াত বা আলোচিত বিষয়বস্তু, কোরআন পরিবেশিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বক্তব্য শুনেছিলে? নিশ্চয়ই তোমরা তা ইতিপূর্বে তাঁর মুখ থেকে শোননি।

তাহলে কি তোমাদের মনে এ প্রশ্ন জাগে না, দীর্ঘকালের পরিচিত এই লোকটির মুখ থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত যে কালাম আমরা শুনছি, তা কোন মানুষের রচনা নয়?

ক্ষণিকের মধ্যে এই লোকটির মধ্যে কিভাবে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হলো? এতকাল এই লোকটি যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে কথা বলে এলো, সে ভাষা ও ভঙ্গীতে কোন অতিন্দ্রীয় শক্তির স্পর্শে পরিবর্তন ঘটলো? সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোকটির মুখ থেকে কিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য সমৃদ্ধ কথা নির্গত হলো? এসব বিষয়ে কি তোমাদের মনে কোন প্রশ্ন সৃষ্টি হয় না?

এসব দিক চিন্তা করলেই তো তোমরা অনুভব করতে সক্ষম হবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কালাম তোমাদেরকে শুনাচ্ছেন, তা তাঁর নিজের রচনা করা নয়−বরং তা আল্লাহর কালাম। আমি যাঁর প্রতি আমার কোরআন অবতীর্ণ করেছি, তিনি এমন নন যে, আমার কালাম তোমাদেরকে শুনিয়ে দিয়ে তিনি অন্য কোথাও চলে যান। বরং আমার কালাম তোমাদের সামনে পেশ করার পর তিনি তোমাদের মাঝেই পূর্বের ন্যায় বসবাস করতে থাকেন।

তোমাদের সাথে আত্মীয়তা ও সামাজিকতা যেভাবে ইতোপূর্বে রক্ষা করতেন, এখনও তাই করছেন। তিনি কোন ভাষায় কথা বলেন, তাঁর বাচন ভঙ্গী কি ধরনের তা তোমরা সুদীর্ঘকাল শুনেছো এবং এখনও শুনছো। আবার তিনি আল্লাহর কালাম হিসেবে যা তোমাদেরকে শুনাচ্ছেন, তার ভাব ও ভাষা, বাচন ভঙ্গী, বর্ণনাশৈলী, প্রকাশ রীতি, শব্দ চয়ন এমন নতুন ধরনের যে, যা ইতোপূর্বে তোমরা কেউ শোননি। এই পার্থক্য নিশ্চয়ই তোমরা অনুভব করে থাকো। সুতরাং তোমরা তোমাদের অনুভূতি শক্তির মাধ্যমেই অনায়াসে বুঝতে পারবে যে, এটা আল্লাহর কালাম।

মহান আল্লাহর এই যুক্তি শুধুমাত্র সেই যুগের জন্যই প্রযোজ্য ছিল না, বরং আল্লাহর এসব যুক্তি অতীতকালে যেমন প্রযোজ্য ছিল, বর্তমান কালেও তেমনিভাবে প্রযোজ্য এবং অনাগত কালেও প্রযোজ্য হবে। আরবী ভাষা সম্পর্কে যারা প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছে, তাদের সামনে যদি কোরআনের আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়, তারাও একবার মাত্র পাঠ করেই আল্লাহর বাণী এবং রাসূলের কথার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা অঙ্কন করতে সক্ষম হবেন। সুতরাং পবিত্র কোরআন যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব এবং এটা যে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বাণী, এ কথার সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহর কোরআন। এই কিতাব এমন ধরনের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত যে, এই বৈশিষ্ট্যই মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে।

উচ্চমানের সাহিত্য বৈশিষ্ট্য

নবীদের সমসাময়িক যুগের অবস্থা সম্পর্কিত ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, সেসব যুগে মানুষ যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও পারদর্শিতা অর্জন করেছিল, আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলকে সে বিষয়ে যুগের সমস্ত মানুষের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মুসাকে যখন প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন মানুষ যাদুবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। তারা যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে অস্বাভাবিক একটা কিছু প্রদর্শন করতে সক্ষম হতো। আল্লাহ তাঁর নবী হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে এমন ধরনের ক্ষমতা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন যে, তদানীন্তন যুগের শ্রেষ্ট যাদুকরদের যাবতীয় ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে প্রদত্ত ক্ষমতা ও শক্তির সামনে পানির বুদ্বুদের মতই মিলিয়ে গেল।

সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করলো, যাদুকরবৃন্দ দীর্ঘ সাধনার ফলে যে শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করেছিল, তা মুহূর্তের ভেতরে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের শক্তি ও ক্ষমতার সামনে ম্লান হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তারা এটাও স্পষ্ট অনুভব করলো যে, যাদুকরদের প্রদর্শনীমূলক ক্রিয়াকর্ম স্পষ্টতই যাদু–যা যে কোন ব্যক্তি সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম হবে। আর হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম যা প্রদর্শন করছেন, তা যাদু নয় এবং এ ক্ষমতা সাধনা করে অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং এ ক্ষমতা তিনিই দান করেছেন, যিনি এ আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং পালনকর্তা।

হযরত ঈসা রুহুল্লাহকে যখন পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন মানুষ চিকিৎসা শাস্ত্রে এতটা উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, তারা দুরারোগ্য ব্যাধি চিকিৎসার মাধ্যমে উপশম করতে সক্ষম হতো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ঈসাকে সে যুগের সমস্ত মানুষের ওপরে যোগ্যতা, ক্ষমতা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। তিনি জন্মান্ধের চোখে হাত স্পর্শ করতেন আর জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করতো। সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে হযরত ঈসার ক্ষমতা অবলোকন করতে বাধ্য হতো। সাধারণ জনগণ চিকিৎসকদের ক্ষমতা আর হযরত ঈসার ক্ষমতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হতো যে, চিকিৎসকগণ যে ক্ষমতা প্রয়োগ করছে, তা তাদের সাধনা লব্ধ ক্ষমতা। আর

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম যে ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন, তা সাধনালব্ধ কোন ক্ষমতা নয়—এ ক্ষমতা তিনিই দিয়েছেন, যিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক। নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'য়ালা সারা পৃথিবীবাসীর জন্য শেষনবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী-রাসূল আসবে না। তাঁকে যে যুগে এবং যেখানে প্রেরণ করা হয়েছিল- ইতিহাস সাক্ষী, সেখানের মানুষ ভাষা ও সাহিত্যে এতটা পারদর্শিতা অর্জন করেছিল যে তারা পরস্পরে সাধারণভাবে যেসব কথা বলতো, সে কথাগুলোও কাব্যাকারে বলতো। তাদের কথা ও রচিত পংক্তিমালার ক্ষেত্রে উচ্চমানের সাহিত্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

যেভাবে আটার স্তূপ থেকে চুল বের করা হয়

বর্তমান বিজ্ঞানের হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীর সভ্যতাগর্বী মানুষ সে যুগের মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই তাদের প্রতি 'বর্বর, মূর্খ' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে থাকে। অথচ তাদের রচিত কাব্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বর্তমানের ভাষাবিদগণ স্তব্ধ হয়ে পড়েন। সে যুগে রচিত কবিতাসমূহ বর্তমানেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পঠিত হচ্ছে। বিশ্বনবীর মহিলা সাহাবী হযরত খান্‌সা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা মাত্র কিছুদিন পূর্বে বৈরুত থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ হয়ে গোটা পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নবীর সাহাবী হযরত হাস্সান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিখ্যাত একজন কবি ছিলেন।

বর্তমানে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ইসলাম বিদ্বেষীগণ যেমন খোদাহীন কবি ও সাহিত্যিকদেরকে ব্যবহার করে থাকে, সে যুগেও ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠী সে যুগের কবি ও সাহিত্যিকদেরকে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো। এসব কবি আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিদ্রুপাত্মক ও বিদ্বেষমূলক কবিতা রচনা করে সারা আরব সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে দিত যেন সাধারণ মানুষের মনে আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবাযে কেরাম সম্পর্কে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

সাহাবায়ে কেরাম এসব কটুক্তিপূর্ণ কবিতা শুনে ব্যথিত হতেন। তাঁরা হযরত আলীকে অনুরোধ জানালেন তিনি যেন কবিতা রচনা করে ইসলাম বিদ্বেষী কবিদের জবাব দেন। হযরত আলী বললেন, আল্লাহর রাসূল যদি তাঁকে অনুমতি দেন তাহলে

তিনি জবাব দেবেন। রাসূলের কাছে অনুমতি কামনা করা হলে তিনি বললেন, আলী এ কাজের উপযুক্ত নয়। তারপর তিনি মদীনার আনসারদের লক্ষ্য করে বললেন, যাঁরা তলোয়ার দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে তাঁরা কি ভাষা দিয়ে এ বিদ্রূপের বাধা দিতে পারে না?

আল্লাহর রাসূলের এ কথা শুনে বয়স্ক একজন আনসার সাহাবী উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জিহ্বা বের করে রাসূলকে দেখালেন। তারপর তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অনুমতি কামনা করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কাজের জন্য আমি উপস্থিত। মহান আল্লাহর শপথ! আল্লাহর শত্রুদের কথার মোকাবেলা করার মতো বাক্যের থেকে বসরা, সিরিয়া এবং ইয়েমেনে আমার কাছে অন্য কোন বাক্য-ই প্রিয় নয়।' আল্লাহর রাসূল বললেন, আমি যে বংশ থেকে স্বয়ং উদ্ভূত সে বংশের লোকদের বিদ্রূপ তুমি কিভাবে করবে? হযরত হাছ্ছান বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাদের মধ্য থেকে আপনাকে এমনভাবে পৃথক করবো যেভাবে আটার স্তূপ থেকে চুল বের করা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সে প্রিয় সাহাবীর দিকে পরম মমতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং তাঁকে দায়িত্ব দিলেন, তিনি যেন ইসলাম বিদ্বেষী কবিদের জবাব কবিতা দিয়েই দেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী কবিতা রচনা করে শত্রুদের মুখ বন্ধ করে দিতেন। তিনিই দরবারে রেসালাতের সবচেয়ে বড় কবি হবার মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। হযরত বিলালের মতো একজন হাবশী গোলামও অতুলনীয় কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পরে প্রাথমিকভাবে মদীনার আবহাওয়া অনুকুল না হবার কারণে অনেকেই প্রচন্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। জ্বরের তীব্রতা এতটা ছিল যে, কারো কারো মাথার চুল পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জ্বরে আক্রান্ত হলেন। প্রচন্ড জ্বরের কারণে কখনও কখনও তিনি অসামঞ্জস্যমূলক কথা বলতেন। এই অবস্থাতেও তাঁর হৃদয়ে সুপ্ত দেশ প্রেম জাগ্রত হয়ে উঠতো এবং যার প্রকাশ ঘটতো কবিতার মাধ্যমে। তিনি তাঁর শৈশব কৈশোর আর যৌবনের চারণভূমি মক্কার বিভিন্ন স্থানের স্মৃতি চারণ করতেন কাব্যাকারে।

প্রিয় জন্মভূমি মক্কার কথা মনে পড়লেই তাঁর চোখ থেকে ঝর্ণার মত পানি ঝরতো। মাতৃভূমি মক্কার কথা স্মরণ করে তিনি বিরহ গাঁথা রচনা করে গাইতেন।

তখন তাঁর দু'নয়ন থেকে তপ্ত অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তো। তাঁর হৃদয়ের ক্ষত থেকে কবিতাকারে বের হয়ে আসতো, 'হায়! সেদিন কি আর আমি ফিরে পাবো না! যেদিন আমি মক্কার উন্মুক্ত প্রান্তরে নির্জনে একাকী রজনী অতিবাহিত করবো, আমার সঙ্গী হবে সেখানের সুগন্ধি ঘাস ইজখির আর রাতের শিশির। হায়! সেদিন কি আর আমার জীবনে দেখা দেবে! যেদিন আমি মাজনার সরোবরে সাঁতার কাটতে সক্ষম হবো! প্রাণভরে আমি তাফীলের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অবলোকন করবো!

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এমন একটি কিতাব দান করলেন, যে কিতাবের সামনে পৃথিবীর সমস্ত কবি-সাহিত্যিকদের কাব্য ও সাহিত্য প্রতিভা চিরদিনের জন্য ম্লান হয়ে গেল। আল্লাহ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করলেন-

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ-بَلْ لَّايُؤْمِنُوْنَ-فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ-

এরা কি এ কথা বলে যে, এই ব্যক্তি কোরআন নিজে রচনা করে নিয়েছে? প্রকৃত কথা হলো, এরা বিশ্বাস স্থাপন করতে চায় না। এরা যদি তাদের এই কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তারা এমন মর্যাদাপূর্ণ একটি কালাম রচনা করে নিয়ে আসুক না। (সূরা আত্-তুর-৩৩-৩৪)

পবিত্র কোরআন বিশ্বনবীর রচনা নয়-আল্লাহর চ্যালেঞ্জ শুধু এ ব্যাপারেই নয়, আল্লাহ তা'য়ালার চ্যালেঞ্জ হলো, আদৌ এ কিতাব মানব রচিত নয়। মানুষ যে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারী, তা প্রয়োগ করে এ ধরনের মর্যাদাপূর্ণ একটি কিতাব প্রণয়ন করা আদৌ সম্ভব নয়। এ ধরনের একটি কালাম রচনা করা মানুষের শক্তি ও প্রতিভার সীমার বাইরের বিষয়। আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোন দেশের জনগণের জন্যই শুধু নয়-নয় তা কালের গন্ডিতে আবদ্ধ। আল্লাহর চ্যালেঞ্জ সারা পৃথিবীবাসীর জন্য এবং অনন্ত কাল ব্যাপী।

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সাহস সেই অতীতকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্তও কেউ প্রদর্শন করেনি, অনাগত কালেও কেউ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই চ্যালেঞ্জের প্রকৃত তাৎপর্য অনেক পন্ডিত ব্যক্তি অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে মন্তব্য করে থাকেন, 'বিষয়টি শুধুমাত্র কোরআনের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা ও রচয়িতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন যে

ভাব-ভাষা ও ভঙ্গী, শব্দ চয়ন করে গ্রন্থ প্রণয়ন করে থাকেন, তা আরেকজন পারবেন না। কারণ কাব্য ও সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাদের একের বৈশিষ্ট্য আরেকজনের অনুরূপ হয় না। যেমন একজন খ্যাতিমান বক্তার অনুরূপ আরেকজন বক্তা বক্তৃতা করতে সক্ষম হন না, হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

আসলে এ ধরনের লোকজন আল্লাহর চ্যালেঞ্জের প্রকৃত তাৎপর্য ও স্বরূপ যথার্থভাবে অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে থাকে। এরা মনে করে, কোরআনে যেভাবে শব্দ চয়ন করা হয়েছে, যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, যে ভঙ্গী অনুসরণ করা হয়েছে, বর্ণনার ক্ষেত্রে যে অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে, আল্লাহর চ্যালেঞ্জ বোধহয় এসব ক্ষেত্রেই করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর চ্যালেঞ্জের স্বরূপ হলো, পবিত্র কোরআন যে ধরনের সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চতর মু'জিযার অধিকারী গ্রন্থ, মান-মর্যাদার সুষমামন্ডিত উচ্চতর বৈশিষ্ট্য ও বিশাল মাহাত্মসম্পন্ন গ্রন্থ, অতুলনীয় শিক্ষাদর্শ প্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রন্থ, এমন ধরনের কোন গ্রন্থ রচনা করতে যদি সক্ষম হও, তাহলে সে ক্ষমতা প্রদর্শন করো। শুধুমাত্র আরবী ভাষাতেই নয়, সারা পৃথিবীর যে কোন ভাষায় কোরআনের সমকক্ষ মু'জিযা, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করতে যদি সক্ষম হও তাহলে তা করো। এটাই আল্লাহর চ্যালেঞ্জের প্রকৃত স্বরূপ।

কিয়ামত পর্যন্তও হবে না

মহান আল্লাহ যখন কোরআন অবতীর্ণ করেন, তখনও এ কোরআন একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা ছিল, বর্তমান কালেও তা রয়েছে এবং অনন্ত কাল ধরেও তা অক্ষুন্ন থাকবে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কোরআন এক অতুলনীয় ও অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক মহাগ্রন্থ। আল্লাহ তা'য়ালা এই কিতাবে যে ব্যাপক ও সর্বাত্মক জ্ঞান সন্নিবেশিত করেছেন, সে জ্ঞানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও অতীত কালে যেমন কোন মনীষীর মধ্যে স্ফুরণ ঘটতে দেখা যায়নি, বর্তমানে এই বিজ্ঞানের যুগেও দেখা যায় না, অনাগত কালেও দেখা যাবে না।

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সমূহে কোন ব্যক্তি জ্ঞানের কোন একটি শাখায় পারদর্শিতা অর্জনের লক্ষ্যে গোটা জীবনকাল অতিবাহিত করার পরও জ্ঞানের সেই শাখার শেষ স্তর পর্যন্ত তার পক্ষে পৌঁছা সম্ভব

হয় না। সেই ব্যক্তিই যখন তার আকাংখিত জ্ঞানের শাখায় বিচরণের লক্ষ্যে আল্লাহর কোরআনের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন সে দেখতে পায়—গোটা জীবনকাল সে যার অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল, তার স্পষ্ট জবাব ও সমাধান এ কিতাবে রয়েছে।

এই বিষয়টি শুধুমাত্র পরিচিত—অপরিচিত, আবিষ্কৃত—অনাবিষ্কৃত জ্ঞানের বিশেষ কোন একটি শাখার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়-গোটা বিশ্বলোক ও সৃষ্টি জগৎসমূহ, গোটা প্রাণীজগৎ এবং উদ্ভিত জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রথম স্তর থেকে শেষ স্তর পর্যন্ত পবিত্র কোরআনে বিবৃত হয়েছে। অথচ যে যুগকে বলা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ, যে যুগে জ্ঞানের কোন একটি শাখাও বর্তমান কালের ন্যায় বিকশিত হয়নি, সেই সুর্যোত্তাপস্নাত মরুপ্রান্তরে মুর্খতার তিমিরাবৃত যুগে সম্পূর্ণ নিরক্ষর একজন ব্যক্তি কারো কোন সাহায্য ও গবেষণা ব্যতীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় অকল্পনীয় নির্ভুল ব্যাপক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা অর্জন করলেন এবং প্রতিটি মৌলিক বিষয়ের নির্ভুল স্পষ্ট জবাব রচনা করেছিলেন, এ কথা কি কারো পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব? সম্ভব নয় বলেই কোরআন নিজেকে আল্লাহর কালাম বলে দাবী করে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরবী ভাষায় পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। ভাষাবিদগণ বলেন, পৃথিবীর সমস্ত ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে আরবী ভাষা থেকে। অর্থাৎ সমস্ত ভাষার মা হলো আরবী, এই ভাষার গর্ভ থেকেই অন্যান্য সমস্ত ভাষা জন্ম গ্রহণ করেছে। এ কারণে পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার ভেতরেই আমরা দেখতে পাই, পরিবর্তিত রূপে বর্তমান সময় পর্যন্তও আরবী শব্দ বিদ্যমান রয়েছে।

এই আরবী ভাষার সর্বোন্নত এবং পূর্ণপরিণত যাবতীয় উচ্চাঙ্গের বৈশিষ্ট্যসহ সাহিত্য মানের চূড়ান্ত বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহর কিতাব। পবিত্র কোরআনের ত্রিশ পারার মধ্যে কোথাও কোন একটি শব্দ অথবা কোন একটি ব্যাখ্যাও অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না, যা নিম্নমানের হতে পারে। যে সূরায় বা যে আয়াতে যে বিষয়েই বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত শোভন, উপযুক্ততম শব্দ চয়ন এবং বাচনভঙ্গীতে পেশ করা হয়েছে।

কোরআনে একই বক্তব্যের পুনরুচ্চারিত করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই তা সম্পূর্ণ নতুন রূপে পরিবেশন করা হয়েছে এবং বলার ভঙ্গীতে অভিনবত্ব রয়েছে, ভিন্ন ধারা

অনুসরণ করা হয়েছে। এ কারণে কোথাও পুনরুচ্চারণের বা পুনরাবৃত্তির অশোভনতা অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না। কোরআনের সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাছ পর্যন্ত শব্দ চয়ন ও সংযোজন এমনভাবে করা হয়েছে, যেন কোন অলঙ্কার শিল্পী তার সাধনালব্ধ কারিগরী কৌশল প্রয়োগ করে হীরক খন্ড একটার পরে আরেকটা সজ্জিত করে এক অনুপম সৌন্দর্যময় আভা ফুটিয়ে তুলেছে। কোরআনের কথার অলঙ্কার ও বর্ণনাশৈলীর প্রভাব এতটা মাধুর্যমন্ডিত যে, ভাষাশিল্পীগণ তা শোনার পরে নিজের অজ্ঞাতেই শ্রদ্ধা নিবেদনে বিরত থাকতে পারে না।

আল্লাহর কোরআনের প্রতি যাদের হৃদয়ে অবিশ্বাস, সন্দেহ-সংশয় রয়েছে, এ ধরনের ব্যক্তির কানে কোরআন তেলওয়াতের শব্দ প্রবেশ করলে তারা আভিভূত হয়ে পড়েন। প্রায় দেড় হাজার বছর অতিবাহিত হতে চললো, আল্লাহর কোরআনে জীর্ণতার স্পর্শ ঘটেনি–কিয়ামত পর্যন্তও ঘটবে না এবং কোরআন তার নিজ ভাষায় সাহিত্যের এক অতুলনীয় উচ্চতর নিদর্শন হিসেবে পৃথিবীবাসীর সামনে স্বীয় মাহিমা প্রকাশ করে আসছে। এই কোরআনের সমকক্ষ হওয়ার দাবি করা তো অনেক দূরের ব্যাপার, আরবী ভাষায় রচিত কোন একটি গ্রন্থও আল্লাহর কিতাবের উচ্চতর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং তার মূল্যমানের প্রথম সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি।

বিষয়টি এখানেই শেষ হয়নি, আল্লাহর কোরআন আরবী ভাষাকে এমন দৃঢ় ভিত্তি দান করেছে যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তও আরবী ভাষার বিশুদ্ধতা ও বিশিষ্টতার মান তাই অক্ষুন্ন রয়ে গিয়েছে, যা আল্লাহর কোরআন প্রথম থেকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। অথচ গত প্রায় দেড় হাজার বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর প্রতিটি ভাষাতেই পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষাই এতটা সুদীর্ঘকাল ব্যাপী শব্দ গঠন, উপমা প্রয়োগ, সংযোজন, রচনারীতি, বানান পদ্ধতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তার আদি ও অকৃত্রিম রূপ, কাঠামোসহ টিকে থাকতে সক্ষম হয়নি। শুধুমাত্র কোরআনের মু'জিযা, অভ্যন্তরীণ অমিত দুর্জয় শক্তিই আরবী ভাষাকে তার সর্বোচ্চ মান ও বৈশিষ্ট্যের আসন থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত করার প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেয়নি। যেসব কারণে কোরআন নিজেকে আল্লাহর বাণী বলে দাবী করে, উল্লেখিত কারণও তার ভেতরে একটি।

মহান আল্লাহ যে শব্দ, অক্ষর, বর্ণনাশৈলী, রচনারীতি, বাচনভঙ্গী সহযোগে যখন অবতীর্ণ করেছিলেন, বর্তমান কাল পর্যন্তও তার একটি অক্ষরও পরিত্যক্ত হয়নি-কিয়ামত পর্যন্তও হবে না। কোরআনের প্রতিটি বাকরীতি আরবী সাহিত্যে বর্তমান সময় পর্যন্তও অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। আল্লাহর কিতাবের সাহিত্য এখন পর্যন্তও আরবী ভাষায় সর্বোচ্চ মানের সাহিত্য হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি লাভ করে আসছে এবং কোরআনে যে বিশুদ্ধতম ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, বর্ণনায়, রচনায়, লিখনে-ভাষণে এখন পর্যন্তও তাকেই ভাষার বিশুদ্ধ রীতি বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছে। পৃথিবীতে এ যাবৎ কাল পর্যন্ত বহু পন্ডিত ব্যক্তি তাদের স্ব-স্ব ভাষায় কালজয়ী সাহিত্য নির্মাণ করে আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছেন। কিন্তু কোন একটি সাহিত্যই কি আল্লাহর কোরআনের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের একটিকেও স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে? হয়নি এবং কখনো হবে না বলেই পবিত্র কোরআন নিজেকে আল্লাহর কিতাব বলে দাবী করে।

এই কোরআন কোন এক নির্দিষ্ট দিনে একত্রে অবতীর্ণ হয়নি। প্রথমে প্রাথমিক পর্যায়ের হেদায়েত অবতীর্ণ করা হলো। তারপর সেই হেদায়েতের মাধ্যমেই একটি সংস্কারমূলক আন্দোলন ও ভবিষ্যতের গর্ভস্থ দিনগুলোর জন্য সর্বব্যাপী বিপ্লবের সূচনা করে দেয়া হলো। বিশ্বনবীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন পুনঃজাগরিত হলো, সে আন্দোলন দীর্ঘ তেইশ বছরে এসে সফলতা অর্জন করলো।

দীর্ঘ তেইশ বছরে আন্দোলন যেসব চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে সম্মুখে সফলতার সোনালী দ্বার প্রান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে কোরআনের বিভিন্ন অংশসমূহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ মোবারক থেকে কখনো নাতিদীর্ঘ ভাষণ কখনো বা সংক্ষিপ্ত ভাষণাকারে এ কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছিলো। পরবর্তীতে আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে দ্বীনি আন্দোলন সফলতা অর্জনের পর্যায়ে কোরআনের বিভিন্ন অংশসমূহকে পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থাকারে পৃথিবীবাসীর সামনে 'কোরআন' নামকরণ করে পেশ করা হয়েছে।

কোন ব্যক্তি যদি এই কোরআনকে রাসূলের স্বকপোলকল্পিত বলে দাবী করে, তাহলে তার এটা দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, সারা পৃথিবীর ইতিহাস একত্রিত করে তার ভেতর থেকে এমন একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যে, একজন মানুষ

বছরের পর বছর ধরে একটি প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির মোকাবেলা করে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কখনো উপদেশ দানকারী হিসেবে, কখনো নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে, কখনো একটি মজলুম জনগোষ্ঠীর মুক্তির অগ্রনায়ক হিসেবে, কখনো একটি বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবে, কখনো আইন প্রণেতা ও আইনদাতা হিসেবে, কখনো একটি বিশাল সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর সিপাহ্সালার হিসেবে, কখনো বিজয়ী নেতা হিসেবে, কখনো আধ্যাত্মিক জগতে পৌছার পথপ্রদর্শক হিসেবে এবং সে আসনে আসীন হয়ে যে বক্তৃতা ও ভাষণ দান করেছেন, নানা উপলক্ষ্যে যেসব কথাবার্তা বলেছেন, তা একত্রে সংগ্রহ করে একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ সুসংবদ্ধ বিপ্লবাত্মক সর্বব্যাপী চিন্তাদর্শ ও ব্যবহারিক জীবনে কর্ম বিধানে পরিণত করা হয়েছে এবং সে বিধানে কোন ক্রম-বিরোধ, অসামঞ্জস্য বা বৈষম্যের স্পর্শ ঘটেনি, তার সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত একই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও চিন্তা-শৃংখলার ধারা বাস্তবায়িত হয়ে টিকে থাকতে দেখা গিয়েছে, তা মানব গোষ্ঠীর সামনে প্রদর্শন করা। এ ধরনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা কারো পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি, অনাগত দিনেও সম্ভব হবে না বিধায় কোরআন নিজেকে আল্লাহর বাণী বলে দাবি করে।

হঠাৎ করে আকাশ থেকে অবতরণ করেননি

কোরআন যাঁর ওপরে অবতীর্ণ হলো, সেই মহামানব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিনই তাঁর মহান বিপ্লবী আন্দোলনের যে ভিত্তি স্থাপন করেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেই ভিত্তির ওপর অটল অবিচল থেকে চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনে কর্মের এমন একটি সর্বাত্মক ব্যবস্থা নির্মাণ করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, যার প্রতিটি স্তর অন্যান্য স্তরের সাথে পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে।

রাসূলের পবিত্র জবান মোবারক থেকে কোরআন যে ভাষণাকারে প্রকাশিত হয়েছে, তা চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ সত্যানুসন্ধিৎসু মন-মানসিকতা নিয়ে পাঠ করলে এ কথার স্বীকৃতি দানে বাধ্য হবেন যে, রাসূল যে আন্দোলনের সূচনা করলেন, তার শেষ স্তর পর্যন্ত পৌছাতে পথের কোন বাঁকে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে, কোন ধরনের পরিস্থিতিকে স্বাগত জানাতে হবে, তার পরিপূর্ণ একটি চিত্র রাসূলের দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট ছিল। আন্দোলনের যাত্রাপথে পথিমধ্যে রাসূলের মন-মস্তিষ্কে এমন কোন

নতুন চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে, যা বর্তমানে অনুপস্থিত ছিল অথবা থাকলেও সে চিন্তার পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, এমন কোন বিষয় অনুসন্ধান করে পাওয়া যায় না। এমন ধরনের বিস্ময়কর সৃজনশীল প্রতিভা প্রদর্শনকারী, অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী কোন ব্যক্তিত্ব সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তও পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেনি, ভবিষ্যতের গর্ভে অপ্রকাশিত শতাব্দীসমূহেও কখনো পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। যতগুলো কারণে কোরআন নিজেকে আল্লাহর বাণী বলে দাবী করে, এ কারণটিও তার মধ্যে অন্যতম।

আল্লাহর এই কোরআনে মহান আল্লাহ যে বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন, তা যেমন সর্বব্যাপী বিপ্লবাত্মক তেমনি ব্যাপক ও বিশাল। এর আলোচিত বিষয়ের পরিধি অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত গোটা সৃষ্টিলোকে পরিব্যপ্ত এবং বিস্তৃত। সৃষ্টি জগতসমূহের অন্তর্নিহিত রহস্য, মহাসত্য, প্রকৃত তত্ত্ব; এর সূচনা ও সমাপ্তি, বিনাশ এবং সর্বশেষ পরিণতি; এর নিয়ম-শৃঙ্খলা, আইন-বিধান, পরিচালনা ইত্যাদির ব্যাপারে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এই মহা-বিশাল সৃষ্টিলোকের স্রষ্টা, পরিচালনাকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী, লালন-পালনকারীর পরিচয় কি, তিনি কি ধরনের গুণাবলীর অধিকারী, এসব গুণাবলীর ধরন কি, তাঁর ক্ষমতার পরিধি কতটা ব্যাপক, কর্মের সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, কোন মহাসত্যের ভিত্তিতে এই বিশাল বিশ্বলোক তার অস্তিত্ব নিয়ে টিকে রয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে, তা পবিত্র কোরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই বিশ্বলোকে অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষের সম্মান-মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে কোরআন সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা দিয়ে তা নির্ধারণ করে এ কথা জানিয়ে দিয়েছে যে, এটাই হলো মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব ও জন্মগত সম্মান-মর্যাদা। এতে সামান্যতম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের যে সম্মান ও মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে মানুষের জন্য চিন্তা ও কর্মের অভ্রান্ত পথ ও জীবনাদর্শ কি হতে পারে, যা স্রষ্টার সৃষ্টিপদ্ধতির সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল এবং মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বিস্তারিতভাবে এই কোরআনে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর মানুষের জন্য অন্ধকার ও ধ্বংসের পথ কোনটি, যে পথ মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের সাথে সাংঘর্ষিক, মানুষের স্বভাব ও চিন্তা-চেতনার বিপরীত, সেটাও এই কোরআন সুস্পষ্টরূপে পার্থক্য নির্দেশ করেছে।

অভ্রান্ত পথ ও পদ্ধতি কেন অভ্রান্ত তা যেমন এ কোরআনে অখন্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছে, তেমনি ভ্রান্ত পথ ও পদ্ধতি কেন ভ্রান্ত তা-ও নির্ভুল যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কোরআন গোটা বিশ্বলোকের প্রতিটি জিনিস, সৃষ্টি জগতের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম দিক, বিশ্ব-ব্যবস্থার এক একটি স্তর, মানুষের দেহাভ্যন্তরের নানা দিক, তার সত্ত্বার অস্তিত্ব, মানুষের ইতিহাস থেকে অসংখ্য ও অগণিত বাস্তব প্রমাণ ও নিদর্শনাদি পৃথিবীর সামনে পেশ করেছে। সেই সাথে এ কথাও মানুষকে এ কোরআন অবগত করেছে যে, মানুষ কি কি কারণে, কোন আকর্ষণে, কিভাবে ভ্রান্ত পথের পথিক হয় এবং এর পরিণতি কি, আর যা চিরসত্য, অনন্তকাল উত্তীর্ণ মহাসত্য, তা কিভাবে অনাদীকাল পর্যন্ত অবিকৃত ও অভ্রান্ত থাকবে এবং এ বিষয়টি মানুষ কি করে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, তা মানুস্কে এই কোরআন নির্ভুল পদ্ধতির দিকে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দান করেছে।

কোনটি ভ্রান্ত পথ আর কোনটি অভ্রান্ত পথ তা এই কোরআন মানুষকে অবগত করেই ক্ষান্ত হয়নি, সেই অভ্রান্ত পথের একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার অনুপম চিত্রও মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে। এই চিত্রে মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের যে বিভাগে যেখানে যা প্রয়োজন, তা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ বিধি-ব্যবস্থা ও মূলনীতিসমূহ অত্যন্ত বোধগম্য পদ্ধতিতে পেশ করেছে। সেই সাথে এ কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, অভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে এবং ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করলে তার কি ফল ও পরিণতি এই পৃথিবীতে প্রকাশিত হবে, মানুষের চলমান জীবনে তার কি পরিণতি অনিবার্যভাবে দেখা দেবে, আখিরাতের জীবনেই বা কি ধরনের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে, তা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

মানুষের জীবন ও এই পৃথিবীর সমাপ্তি কিভাবে ঘটবে এবং দ্বিতীয় আরেকটি জীবন ও জগৎ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করবে তা এই কোরআনে অঙ্কিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই পরিবর্তন কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় ঘটবে, তার প্রতিটি স্তরে কি ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হবে, এসবের প্রতিটি দিকের এক একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র কোরআন তার পাঠকের দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত করে তুলে দিয়ে ঘোষণা করেছে, এই পৃথিবীর পরবর্তী পৃষ্ঠায় মানুষ তার দ্বিতীয় জগতে কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করবে; কোন প্রক্রিয়ায় মানুষ এই পৃথিবীতে করে যাওয়া যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদিহি করবে; কোন ধরনের অনস্বীকার্য পরিস্থিতির ভেতরে তার কর্মের রেকর্ড তুলে দেয়া হবে; এই রেকর্ডের সত্যতা প্রমাণের জন্য কি ধরনের অখন্ডনীয় বলিষ্ঠ যুক্তি ও

সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে; শাস্তি ও পুরস্কার কি ধরনের হবে, কেন শাস্তি ও পুরস্কার-দেয়া হবে তা মানুষের সামনে এই কোরআন স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে আর এসব কারণেই কোরআন নিজেকে আল্লাহর কিতাব বলে দাবী করে। এ দাবীর প্রতি চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা না অতীতে কারো ছিল, বর্তমানেও কারো নেই এবং ভবিষ্যতেও কারো হবে না।

এই পৃথিবীতে আল কোরআনই হলো একমাত্র গ্রন্থ যা মানব জাতির সমুদয় চিন্তা-চেতনা, চরিত্র-নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি এক কথায় মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতির ওপর যে ব্যাপকতর, সুগভীর ও বিপ্লবাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে, এ ধরনের সর্বব্যাপক ও সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আর একটিও নেই। প্রথম পর্যায়ে এই কোরআন পৃথিবীর একটি জাতির ওপরে প্রভাব বিস্তার করে তাদের জীবন ধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। তারপর কোরআনের রঙে রঙিন সেই জাতি গোটা পৃথিবীর একটি বিরাট অংশের মানুষের জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতির ওপরে কম-বেশী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

এই কোরআন পৃথিবীতে যে বিপ্লবাত্মক ভূমিকা পালন করেছে এবং করছে, তা পৃথিবীর কোন একটি আদর্শ বা কোন একটি গ্রন্থের পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়নি। কোরআন শুধুমাত্র সজ্জিত অক্ষরের আকারে কাগজের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ হয়ে থাকে না, বরং মানুষের বাস্তব কর্মের পৃথিবীতে এর এক একটি শব্দ, প্রভাব, শিক্ষা, চিন্তাদর্শ ও মতবাদের অনুপম রূপায়নে সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণ করে এক দৃষ্টান্তহীন কর্ম সম্পাদন করেছে এবং এখনো করছে। কোরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছিল তখন তার যে প্রভাব ও বিপ্লবাত্মক ভূমিকা ছিল, আজও তা বিদ্যমান রয়েছে। সে যুগে কোরআনের শিক্ষা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যে পাঠক পাঠ করতো, কোরআন তার পাঠককে সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করতো, কোরআনের এই অতুলনীয় প্রভাব ও ক্ষমতা বর্তমানেও যেমন বিদ্যমান রয়েছে, অনাদিকাল পর্যন্তও বিদ্যমান থাকবে। কোরআন যে মহান আল্লাহর বাণী, এটাও তার একটি বড় প্রমাণ।

আল্লাহর এই কিতাব যাঁর ওপরে অবতীর্ণ হলো তিনি হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পবিত্র জবান মোবারক থেকেই কোরআন উচ্চারিত

হয়েছিলো। তিনি হঠাৎ করে আকাশ থেকে অবতরণ করেননি। তিনি সেই সমাজেই তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সোনালী দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন। তিনি এমনও ছিলেন না যে, হঠাৎ কোন অদৃশ্যলোক থেকে এসে কোরআন জনসমাজে শুনিয়ে পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যেতেন। তিনি সর্বাত্মক বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করার পূর্বেও যেমন মানব সমাজেই অবস্থান করেছিলেন, আন্দোলনের সূচনা করার পরও সেই সমাজেই উপস্থিত থাকতেন, আন্দোলন সফলতার সিংহদ্বারে উপনীত হবার সেই শুভ মুহূর্তেও মানব সমাজেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর দৈনিন্দন জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম অভ্যাস ও কথা বলার ধরনের সাথে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সঙ্গী-সাথীগণ অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর সারা জীবনে বলা কথার সিংহ ভাগই বর্তমানেও হাদীস গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে।

আল্লাহর বাণী হিসেবে তাঁর পবিত্র জবান থেকে যা মানুষ শুনতো এবং তাঁর নিজের কথাগুলোও মানুষ শুনতো। তাঁর সমভাষাভাষী লোকজন স্পষ্ট অনুভব করতে সক্ষম হতো যে, কোনটা আল্লাহর বাণী আর কোনটা তাঁর নিজের কথা। পরবর্তী কালের আরবী ভাষাবিদগণও কোনটি রাসূলের কথা আর কোনটি আল্লাহর বাণী, তার পার্থক্য রেখা স্পষ্টভাবে অঙ্কন করতে সক্ষম হতেন। রাসূলের দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে কোথাও কোরআনের আয়াত ব্যবহৃত হলে, হাদীস আর কোরআনের বাকরীতিসহ অন্যান্য পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পার্থক্য এতটাই প্রকট যে, আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ যে কোন ব্যক্তি কোরআনের আয়াত আর হাদীস শুনলেই অঙ্গুলি সংকেত করতে সক্ষম হন, কোনটি রাসূলের বাণী আর কোনটি আল্লাহর কালাম। এই বিরাট পার্থক্যের কারণে কোরআন অবিশ্বাসীদের কাছে কতকগুলো বড় প্রশ্ন করা যায় যে, একই ব্যক্তির পক্ষে কি সম্ভব, বছরের পর বছর ধরে দুটো ভিন্নতর ধারায় ও ভাষায় কথা বলা? একই ভাষার দুটো স্বতন্ত্র ধারা রপ্ত করে তা অভ্যাসে ও বাকরীতিতে পরিণত করা কি একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব?

কোরআন ও হাদীসের ভাষা যে একই ব্যক্তির, এ ধরনের দাবী করা কি বর্তমান সময় পর্যন্ত কারো পক্ষে সম্ভব হয়েছে? পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই কি এ ধরনের অসম্ভব স্বাতন্ত্র রক্ষা করে প্রতিদিনের জীবন পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছে? একজন মানুষ সাময়িকভাবে এ ধরনের অভ্যাস রপ্ত করে কৃত্রিমতার অভিনয় কিছু দিনের জন্য চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী কারো পক্ষে কথা বলার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সতর্কতার সাথে দুটো ধারা বজায় রাখা সম্ভব? একজন মানুষ

আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া কালাম পাঠ করে শুনালে তার ভাষা-ভাব ও ভঙ্গী হবে ভিন্ন এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আর তার নিজের কথা ও বক্তৃতার ভাষা-ভাব ও ভঙ্গী পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে এবং এই নীতিদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে অবিকল অক্ষুন্ন থাকবে, এটা কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে? পারে না বলেই এই কিতাব আল্লাহর বাণী হওয়ার দাবী পেশ করে।

কোরআন আল্লাহর বাণী—এ কথার ওপরে পাহাড়ের মতোই অটল অবিচল থেকে রাসূল দাওয়াতী কাজ ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেছেন এবং এ পথে অবর্ণনীয় সমস্যার মোকাবিলা তাঁকে করতে হয়েছে। কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসীগণ তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে, নির্যাতনের এমন কোন পদ্ধতি অবশিষ্ট ছিল না যা তাঁর ওপরে করা হয়নি। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তাঁর আন্দোলনের কর্মীগণ কষ্টার্জিত সহায়-সম্পদের মমতা বিসর্জন দিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। বছরের পর বছর তাঁকে ও তাঁর আন্দোলনের সাথীদেরকে অনাহারে থাকতে হয়েছে, বৃক্ষের পত্র-পল্লব ও শুকনো চামড়া খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্ত করতে হয়েছে। দরিদ্রতার কষাঘাতে নির্মমভাবে জর্জরিত হতে হয়েছে। প্রতিপক্ষ তাঁদের ওপরে এমন নির্যাতন করেছে যে, তাঁদের দেহের চর্বি-গোস্ত আগুনের তাপে গলে গলে পড়েছে। তাঁদের বুকের ওপরে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে, বন্য পশুর পায়ের সাথে তাঁদেরকে বেঁধে দিয়ে সে পশুকে দৌড়াতে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁদের গায়ের গোস্ত নির্মম কন্টকের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পথের ধুলোয় মিশেছে।

তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করার পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছে প্রতিপক্ষ। লড়াই-সংগ্রাম হয়েছে তাঁদের প্রতি মুহূর্তের সাথী। সংগ্রামের ময়দানে কখনো তিনি ও তাঁর সাথীগণ বিজয়ী হয়েছেন, আবার কখনো প্রতিপক্ষ বিজয়ী হয়েছে। তাঁর প্রাণের শত্রু যখন পরাজিত হয়েছে, তখন তাঁর মহানুভবতা অবলোকন করে শত্রু তার মাথা সেই পবিত্র কদম মোবারকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। প্রথম থেকেই তিনি আল্লাহ প্রদত্ত মহাক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, আবার অতিরিক্ত ক্ষমতা হিসেবে তিনি বিশাল রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। জনপ্রিয়তার সর্বশীর্ষে তিনি অবস্থান করছেন। একজন মানুষের জীবনে যখন এতগুলো অবস্থার সমাবেশ ঘটে, তখন সে মানুষের মন-মানসিকতা কখনো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই ধরনের থাকতে পারে না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত কঠিন ব্যক্তিত্বশালী লোকের মধ্যেও হৃদয়াবেগের স্ফুরণ কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে

ঘটে যায়। মানুষ হিসেবে আল্লাহর রাসূল যেসব কথা বলেছেন, সেসব কথা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর ভেতরে কোথাও কোথাও হৃদয়াবেগের প্রতিফলন ঘটেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কালাম হিসেবে যে কথাগুলো তাঁর জবান মোবারক থেকে মানুষ যা শুনেছে, তার মধ্যে মানবীয় হৃদয়াবেগের সামান্যতম চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতেও কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসী গবেষকগণ আল্লাহর কিতাবে মানবীয় হৃদয়াবেগ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

তাদেরকে এ কিতাব শোনা থেকেও দূরে রাখা হয়েছে

পবিত্র কোরআন যে যুগে অবতীর্ণ হচ্ছিলো, সে যুগে মানুষের মধ্যে একটি বিরাট গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল, যারা ছিল অশুভ শক্তির সাধক। এদের ভেতরে ছিল যাদুকর, গণৎকার, ভবিষ্যৎবক্তা ইত্যাদি। এরা ছিল শয়তানের পূজারী। মহান আল্লাহ্ সূরা নাসের শেষ আয়াতে তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে শয়তান শুধু ইবলিসই নয়, মানুষের দেহসত্তার মধ্যে শয়তানি শক্তি নিহিত রয়েছে। আবার মানুষের ভেতরেও শয়তান রয়েছে এবং জ্বিনদের মধ্যেও শয়তান রয়েছে।

এই শয়তান জ্বিনদেরকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে এক শ্রেণীর লোক মানব সমাজে একটা উদ্ভট কিছু প্রদর্শন করে সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। সাধারণ মানুষ যখন কোন ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়তো, তখন তারা এসব গণৎকার আর জ্বিনের পূজারীদের কাছে গিয়ে সমস্যা মুক্ত হবার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে নিজেদের ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহ ব্যক্ত করতো। এসব অশুভ শক্তির সাধক শয়তানের সহযোগিতায় এমন ধরনের আকর্ষণীয় কথা শুনায় যে, হতাশাগ্রস্ত মানুষ তাদেরকেই শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে গণ্য করে। এসব সাধকগণ অজ্ঞ মানুষদের কাছে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল।

সে যুগে এ ধরনের শয়তানি শক্তির পূজারীদের সমাজে প্রভাব ছিল ব্যাপক। কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসী লোকজন তখন ধারণা করেছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোধহয় নিজেকে সমাজে একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রচার করছেন যে, তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কালাম অবতীর্ণ হচ্ছে; আসলে তাঁর সাথে জ্বিনদের যোগাযোগ হয়েছে ও শয়তানের যোগসূত্র স্থাপন হয়েছে; আর তাদের কাছ থেকে তিনি যা শুনছেন—তাই আল্লাহর

বাণী বলে দাবী করছেন। তাদের এ ধারণা ও কথার প্রতিবাদ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা শুআরার ২১০-২১২ আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করলেন-

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ-وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ-

এ (সুস্পষ্ট কিতাবটি) নিয়ে শয়তানরা অবতীর্ণ হয়নি। (কিতাব অবতীর্ণের) এ কাজটি তাদের শোভাও পায় না এবং তারা এমনটি করতেও সক্ষম নয়। তাদেরকে (শয়তানদেরকে) তো এ (কিতাব) শোনা থেকেও দূরে রাখা হয়েছে।

কে এই কোরআন বিশ্বনবীর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করেছেন, সে কথাও মানুষকে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আশ্ শু'আরায় জানিয়ে দিয়েছেন-

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ-

এটি রাব্বুল আলামীনের নাযিল করা জিনিস। একে নিয়ে আমানতদার রুহ অবতরণ করেছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাওয়াতী কার্যক্রম ও আন্দোলন পরিচালিত করছিলেন, তখন মক্কার কুরাইশদের ভেতরে ইসলাম বিরোধী শক্তি এ আন্দোলনের বিস্তৃতি রোধ করার লক্ষ্যে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন জ্বিন প্রভাবিত ব্যক্তি হিসেবে সর্বত্র প্রচার ও প্রসার করে যাচ্ছিলো। এই ভোঁতা অস্ত্র ব্যতীত তাদের কাছে ইসলামকে প্রতিহত করার দ্বিতীয় কোন কার্যকরী অস্ত্র মওজুদও ছিল না।

এ জন্য তারা প্রথমে আল্লাহর রাসূলকে সাধারণ মানুষের কাছে অগ্রহণীয় করে তোলার জন্য অপপ্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এই বিভ্রান্তি ছড়ানোর পশ্চাতে যে কারণসমূহ বিদ্যমান ছিল, তার ভেতরে কা'বা ঘরের নেতৃত্বের আসন হারানোর ভয় ছিল অন্যতম। কেননা, সৃষ্টির আদিকাল থেকেই পবিত্র কা'বাঘরের সম্মান ও মর্যাদা ছিল পৃথিবীব্যাপী।

সুতরাং যারা কা'বাঘরের তত্ত্বাবধায়ক ছিল, কা'বাঘরের কারণেই অন্যান্য মানুষের কাছে তাদের সম্মান ও মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। কা'বার খাদেমদেরকে কেউ বলতো আল্লাহর প্রতিবেশী, কেউ বলতো আল্লাহর পরিবার, কেউ বলতো খোদার বংশধর। অর্থাৎ তারা ছিল পুরোহিত শ্রেণী। এ কারণে তারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের

মধ্যে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। অন্যান্য মানুষদেরকে তারা হীনতার দৃষ্টিতে দেখতো। ধর্মকর্মের বিভিন্ন দিক তারা কাটছাট করে নিজেদের জন্য অনেক বিধান পরিবর্তন করে সহজ করে নিয়েছিল।

কা'বার খাদেম হবার কারণে সমস্ত দিক দিয়ে তারা নানা ধরণের সুবিধা ভোগ করতো। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমাজের অন্য মানুষকে যে সব সমস্যার মোকাবেলা করে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হত, কুরাইশরা ছিল এর ব্যতিক্রম। কা'বাঘরকে কেন্দ্র করে তাঁরা নানাবিধ সুযোগ আদায় করতো। কা'বার সেবক ও পুরোহিত হবার কারণে গোটা সমাজে তাদের নেতৃত্ব ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত।

কুরাইশদের লোকজনই কা'বা এবং সমাজের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিল। অর্থ সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিল হারেস ইবনে কায়েসের ওপর। পরামর্শ দানের দায়িত্ব ছিল ইয়াজিদ ইবনে রাবিয়া আসাদীর ওপর। কেউ নিহত হলে তাঁর রক্তপণের মীমাংসা করার দায়িত্ব ছিল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ওপর। পতাকা বহন করার দায়িত্ব ছিল আবু সুফিয়ানের ওপর। মানুষের ভাগ্য গুনে দেখার দায়িত্ব ছিল মাকওয়ান ইবনে উমাইয়ার ওপর। মক্কার গরীবদের সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল হারেছ ইবনে আমেরের ওপর। কা'বার চাবির এবং মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব ছিল উসমান ইবনে তালহার ওপর। হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্ব ছিল হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ওপরে। কারো সাথে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসা করার দায়িত্ব ছিল হযরত ওমরের ওপর। তাঁবু এবং যান-বাহনের দায়িত্ব ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার ওপর।

ওতবা ইবনে রাবিয়া, আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী, আবু লাহাব, আবু জেহেল, আসওয়াদ ইবনে মুতালিব, ওতবা ইবনে আবু মুয়িত, উবাই ইবনে খালফ, নজর ইবনে হারেস, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস ও আখনাস ইবনে শুরাইক সাকাফী–এ সমস্ত লোকগুলোর প্রভাব ছিল গোটা মক্কায় সর্বাধিক। এদের নেতৃত্বও ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই সমস্ত লোকগুলোর সবাই কোন না কোন দিক দিয়ে আল্লাহ রাসূলের সাথে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা ছিল। কেউ কেউ ছিলেন রাসূলের আপন চাচা। সে সময়ে কুরাইশরাও জানতো একজন নবীর আগমন ঘটবে। তাদের ধারণা ছিল কুরাইশ গোত্রের কোন নেতাকেই নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হবে। তদানীন্তন সমাজে যে ব্যক্তির প্রচুর অর্থ সম্পদ এবং সেই সাথে সবচেয়ে বেশী পুত্র সন্তান থাকতো, তাকেই শাসক হিসাবে বরণ করে নেয়া হত।

এটা ছিল সে সমাজের প্রথা এবং অধিক সন্তান থাকা ছিল সমাজে গর্ব ও মর্যাদার বিষয়। নানা ধরণের কুসংস্কারের মধ্যে এটাও প্রচলিত ছিল যে, যার পুত্র সন্তান যত বেশী সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরের জগতে ততবেশী মর্যাদা লাভ করবে। আর যার পুত্র সন্তান থাকবে না বা পুত্র সন্তানের সংখ্যা অল্প থাকবে, পরকালে তার কোন সম্মান নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহর নবীর কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিল না বা তাঁর তেমন ধন ঐশ্বর্য ছিল না। সুতরাং, তাঁর মত মানুষ কী করে নবী হতে পারে বিষয়টি ছিল তাদের কাছে বোধের অগম্য ও অবিশ্বাসের বিষয়। তাদের কল্পনায় যে ধরনের লোক নবী হবার উপযুক্ত, সে ধরনের লোকের অভাব তাদের ভেতরে ছিল না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র ছিল তাদের কল্পনা ও চিন্তা-চেতনার বিপরীত।

সুতরাং, আল্লাহর রাসূলের দাওয়াত গ্রহণ না করে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বিস্তৃতি ঘটানোর এটাও একটা কারণ। সে সময় পর্যন্ত মুসলমানগণ নামাজ আদায় করতো বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে। এ কারণে কুরাইশরা ধারণা করতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খৃষ্টানদের মত বাইতুল মুকাদ্দাসকে যখন নিজের আদর্শের কেবলা হিসাবে মনোনীত করেছে, তখন নিশ্চয়ই সে খৃষ্টানদের মতবাদ মক্কায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়–এই ধরনের ভ্রান্তিতেও তারা নিমজ্জিত ছিল।

কুরাইশদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপগোত্র ছিল। তাদের মধ্যে দুটো গোত্র ছিল এমন যে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। একে অপরকে মুহূর্তের জন্য সহ্য করতে রাজী ছিল না। তাঁর মধ্যে একটা গোত্র ছিল বনী হাশেম অপরটি ছিল বনী উমাইয়া। আব্দুল মুত্তালিব তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে বনী হাশেমকে সম্মান ও মর্যাদার অতি উচ্চ স্থানে আসীন করেছিলেন। তাঁর ভেতরে যেমন ছিল নেতৃত্বের গুনাবলী তেমন ছিল তাঁর অর্থ বিত্ত। ফলে সমাজে বনী হাশেমের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর সন্তানদের মধ্যে কেউ নেতৃত্বের সে আসন ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। আব্দুল মুত্তালিবের মত নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন তাঁর কোন সন্তানই ছিল না। তাঁর এক সন্তান আবু তালিব যিনি ছিলেন দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। আরেক সন্তান আব্বাস যদিও সম্পদশালী ছিলেন কিন্তু পিতার ন্যায় তিনি দানবীর ছিলেন না, পিতার মত ব্যক্তিত্বও তাঁর ছিল না। আরেক সন্তান আবু লাহাব ছিল সমাজে চরিত্রহীন নামে পরিচিত। সুতরাং, পিতার মত কোন সন্তানই নেতৃত্বের আসন ধরে রাখতে পারেনি।

ফলে বনী উমাইয়া গোষ্ঠী আব্দুল মুত্তালিব জীবিত থাকতেই অন্তরে যে আশা পোষণ করতো, তাঁর অবর্তমানে তাদের সে দীর্ঘকালের আশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা সামনে এগিয়ে এলো। সমস্ত দিক থেকে বনী হাশেমকে কোণঠাসা করে নেতৃত্বের পদ দখল করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বনী হাশেমের সন্তান।

সুতরাং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দিলে বনী হাশেমের নেতৃত্ব মেনে চলতে হবে, এ কারণে তারা তাঁর আন্দোলনে বাধার সৃষ্টি করেছে, অপপ্রচার করেছে। আর ইতিহাসে দেখা যায় এই বনী উমাইয়াগণই ইসলামের ইতিহাসে কলঙ্কজনক ঘটনার জন্মদান করেছে সবচেয়ে বেশী। এই উমাইয়া গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান ইসলামের বিরুদ্ধে একমাত্র বদর যুদ্ধ ব্যতীত সমস্ত যুদ্ধে নেতৃত্বদান করেছে। তাঁর স্ত্রী হিন্দা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কলিজা বের করে চিবিয়ে ছিল। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার জন্মদাতাও এই বনী উমাইয়াগণ। তিনজন খলীফার হত্যাকান্ড এবং ইসলামী শাসন অবসানে বনী উমাইয়াদেরই ষড়যন্ত্র অধিক কার্যকর ছিল।

আবু জেহেলের গোত্র ছিল বনী মাখজুম গোত্র। এই গোত্রের গোত্রপতি ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা। এরাও বনী হাশেম গোত্রের শত্রু ছিল। সুতরাং, হাশেম গোত্র থেকে কেউ নবীর দাবী করলে তারা তা গ্রহণ করবে না, এমন ঘোষনা স্বয়ং আবু জেহেল দিয়েছিল। বনী উমাইয়া গোত্রের ওতবা ইবনে আবু মুয়িত ছিল আল্লাহর নবীর প্রাণের শত্রু। আল্লাহর রাসূল নামাজ আদায় করছিলেন আর ওতবা নবীর পবিত্র শরীর মোবারকের ওপর উটের পচা নাড়ি ভূড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল।

সমস্ত কুরাইশদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তি ছিলেন সৎ এবং ভদ্র। তাঁরা কোন ধরনের দাঙ্গা পছন্দ করতেন না। যে কোন সমস্যাকেই তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে আগ্রহী ছিলেন। রাসূলকে কেন্দ্র করে তারা যে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, এ সমস্যাকে অন্যরা যেমন শক্তি প্রয়োগ করে সমাধান করতে আগ্রহী ছিল, ভদ্র ব্যক্তিগণ তাতে বাধা দিতেন।

কুরাইশ দাঙ্গাবাজ নেতৃত্বের মধ্যে চরিত্র বলতে কিছু ছিল না। স্বয়ং আবু লাহাব ছিল চোর, কা'বাঘরের স্বর্ণের পাত্র সে চুরি করেছিল। কেউ ছিল মিথ্যাবাদী, কেউ ছিল কুমন্ত্রণাদানকারী। নৈতিক দিক দিয়ে তারা সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর

রাসূল একদিকে শিরক্ তথা অংশীদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কঠোর সমালোচনা করতেন অপর দিকে চারিত্রিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে বলতেন। ফলে নেতাদের প্রকৃত চরিত্র সাধারণ মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়ে যেত। নেতাদের নেতৃত্ব সাধারণ মানুষ গ্রহণ করবে না, এ কারণে তারা বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে লেগেছিল। সে সমাজে যারা ছিল নেতা, নেতৃত্বের আসনে বসে যারা প্রভূত অর্থ বিত্তের মালিক হয়েছিল ও সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে যারা গোটা জাতিকে শোষণ করছিল, নেতৃত্বের আসনে বসে যারা নিজেদেরকে সব ধরনের আইন-কানুনের উর্ধ্বে মনে করতো, তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে পবিত্র কোরআন জ্বালাময়ী ভাষণ পেশ করতো ও ক্ষেত্র বিশেষে তাদের নাম ঠিকানা আকারে ইঙ্গিতে সাধারণ মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দিচ্ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কঠোর বক্তব্য রাখতেন, ফলে স্বার্থান্বেষী নেতাগণ রাসূলের কার্যক্রমের মধ্যে নিজেদের মৃত্যু দেখে ছুটে গেল আবু তালিবের কাছে।

তোমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারো

চাচা আবু তালিব সে সব নেতাদেরকে নানা ধরনের কথা বলে কোন রকমে শান্ত করে বিদায় করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল তাঁর আন্দোলনকে আরো গতিদান করলেন। এবারে আস ইবনে ওয়াইল, আবু সুফিয়ান, ওলীদ ইবনে মুগীরা, ওতবা ইবনে রাবিয়া, আবু জেহেল, আস ইবনে হিশাম প্রমুখ কাফের নেতৃবৃন্দ আবু তালিবের কাছে এলো। তারা হুমকির ভাষায় তাঁকে জানালো, 'তোমার আশ্রয় প্রশ্রয়ে মুহাম্মাদ আমাদের উপাস্য দেবতাদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করে, আমাদেরকে বলে আমরা নাকি জ্ঞানহীন মূর্খ। সে আমাদেরকে ভুল পথের পথিক বলে এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল পথভ্রষ্ট এ কথাও বলে। তুমি তাকে বিরত করতে পারোনি। এখন তুমি তাঁর পেছন থেকে সরে যাও আর না হয় তুমিও তাঁর পক্ষাবলম্বন করে আমাদের সাথে লড়াইতে চলে এসো।'

আবু তালিব পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তিনি অনুভব করলেন বিশ্বনবীর জন্য ময়দান কতটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে পরিস্থিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সমস্ত দিক চিন্তা করে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ডেকে বললেন, 'বাবা! এমন কোন ভারী বোঝা আমার কাঁধে আরোপ করো না, যা আমি বহন করতে পারবো না।'

ময়দানের প্রকৃত অবস্থা রাসূলের অজানা ছিল না। চাচার কথার যে কি তাৎপর্য তাও তিনি অনুভব করলেন। তাঁর কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পরিস্থিতি চাচা আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। পরম শ্রদ্ধাভরে তিনি তাঁর চাচাকে জানালেন, 'মহান আল্লাহর কসম করে আপনাকে জানাচ্ছি চাচাজান! যারা আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে অভিযোগ করছে, তারা যদি আমার এক হাতে আকাশের চন্দ্র আর আরেক হাতে আকাশের সূর্য ধরিয়ে দেয় তবুও আমি যে দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি তা থেকে বিরত হবো না। মহান আল্লাহ এ কাজের পূর্ণতা দান করবেন আর না হয় আমি এ পথে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দেব।'

এই কথাগুলো বলার সময় আল্লাহর নবীর পবিত্র চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। তিনি চাচার কাছ থেকে উঠে চলে যেতে লাগলেন। কিছু দূর অগ্রসর হবার পরে আবু তালিব তাঁকে পুনরায় ডাক দিলেন। প্রাণপ্রিয় ভাতিজার কথাগুলো চাচা আবু তালিবের মর্মে স্পর্শ করেছিল। তিনি প্রিয় ভাতিজার দিকে মমতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা! তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করতে থাকো। এমন কোন শক্তি নেই যে তোমার ওপরে আঘাত করবে। তোমাকে আমি কারো হাতেই তুলে দেব না।'

আবু তালিব তাঁর ভাতিজাকে সহযোগিতা করা হতে বিরত হবেন না, এ কথা শুনে তারা এক অদ্ভূত পদ্ধতি আবিষ্কার করে পুনরায় আবু তালিবের কাছে গেল। তাদের সাথে ছিল উমারাহ ইবনে ওয়ালিদ নামক এক সুদর্শন যুবক। তারা আবু তালিবের কাছে ঐ ছেলেটিকে দেখিয়ে প্রস্তাব দিল, এই ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি সাহসী। আপনি একে গ্রহণ করে মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে তুলে দিন, তাকে আমরা হত্যা করি। একজনের বিনিময়ে আপনি আরেকজনকে লাভ করছেন।

আবু তালিব ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে তাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, খোদার শপথ! তোমরা একটা নোংরা প্রস্তাব আমার কাছে পেশ করছো। আমি কখনো তোমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না। তোমরা তোমাদের সন্তানকে আমার কাছে দেবে আমি তাকে ভরণপোষণ করতে থাকবো, আর আমার সন্তানকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দেব তোমরা তাকে হত্যা করবে। খোদার শপথ ! তোমরা মনে রেখো, কোনদিন তা সম্ভব নয়। তাঁর স্পষ্ট কথা শুনে কাফের নেতা মুতয়িম ইবনে আদী পুনরায় বললো, আবু তালিব! আপনার গোষ্ঠীর লোকজন আপনার কাছে

যথাযথ প্রস্তাব দান করেছে। যে বিষয়ে আপনি নিজেও চরম অসুবিধার মধ্যে আছেন, এরা আপনাকে সেই অসুবিধা থেকেই মুক্তি দিতে এসেছে অথচ আপনি তা গ্রহণ করছেন না। আবু তালিব জবাব দিলেন, খোদার শপথ! তোমরা আমার সাথে ন্যায় বিচার করোনি। তোমরা এসেছো আমাকে অপমান করতে। এ কারণে সমস্ত মানুষকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়েছো। তোমরা যাও, তোমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথায় অটল থাকলেন। তাঁর শত্রু পক্ষ অনেক চিন্তা ভাবনা করে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকলো। কেননা, গৃহযুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। তারপর মুহাম্মাদকে হত্যা করলে গোত্রে গোত্রে যে পুনরায় যুদ্ধ সৃষ্টি হবে এবং তার পরিণাম যে সমূলে ধ্বংস, এসব দিক তারা ভেবেছিল। সুতরাং, তারা নির্যাতনের পথ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলো। আল্লাহর রাসূলের নামাজ আদায়ের সময় গলিত আবর্জনা তাঁর পবিত্র শরীরে নিক্ষেপ করা, তাকে দেখে হৈ চৈ করা, বিদ্রূপ করা, তাঁর চলার পথে কাঁটা, আবর্জনা বিছিয়ে রাখা, তিনি নামাজে দাঁড়ালে তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ করা, ইত্যাদি অত্যাচার শুরু করলো। যে সব গোত্রের দু'চার জন মুসলমান হয়েছিল তাদের ওপরে নির্যাতন আরম্ভ করলো।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, অবস্থা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন আবু তালিব বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব গোত্রে গমন করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপরে কোন অত্যাচার হতে দেয়া যাবে না এবং তা প্রতিরোধ করা হবে ও তাঁকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা হবে। বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিব গোত্র আবু তালিবের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানালো। কিন্তু অভিশপ্ত আবু লাহাব সমর্থন দিলনা। সে এবং তাঁর স্ত্রী আল্লাহর রাসূলের সাথে বিরোধিতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখলো।

অপবাদের জবাব

রাসূলের দাওয়াতকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল সেখানে তাদের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল, তাহলো রাসূল কোরআনের বাণী হিসেবে যা মানুষকে শোনাচ্ছেন তা মানুষের হৃদয় গভীরে প্রবেশ করছিল, সাধারণ মানুষের কাছে এই বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল, আল্লাহর কোরআনের বাণী মানুষের কাছে পৌছানোর পথ বন্ধ করার মতো শক্তি তাদের ছিল না। কোরআনের প্রভাব থেকে মানুষকে কিভাবে দূরে রাখা যায়, এ চিন্তায় তারা গলদঘর্ম হচ্ছিলো। অবশেষে তারা লোক সমাজে রাসূলকে যাদুকর, গণৎকার হিসাবে পরিচিত করার অপপ্রয়াস গ্রহণ করেছিল যেন লোকজন এ ধারণা করে যে, গণৎকারদের মনে যেমন জ্বিন শয়তানরা নানা ধরনের কথার সৃষ্টি করে দেয়, তেমনি মুহাম্মাদের মনেও শয়তান এসব কথার সঞ্চার করে দিচ্ছে আর তিনি তা আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করছেন। ইসলাম বিরোধী শক্তির এই অপবাদের জবাবে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, এ কিতাব শয়তান অবতীর্ণ করতে সক্ষম নয় এবং শয়তানের মুখে কোরআনের বাণী শোভা পায় না।

কেননা কোরআন যে শিক্ষাদর্শ উপস্থাপন করছে, শয়তানের চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষা তো সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সুতরাং, কোরআন উপস্থাপিত শিক্ষা কি করে শয়তান পেশ করতে পারে? আল্লাহর কালামকে গণৎকারের কথা বলে তোমরা যারা প্রচার করছো, তোমরা যে দেশে, সমাজে বাস করছো, সেখানে যথেষ্ট গণৎকার অবস্থান করছে এবং তোমরা বহু গণৎকারের সঙ্গ লাভ করেছো, তাদের কথা শুনেছো। গণৎকারের বক্তব্য কি ধরনের হতে পারে এ ব্যাপারে তোমরা অভিজ্ঞ। আমার নবীর মুখ থেকে যে কোরআন তোমরা শুনছো, সে কোরআন আর গণৎকারের কথার মধ্যে সামান্যতম কোন সামঞ্জস্য রয়েছে কি?

শয়তান কর্তৃক সঞ্চারিত কথার ভিত্তিতে এতকাল যাবৎ গণৎকারগণ তোমাদের মধ্যে যে শিক্ষাদর্শ প্রচার করে এসেছে, কোরআন তার ঠিক বিপরীত শিক্ষাদর্শ প্রচার করে, তাহলে এ কোরআন কি করে শয়তান কর্তৃক সঞ্চারিত কথামালা হতে পারে? তোমরা এবং তোমাদের কোন পূর্ব পুরুষ কি এ কথা কখনো শুনেছে যে, কোন শয়তান গণৎকারের মাধ্যমে মূর্তিপূজা ও সমস্ত ইলাহকে ত্যাগ করে এক আল্লাহর দাসত্ব করার শিক্ষা মানুষের সামনে পেশ করেছে? পৃথিবীতে মানুষ যা

করছে, এসব কাজের জবাবদিহি আদালতে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে করতে হবে–এ কথা কি শয়তান বলেছে? যাবতীয় অন্যায় ও গর্হিত কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার কথা কি শয়তান কোনদিন বলেছে? ভ্রান্ত ও অসৎ পথ ত্যাগ করার কথা কি শয়তান বলেছে? শয়তানরা এসব সৎপ্রবৃত্তি লাভ করবে কিভাবে? কেননা শয়তানের মূল স্বভাবই হলো, মানুষকে অসৎ পথপ্রদর্শন করা, তাদেরকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করা। সুতরাং শয়তান কি করে কোরআনের শিক্ষার ন্যায় অতুলনীয় আদর্শ প্রচার করতে পারে? কোরআনের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করেও কি তোমরা অনুধাবন করো না, এসব কথা শয়তান কর্তৃক অবতীর্ণ হতে পারে না?

শয়তানের সাধক ও তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী গণৎকারদের কাছে তোমরা তো এসব প্রশ্ন করতে যাও যে, আমার অমুক জিনিসটা হারিয়ে গিয়েছে, তার সন্ধান করে দিন। আমি অমুক একটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, তাকে আমার জীবন সাথী করার ব্যবস্থা করে দিন। আমি অমুক দিন অমুক কাজ শুরু করছি, তাতে সফল হবো কিনা বলে দিন। আমি অমুক ব্যাপারে বাজি ধরেছি, তাতে বিজয়ী হবো কিনা বলে দিন। আমার এই ক্ষতি হয়েছে, কে ক্ষতি করেছে তার সন্ধান বলে দিন। গণৎকারগণ তো চিরদিন তোমাদের এসব কাজ সফল করে দিতে পারে বলে তোমাদেরকে ধারণা দিয়ে এসেছে।

তারা তো কোনদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দাসত্ব করার বিষয় শিক্ষা দেয়নি বা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে কোন নীতিমালা পেশ করেনি। আর আমার রাসূলের মুখ দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণী প্রকাশিত হচ্ছে এবং তোমরা তা শুনছো, সেসব বাণী তো মানুষের জন্য কল্যাণকর নীতিমালায় পরিপূর্ণ। সুতরাং, এ বাণী কি করে শয়তান কর্তৃক সঞ্চারিত হতে পারে?

আর শয়তান যদি মানব জাতিকে কল্যাণের পথে নিয়ে আসার জন্য কোন শিক্ষামূলক আদর্শ পেশ করতে চায়-ও, তবুও তো সে তা পারবে না। কেননা, আল্লাহর কোরআনের তুলনায় কোন কল্যাণকর আদর্শ শয়তানের পক্ষে পেশ করা সম্ভব নয়। শয়তান যদি ক্ষণিকের জন্য কৃত্রিম শিক্ষকের আসনে আসীন হয়ে মানুষকে শিক্ষা প্রদান করতে চায়, তবুও তো সে শিক্ষা কোরআনের নির্ভেজাল মহাসত্য ও নৈতিকতার উচ্চতর সর্বব্যাপী বিপ্লবাত্মক নীতিমালার সাথে কোন দিক থেকেই তুলনীয় হতে পারে না।

প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করার লক্ষ্যেও শয়তান যদি সৎকাজের আহ্বায়ক হিসাবে অভিনয় করে, তবুও তো তার কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে তার স্বভাবজাত শয়তানী প্রকাশ পাবেই। যে ব্যক্তি শয়তানের অনুপ্রেরণায় নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে বসে, তার নিজের জীবনে ও তার শিক্ষার মধ্যে অনিবার্যরূপে উদ্দেশ্যের অবিশুদ্ধতা, ইচ্ছাশক্তির অপবিত্রতা প্রকাশিত হবেই। নির্ভেজাল সততা ও নির্ভুল সৎকর্মশীলতা কোন শয়তান মানুষের হৃদয় জগতে সঞ্চারিত করতে সক্ষম নয়। আর শয়তানের সাথে যারা সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তারা কখনো মহাসত্যের ধারক-বাহক হতে পারে না। তদুপরি পবিত্র কোরআনের শিক্ষার উচ্চতর সম্মান ও মর্যাদা, পবিত্রতা, কোরআনের সুনিপুন বাগধারা, সাহিত্যালঙ্কার এবং সুগভীর তত্ত্বজ্ঞান, সৃষ্টিজগৎ ও প্রাণীজগৎ সম্পর্কে স্পষ্ট মৌলিক ধারণা যা গোটা কোরআনে বিস্তৃত রয়েছে যার ভিত্তিতে কোরআন বার বার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে যে, এ কোরআনের অনুরূপ কোন আয়াত শয়তান, জ্বিন ও সমস্ত মানুষ তাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করেও রচনা করতে সক্ষম নয়। শুধু তাই নয়, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম রাসূলের কাছে কোরআন নিয়ে আগমন করেন, তখন তাঁর আগমন পথের কোন একটি স্থানে শয়তান অবস্থান করা তো দূরের কথা, দূরে-বহুদূরে সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এমনটি কখনো ঘটেনি যে, ওহী নিয়ে আসা হচ্ছে আর শয়তান সেই পথে গোয়েন্দাগিরি করছিল এবং ওহীর বিষয়বস্তু কিছুটা সে জেনে নিয়ে তার পূজারীদের কাছে সে এ কথা জানিয়ে দিয়েছে, আজ মুহাম্মাদের ওপরে অমুক বিষয়বস্তু সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হবে। এটা যদি ঘটতো তাহলে তোমরা তোমাদের গণৎকারদের মাধ্যমে নিশ্চয়ই এতদিন শুনতে সক্ষম হতে।

সেই প্রাচীন কাল থেকেই কিছু সংখ্যক মানুষের ধারণা যে, উর্ধ্বজগতে মহান আল্লাহ যেসব সিদ্ধান্তের কথা তাঁর ফেরেশতাদেরকে অবগত করে থাকেন, ফেরেশতারা তা নিয়ে যখন আলোচনা করে, তখন জ্বিন ও শয়তান উর্ধ্বজগতে আড়ি পেতে তা শ্রবণ করে এসে তার পূজারীদেরকে জানিয়ে দেয়। এভাবেই গণৎকারগণ ভবিষ্যৎবাণী করে থাকে। পবিত্র কোরআন বলছে, মানুষের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, শয়তান উর্ধ্বজগতে গমন করার ক্ষমতা সম্পন্ন। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, শয়তান অবশ্যই উর্ধ্বজগতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা সে জগতের ব্যবস্থাপনা এমনভাবে সুসম্পন্ন করেছেন যে,

শয়তানের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। আল্লাহ উর্ধ্বজগতে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নিমার্ণ করেছেন। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সে জগত থেকে উত্তপ্ত উল্কাপিন্ড নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। শয়তান সে জগতের আশেপাশে ঘুরঘুর করার চেষ্টা করলেই একটি মহাশক্তিশালী অগ্নিপিন্ড তাকে ধাওয়া করে। সুতরাং রাসূলের মুখ থেকে যে কোরআন প্রকাশিত হচ্ছে, তা পরিপূর্ণভাবে শয়তানের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব মুক্ত।

এরপরেও বলা হয়েছে, এই কিতাব এমন এক সত্তার মাধ্যমে নবীর কাছে প্রেরণ করা হয়, যিনি যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত। এ কোরআন নিয়ে কোন বস্তুগত শক্তি আগমন করেনি, যার মধ্যে পরিবর্তন ও অবক্ষয়ের সামান্যতম কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে। সেই সত্তা যাকে বলা হয়েছে 'রুহুল আমিন' তাঁর ভেতরে বস্তুবাদিতার কোন চিহ্ন নেই। মানব জাতির মধ্যে যেমন অবিশ্বস্ততার প্রবণতা বিদ্যমান, রুহুল আমিন বা জিবরাইল আলাইহিস্ সালাম এসব প্রবণতা থেকে মুক্ত। তিনি সম্পূর্ণরূপে আমানতদার। পৃথিবীর অতিবিশ্বস্ত মানুষও প্রলোভনে পড়ে ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্বস্ততা হারিয়ে বসে।

কারণ মানুষের মধ্যে প্রলোভিত হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু রুহুল আমিন সে প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—তাঁকে সৃষ্টিই করা হয়েছে সেভাবে। এ কারণে তিনি যখন কোরআন নিয়ে আসেন, তখন শয়তান এর ভেতরে কোন মিশ্রণ ঘটাবে, এ সুযোগ শয়তান লাভ করা তো অনেক পরের ব্যাপার, রুহুল আমিনের আগমন পথ থেকে শয়তানকে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থান করতে হয়। সুতরাং কোরআন শয়তান কর্তৃক সঞ্চারিত কোন বাণী নয়—এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে গোটা জগতের প্রতিপালক, স্রষ্টা ও পরিচালক, নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে।

দুশমনদের ওপরে কোরআনের প্রভাব

পবিত্র কোরআন যখন অবতীর্ণ হচ্ছিলো, তখন যারা এর বিরোধিতা করেছে, তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল—এই কিতাবকে তারা না পারছিল আল্লাহর বাণী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে, না পারছিল এটাকে মানুষের রচনা করা কিতাব হিসাবে প্রমাণ করতে। এই কিতাবকে যদি তারা আল্লাহর বাণী হিসাবে স্বীকৃতি দান করে তাহলে তাদের নেতৃত্বের অবসান ঘটে এবং সেই সাথে আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বিষয়টি তাদের কাছে ছিল একেবারেই অসহনীয়। অপরদিকে নবীর

বিরুদ্ধে তারা যে অপপ্রচার চালাচ্ছিলো, সে অপপ্রচারের ফল হচ্ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ–যাদের অন্তরে ছিল সত্যানুসন্ধিৎসা, তারা ক্রমেই আল্লাহর কোরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দ্বীনি আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হচ্ছিলো। প্রতিটি যুগে এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই চিরসত্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অস্ত্র যতই শানিত করা হয়েছে, সাধারণ মানুষ ততই এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

সে যুগে যারা কোরআন বিরোধিতার নেতৃত্ব দিচ্ছিলো, তারা এটা স্পষ্ট অনুভব করেছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের যে বাণী প্রচার করছেন, তার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। এ কারণে তারা সাধারণ মানুষকে এই কোরআন শোনা থেকে বিরত থাকতে বলতো। মক্কার ইসলাম বিরোধিদের ইসলাম নির্মূলের অগণিত পরিকল্পনার মধ্যে একটি পরিকল্পনা ছিল এই যে, রাসুল যখনই কোন সমাবেশে মানুষকে কোরআনের কথা শোনাবেন, তখনই সেখানে একটা শোরগোল সৃষ্টি করে কোরআন শোনানোর পরিবেশ নষ্ট করে দেয়া। নানাভাবে কোরআনের মাহফিলে বাধা সৃষ্টি করা, যেন মানুষের ওপরে এই কোরআন কোন প্রভাব সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়।

ইসলাম বিরোধী শক্তি এই অস্ত্র শুধু সে যুগেই প্রয়োগ করেনি, বর্তমানেও তারা তাদের সেই পুরনো অস্ত্র প্রয়োগ করে কোরআন শোনা থেকে মানুষকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করে। ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা কোরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হবার পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করে থাকে। সে যুগে ইসলাম বিরোধিরা সাধারণ মানুষকে কোরআনের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য বলতো–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ–

এসব কাফেররা বলে, এ কোরআন তোমরা কখনো শুনবে না। আর যখন তা শুনানো হবে তখন শোরগোল সৃষ্টি করবে। হয়তো এভাবে তোমরা বিজয়ী হবে।

কোরআন কী অসাধারণ প্রভাব ক্ষমতার অধিকারী কিতাব, এই কিতাবের দাওয়াত যিনি দিচ্ছেন তিনি কেমন অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁর এই

ব্যক্তিত্বের সাথে উপস্থাপনার ভঙ্গি কেমন বিস্ময়করভাবে কার্যকর হচ্ছে, তা ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট অনুভব করতে পারতো। তারা এ কথা বিশ্বাস করতো, এ ধরনের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির জবান থেকে এমন চিত্তাকর্ষক-হৃদয়গ্রাহী মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে এই দৃষ্টান্তহীন কালাম যার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত কোরআনের আন্দোলনের প্রতি দুর্বল হবেই হবে। অতএব যে প্রকারেই হোক, কোরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হতে দেয়া যাবে না। কিন্তু যারা এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতো, স্বয়ং তারাই নিজেদের অজান্তে আল্লাহর কোরআনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়তো।

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, সিজদার আয়াত সম্বলিত সূরা আন্ নাজম-ই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকেই এই হাদীসের যেসব অংশসমূহ হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ, হযরত আবু ইসহাক ও হযরত জুবাইর ইবনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, সূরা আন্ নাজম-ই কোরআনের প্রথম সূরা যা আল্লাহর রাসূল কুরাইশদের এক সমাবেশে সর্বপ্রথম তেলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন। সমাবেশে কাফির ও মুমিন উভয় শ্রেণীর লোকজনই উপস্থিত ছিল।

শেষের দিকে আল্লাহর নবী যখন সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তখন উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সিজদায় চলে গেল। ইসলাম বিরোধিদের বড় বড় নেতারা পর্যন্ত–যারা অন্যদের অপেক্ষা বেশী বিরোধী ছিল–সিজদা না করে পারলো না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি কাফিরদের মধ্যে মাত্র একজন–উমাইয়া ইবনে খালফ্কে দেখলাম, সে সিজদা করার পরিবর্তে কিছুটা মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বললো, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। আর পরবর্তী সময়ে আমি এ দৃশ্যও দেখতে পেয়েছি যে, লোকটি কুফরি অবস্থায়ই নিহত হলো।

এ ঘটনার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হচ্ছেন হযরত মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদা'আ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেননি। হাদীস গ্রন্থ নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদে তাঁর নিজের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সূরা নাজম তেলাওয়াত করে সিজদা করলেন

এবং উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেল, কিন্তু আমি সেজদা করলাম না। বর্তমানে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ আমি এভাবে করি যে, এ সূরা তিলাওয়াত কালে আমি কক্ষণ-ই সেজদা না করে ছাড়ি না।

নবুয়্যত লাভের পর পাঁচটি বছর পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল কেবলমাত্র গোপন বৈঠক-মজলিসে ও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আল্লাহর কালাম শুনিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন সাধারণ জনসমাবেশে কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত করে শোনানোর কেন সুযোগই তাঁর হয়নি। ইসলাম বিরোধিদের প্রবল প্রতিরোধই ছিল এর প্রধান অন্তরায়। নবীর ব্যক্তিত্বে, তাঁর প্রচারমূলক কার্যাবলী ও তৎপরতার কী তীব্র আকর্ষণ ছিল এবং কোরআনের আয়াতসমূহের কী সাংঘাতিক প্রভাব ছিল, সে বিষয়ে তারা ভালোভাবেই অবহিত ছিল।

এ কারণেই তারা নিজেরাও এই কালাম না শুনার এবং অন্যরাও যেন শুনতে না পারে সে জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করতো না। নবীর বিরুদ্ধে নানা ধরনের ভুল ধারণা প্রচার করে তারা দ্বীনি আন্দোলনের দাওয়াতকে অবরুদ্ধ ও দমন করতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে একদিকে তারা নানা স্থানে এ কথা রটিয়ে দিচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে এবং এখন অন্য লোকদেরকে বিভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করছে। অপরদিকে তিনি যেখানেই কোরআন শুনানোর জন্য চেষ্টা করতেন সেখানেই হট্টগোল, কোলাহল ও চিৎকার করা তাদের একটা স্থায়ী নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে কী কারণে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলা হচ্ছে, লোকেরা যাতে তা জানতেই না পারে, এই শোরগোল করার মূলে এটাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই পরিস্থিতিতে একদিন আল্লাহর রাসূল হারাম শরীফের মধ্যে কুরাইশদের একটি বড় সমাবেশে আকস্মিকভাবে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এ সময় আল্লাহর পক্ষ হতে বিশ্বনবীর মুখে যে ভাষণটি পরিবেশিত হয়েছে, তা-ই পবিত্র কোরআনে সূরা আন্ নাজম রূপে বিদ্যমান। এ কালামের প্রভাব এত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, আল্লাহর নবী যখন এ সূরা তিলাওয়াত করছিলেন, তখন তার বিপরীতে ইসলাম বিরোধিগণ এতটাই মোহিত হয়ে পড়েছিল যে, তারা হৈ-চৈ হট্টগোল করবে—এমন কোন চেতনাই তাদের ছিল না। ভাষণ শেষে নবী যখন সিজদায় পড়ে গেলেন, তখন তাঁর সাথে সাথে উপস্থিত ইসলাম বিরোধিগণও সিজদায় পড়ে গেল।

এটা ছিল কোরআনের প্রতি তাদের একটা বড় দুর্বলতা। তারা এ দুর্বলতা প্রদর্শন করে পরে বিব্রত বোধ করছিল। সাধারণ লোকজন তাদেরকে তিরস্কার করতে লাগলো যে, যে কালাম শুনতে তারাই নিষেধ করে আর সে কালাম শুনে স্বয়ং নিষেধকারী নেতাগণই সেজদায় পড়ে যায়। নেতাবৃন্দ মনোযোগ দিয়ে মুহাম্মাদের কোরআনও শুনেছে এবং সেজদাও করেছে। এই পরিস্থিতিতে ইসলাম বিরোধী নেতাগণ নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

এটা কোনো কবির কথা নয়

হযরত ওমরের মতো কঠিন হৃদয়ের মানুষও কোরআনের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোরআনের প্রভাব তাঁকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। আল্লাহর রাসূলকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে একদিন রাতে তিনি রাসূলকে অনুসরণ করছিলেন। গভীর রাতে আল্লাহর নবী কা'বাঘরে নামাজ আদায় করার জন্য গিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসুল নামাজে দাঁড়িয়ে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন।

হযরত ওমর তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি অন্ধকারে অদূরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নবীর পবিত্র জবান মোবারক থেকে কোরআন শুনছিলেন। কোরআনের বাণীর অপূর্ব সামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করে তাঁর মনে এ কথার উদয় হলো যে, এই মুহাম্মাদ সম্ভবত উচ্চমানের কবি হয়ে গিয়েছেন। তিনি মনে মনে এ কথাগুলো বলছিলেন, আর সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মুখ থেকে উচ্চারিত করালেন– وَمَاهُوَبِقَوْلِ شَاعِرٍ-قَلِيْلاً مَّاتُؤْمِنُوْنَ-

এটা কোন কবির কথা নয়, তোমরা খুব কমই ঈমান এনে থাকো। (হাক্কাহ্-৪১)

বিস্ময়ের ধাক্কায় স্তব্ধ অনড় হয়ে গেলেন হযরত ওমর। অবাক দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন আল্লাহর রাসূলের দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই তিনি মনে মনে বললেন, এই লোকটি শুধু উচ্চমানের কবিই হননি, সেই সাথে একজন উচ্চ পর্যায়ের গণৎকারও হয়ে গিয়েছেন। তা না হলে তিনি আমার মনের কথা জানলেন কেমন করে? তাঁর মনে এ কথা উদিত হবার সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীবের মুখ থেকে সূরা হাক্কার আয়াত উচ্চারিত করালেন–

وَلاَبِقَوْلِ كَاهِنٍ-قَلِيْلاً مَّاتَذَكَّرُوْنَ-

এটা কোন গণৎকারের কথা নয়, তোমরা খুব কমই চিন্তা-বিবেচনা করে থাকো।

হযরত ওমর বিস্ময়ের দ্বিতীয় ধাক্কা খেলেন। তিনি মনে মনে যা বলছেন, আর তার জবাব রাসুল দিয়ে দিচ্ছেন। বিষয়টি তাঁকে সত্য গ্রহণের পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিল। তাঁর মনে পুনরায় প্রশ্ন জাগলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা পাঠ করছেন, তা কোন কবির কথা নয়, কোন গণৎকারের কথাও নয়। তাহলে তিনি এ কালাম কোথা থেকে লাভ করলেন? তাঁর মনের এ প্রশ্নের উত্তরও রাসূলের মুখ থেকে শোনা গেল– تَنْزِيْلٌ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ–

এটা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা আল-হাক্কাহ্-৪৩)

এই ঘটনা হযরত ওমরের ভেতরটা নাড়া দিয়েছিল এবং এভাবেই আল্লাহর কোরআন সেদিন তাঁর ওপর এক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই কোরআনের স্পর্শে এসে তিনি সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন । হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুসহ এমন অসংখ্য মানুষের এই পরিবর্তন শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছিল পবিত্র কোরআনের প্রভাবের কারণে।

কোরআন বুঝার জন্য সহজ করা হয়েছে

পৃথিবীতে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁকে সেই জাতির মধ্য থেকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। নবী ও রাসূলদের ইতিহাসে কখনো এমনটি দেখা যায়নি যে, নবী এক ভাষায় কথা বলেন আর তিনি যে জাতিকে হেদায়াতের জন্য আগমন করেছেন, সে জাতি ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। এমন যদি হতো তাহলে সে জাতি এই অজুহাত সৃষ্টি করতো যে, এমন একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের হেদায়াতকারী রূপে প্রেরণ করেছেন, যাঁর ভাষার সাথে আমরা পরিচিত নই। জাতি যে ভাষায় কথা বলেছে, তাঁদের জন্য প্রেরিত নবী ও রাসূলও সেই একই ভাষায় কথা বলেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ–

আমি আমার বাণী পৌছানোর জন্য যখনই কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌছিয়েছে, যেন তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ভালোভাবে স্পষ্টরূপে বুঝাতে সক্ষম হয়। (সূরা ইবরাহীম–৪)

নবীজীর পূর্বে এ পৃথিবীতে যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন জাতি ভিত্তিক বা দেশ ভিত্তিক নবী। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন বিশ্বনবী। তিনি সমস্ত যুগের, কালের সমস্ত দেশের তথা গোটা মানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

তাঁর আদর্শ বিশেষ কোন জাতি গোষ্ঠী বা দেশের জন্য নয়–তাঁর আদর্শ গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। রাসূল ছিলেন আরবী ভাষী এবং তিনি যে জনগোষ্ঠীর ভেতরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তারাও ছিলেন আরবী ভাষী। আরবী ভাষাতেই তাঁর কাছে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা মারিয়ামে তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন–

فَانَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَبِهِ قَوْمًا لُّدًّا–

হে রাসূল! এ বাণীকে আমি সহজ করে তোমার ভাষায় এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি মুত্তাকিদেরকে সুসংবাদ দিতে ও সীমালংঘনকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হও।

কোরআনের বক্তব্যে বিন্দুমাত্র দুর্বোধ্যতা নেই। এ কিতাব যা বলে তা অত্যন্ত সহজ সরল ও স্পষ্টভাবে বলে দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ–اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ–

এটা সেই কিতাবের আয়াত, যা নিজের বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। আমি একে কোরআন রূপে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। (সূরা ইউসুফ-১-২)

আরবী ভাষাভাষীদের কাছে অনারব কোন ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হলে তারা কোরআন বিরোধিতার আরেকটি অস্ত্র লাভ করতো এবং সত্য গ্রহণ না করার অজুহাত হিসাবে দাবী করতো, আমাদের বোধগম্য ভাষায় কিতাব নিয়ে এলে আমরা তা বুঝতাম এবং গ্রহণ করতে পারতাম। এ জন্য আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করে এ কথা তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মাতৃভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে–যেন তোমরা কোরআনের শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে পৃথিবীর মানুষদেরকেও এ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত পেশ করতে সক্ষম হও। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ–

হে রাসূল! এভাবে আমি একে আরবী কোরআন বানিয়ে অবতীর্ণ করেছি এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী করেছি। (সূরা ত্বা-হা–১১৩)

এ কিতাব আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলেও এর নিজস্ব কতকগুলো পরিভাষা নির্দিষ্ট রয়েছে। অসংখ্য শব্দকে তার মূল আভিধানিক অর্থ থেকে স্থানান্তরিত করে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনেকগুলো শব্দ তাতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা এমন কোন জটিলতা ও বক্রতা দিয়ে এ কোরআন প্রেরণ করেননি যে, তা অনুধাবন করতে মানুষের অসুবিধা হবে। বরং এ কোরআনে পরিষ্কারভাবে সহজ-সরল কথা উচ্চারিত হয়েছে। প্রতিটি মানুষ অবগত হতে পারে, এ কিতাব কোন কোন মতাদর্শ, মতবাদ, নিয়ম-পদ্ধতিকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা দেয় এবং কেন দেয়। কোন কোন জিনিসকে সঠিক বলে এবং কিসের ভিত্তিতে বলে। মানুষকে এ কিতাব কিসের প্রতি স্বীকৃতি দিতে বলে এবং কিসের প্রতি অস্বীকৃতি দিতে বলে। এ কিতাব কোন কাজের আদেশ দেয় এবং কোন কাজ থেকে মানুষকে বিরত থাকতে বলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ-قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ-

এ কোরআনের ভেতরে আমি মানুষের জন্য নানা ধরনের উপমা পেশ করেছি যেন তারা সাবধান হয়ে যায়, আরবী ভাষার কোরআন–যাতে কোন বক্রতা নেই। যাতে তারা নিকৃষ্ট পরিণাম থেকে রক্ষা পায়। (সূরা যুমার–২৭-২৮)

এ কিতাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এর ভেতরে না বুঝার মতো কোন জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হয়নি। আল্লাহ বলেন–

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ-بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا-فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ

এটা পরম দাতা ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা জিনিস। এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরবী ভাষার কোরআন। সেসব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী, সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী। (সূরা হা-মীম-সাজদাহ–২-৪)

কোন আদর্শ গ্রহণ করার ইচ্ছা না থাকলে তা অস্বীকার করার জন্য অজুহাতের অভাব হয়না। নানা ধরনের দোষ-ত্রুটি, বক্রতা ও অজুহাত প্রদর্শন করতে থাকে এক শ্রেণীর মানুষ। রাসূলের ওপরে তারা ঈমান আনবে না বিধায় তারা বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দাঁড় করাতো। রাসূলকে তো নানা মিথ্যা বিশেষণে বিশেষিত করলো, সেই সাথে তারা এ দাবী করেছিল যে, 'কি অদ্ভুত ব্যাপার ! তিনি নিজে আরবী ভাষী, আর কোরআনও নিয়ে এসেছেন আরবী ভাষায়। তিনি যদি অন্য কোন ভাষায় কোরআন নিয়ে আসতেন, তাহলে বুঝতে পারতাম, তিনি সত্যই আল্লাহর রাসূল। আরবী তাঁর মাতৃভাষা, তিনি সেই ভাষাতেই কোরআন পেশ করছেন, তাহলে এ কথা কি করে বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি এ কোরআন নিজে রচনা করেননি ? কোরআনকে তখনই আল্লাহর বাণী হিসাবে বিশ্বাস করা যেত, যদি তা আরবের বাইরের কোন ভাষায় নিয়ে আসা হতো এবং তিনি তা অনর্গল পাঠ করে আমাদেরকে শুনাতেন।

আসলে এরা কখনো ঈমান আনতো না, এ জন্যই এরা অজুহাত সৃষ্টি করেছে। এদের সামনে যদি অন্য কোন ভাষাতেই কোরআন আসতো, তখন এরা বলতো, এমন কোরআন আমাদের কাছে পেশ করা হলো যে, আমরা তার ভাষাই বুঝি না। আমরা যা বুঝি না, তাই আমাদের সামনে পেশ করে বলা হচ্ছে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আসলে এটা আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি। এদের এসব কথার জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَ اَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ–

আমি যদি একে অনারব কোরআন বানিয়ে প্রেরণ করতাম তাহলে এসব লোক বলতো, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি কেন ? কি আশ্চর্য কথা, অনারব বাণীর শ্রোতা আরবী ভাষাভাষী ! (সূরা হা-মীম-সাজদাহ–৪৪)

আরবী ভাষায় এ কোরআন এ জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, কোরআন আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর ভাষার ব্যাপারেও তখন সেই জনগোষ্ঠী উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিল। এ জন্য তাদের বোধগম্য ভাষায় তা অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যেন তারা এ কিতাব সম্পর্কে গবেষণা করে দেখতে পারে, এ কিতাব কি কোন মানুষের রচনা করা না আল্লাহর বাণী। কোরআনের এসব আয়াত

পাঠ করে অনেকেই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, কোরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তা আরববাসীর জন্যই প্রযোজ্য। আমাদের জন্য তা অনুসরণের কোন প্রয়োজন নেই। এসব যুক্তি হলো খোঁড়া যুক্তি। কোন আদর্শ গ্রহণ করা ও বর্জন করার ক্ষেত্রে ভাষা তার মাধ্যম হতে পারে না। এটাই সর্বসম্মত প্রথাসিদ্ধ নিয়ম যে, একটি আদর্শ বিশেষ কোন একটি ভাষায় তা রচিত হবার পরে প্রথমে সে ভাষাভাষীদের মধ্যে তা প্রচারিত হবে। সেসব লোক তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে সে আদর্শ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে অনুবাদকৃত ভাষায় প্রচার শুরু করবে।

পৃথিবীর সমস্ত আদর্শের ক্ষেত্রে এই নিয়মই অনুসরণ করা হয়েছে। পুঁজিবাদ রচিত হয়েছে ইংরেজী ভাষায়, সমাজতন্ত্র রচিত হয়েছে জার্মান ভাষায়, বর্তমান কালের যাবতীয় নীতি পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক দর্শন রচিত হচ্ছে ইংরেজী ভাষায়। পরে তা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। আল্লাহ্‌র কোরআনও একই নিয়মে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই ধারা চলতে থাকবে। অন্যান্য আদর্শ এই নিয়মে প্রচারিত হওয়ার ও অনুসরণ করার ব্যাপারে যদি কোন আপত্তি উত্থাপন করা না হয়, তাহলে কোরআনের ব্যাপারে কেন আপত্তি উত্থাপন করা হবে? আরবী কোরআন আরব জাতির জন্যই প্রযোজ্য–এ দাবী যারা করে, তারা বিশেষ এক দুরভিসন্ধি গোপন করেই এ ধরনের অমূলক দাবী করে।

তোমাদের কাছে বিশ্বাসী এসেছে

মক্কার কুরাইশদের দাবী ছিল, এই কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়-স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রচনা করেছেন, এর রচয়িতা স্বয়ং তিনি। পক্ষান্তরে কোরআন যে স্বয়ং আল্লাহ্‌র বাণী, এর বাস্তব প্রমাণ ছিলেন স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সেই অবিশ্বাসীদের সামনেই উপস্থিত ছিলেন। নবুয়্যত লাভ করার পূর্বে দীর্ঘ চল্লিশটি বছর তিনি তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। তাদের সম্মুখে তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবনের বিদায় লগ্নে প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছেন।

তাঁর জীবনের সমস্ত কিছুর সম্পর্ক ঐ লোকগুলোর সাথেই বিদ্যমান ছিল, যারা দাবী করছিল, এ কোরআন স্বয়ং তিনি রচনা করেছেন। অথচ তাঁর জীবনের কোন একটি দিকও কোরআন অবিশ্বাসীদের কাছে অস্পষ্ট ছিল না। সুতরাং আল্লাহর রাসুল

ছিলেন অবিশ্বাসীদের কাছে পরীক্ষিত সত্যবাদী ব্যক্তিত্ব। কোরআনের প্রতি সন্দেহ পোষণকারী লোকগুলো জানতো, তিনি নবুয়্যত দাবি করার পূর্বে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে এমন কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ পাননি বা এমন কোন গবেষক-চিন্তাবিদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেননি যে, তিনি তাদের কাছ থেকে কোন নতুন ধরনের জ্ঞান-তথ্য আয়ত্ব করে আজ নবুয়্যত দাবী করে তা প্রয়োগ করছেন।

যিনি কখনো অক্ষর জ্ঞান লাভ করার কোন সুযোগ লাভ করেননি, তাঁর মুখ থেকে কিভাবে হঠাৎ করেই জ্ঞানের সরোবর প্রবাহিত হতে থাকলো। কোরআন যেসব বিষয়বস্তুসহ অবতীর্ণ হচ্ছিলো, সেসব বিষয়ে ইতোপূর্বে মক্কার কোন লোক তাঁকে কোনদিন আলোচনা করতে শুনেনি বা এসব বিষয়ে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল বলেও কেউ প্রমাণ দিতে পারেনি। দীর্ঘ চল্লিশ বছরে তাঁর কোন আপনজন, নিকটাত্মীয়, প্রিয় বন্ধু, স্ত্রী তাঁর কোন কাজে কর্মে, কথাবার্তায়, গতি-বিধিতে এমন কোন পূর্বাভাষ পাননি যে, এই লোকটি হঠাৎ করে নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করতে পারে বা তাঁর মুখ থেকে এমন জ্ঞান গর্ভ কথা বের হতে থাকে, যে কথা পৃথিবীর নানা ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। পবিত্র কোরআন যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা কিতাব, এটাই তো তার বাস্তব প্রমাণ। কারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ক নিজের জীবন কালের কোন এক অধ্যায়েও এমন কোন জিনিস হঠাৎ করে পেশ করতে সক্ষম নয়, যার উন্মেষ ও বিকাশ লাভের সুস্পষ্ট নিদর্শন জীবনের পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে পরিলক্ষিত হয় না।

কালক্রমে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করে, তার জীবনে শুরু থেকেই সে নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মানুষ অনুমান করতে পারে তার ভবিষ্যৎ জীবনে সে কি ধরনের খ্যাতি অর্জন করবে। যেমন একটি শিশু পরিণত বয়সে পৌঁছে কি ধরনের পান্ডিত্য অর্জন করবে, তা তার শৈশব কালে বিদ্যার্জনের প্রতি আকর্ষণ দেখেই অনুমান করা যায়। তেমন কোন নিদর্শন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রে, স্বভাবে, চলাফেরায়, কথাবার্তায় চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বে তাঁর একান্ত আপনজনরাও অনুমান করতে সক্ষম হননি যে, তিনি নবী হচ্ছেন এবং তাঁর মুখ থেকে কোরআন উচ্চারিত হবে। এ কারণেই মক্কার লোকজন ইসলাম বিরোধিতার এক পর্যায়ে অপবাদ উত্থাপন করলো যে, কোরআন মুহাম্মদের রচনা করা নয়, কারণ তাঁর ভেতরে আমরা কোরআন রচনা করার মতো

কোন যোগ্যতা কখনো দেখিনি। বরং এই কোরআন তাঁকে কেউ শিখিয়ে দেয় আর তিনি তা মুখস্থ করে এসে আমাদের সামনে পেশ করে তা আল্লাহর বাণী বলে দাবী করেন। ইসলাম গ্রহণ না করার অজুহাতে হতভাগারা এতটাই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, এই অপবাদ আরোপ করার পূর্বে সামান্য একটি কথা চিন্তা করার অবকাশ তারা পেলো না, শুধু মক্কা ও আরব সাম্রাজ্যই নয়–সারা পৃথিবীতে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন কোন লোকের অস্তিত্ব ছিল না, যিনি কোরআনের মতো সর্ববিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন কিতাব রচনা করতে সক্ষম এবং তা অন্য কোন মানুষকে শিক্ষা দিতে পারেন। আর এই ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন কোন লোকের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকলেও তার পক্ষে তো আত্মগোপন করে থাকা ছিল একেবারে অসম্ভব। সুতরাং কোরআন যে, কোন মানুষের রচনা নয় বরং তা আল্লাহর বাণী–এটাই তো অব্যর্থ প্রমাণ। এ কথা তারা অনুভব করেই পরবর্তীতে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

আরেকটি বিষয় ছিল অলংঘনীয়, আল্লাহর রাসূলের নবুয়্যত পূর্ববর্তী জীবনের অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ। তাঁর দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তেও একান্ত আপনজনও প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ও অসততা বা অন্যান্য নৈতিক কদর্যতার কোন চিহ্ন তাঁর চরিত্রে মুহূর্তের জন্যেও প্রকাশ হতে দেখেনি। গোটা আরব সাম্রাজ্যে তাঁর পরিচিত-অপরিচিত এমন একজন লোককেও অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না, যিনি আল্লাহর রাসূলের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে অশোভন কিছু দেখেছে বলে দাবি করতে পারে। বরং যে কোন লোক তাঁর সংস্পর্শে এলেই তাঁকে সত্যবাদী, আমানতদার, সত্যদর্শী, অতিবিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, দয়ালু, মেহেরবান ইত্যাদি অনুপম গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর মতো সমস্ত দিক দিয়ে মহৎ ব্যক্তি আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পায়নি।

খোদ মক্কার লোকজন-পরবর্তীতে যারা প্রাণের দুশমনে পরিণত হয়েছিল, তারাও তাঁকে এই ব্যক্তি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য' বলে সর্বমহলে প্রচার করেছিল। নবুয়্যত লাভ করার মাত্র পাঁচ বছর পূর্বে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু হলো। তারপর নির্মাণ কাজ ঐ স্থান পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হলো, যে স্থানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তান হযরত ইসমাঈলের সহযোগিতায় কালো পাথর বা হাজ্বরে আস্ওয়াদ স্থাপন করেছিলেন। কথিত আছে, এ পাথর হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম জান্নাত

থেকে এনেছিলেন। এই পাথর স্থাপন করা নিয়ে সমস্ত গোত্রের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হলো। প্রতিটি গোত্রেরই আকাংখা, এই জান্নাতী পাথর স্থাপন করার দুর্লভ সম্মান তারাই অর্জন করবে। এ তর্কবিতর্ক শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হলো যে, প্রতিটি গোত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। পাঁচদিন পরে তাঁরা একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কা'বার প্রঙ্গণে উপস্থিত হলো।

এ সময়ে বনী মখজুম গোত্রের সব থেকে বয়স্ক ব্যক্তি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার ভাই আবু উমাইয়া (এ নামের বিষয়ে মতানৈক্য আছে) উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেলা, হে কুরাইশগণ! তোমরা এই একটা বিষয়ে এ ধরণের ঝগড়া না করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হও যে, কাল সকালে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কা'বার দরোজা দিয়ে প্রবেশ করবে, তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন তোমরা তা সবাই গ্রহণ করবে। বয়স্ক ব্যক্তির এ কথা সবাই গ্রহণ করলো। সেদিনের মত তাঁরা বিদায় নিল এবং পরদিন তাঁরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে, তাদের আল আমীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'বায় প্রবেশ করছে। সমবেত জনতা আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, 'হাযাল আমীন রাদিনা, হাযা মুহাম্মাদ! আতা কুমুল আমীন! অর্থাৎ এ তো আমীন। আমাদের অমত নেই, তোমাদের কাছে আমীন এসেছে!

বিষয়টা তাঁরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রকাশ করলো। তিনি জানতে পারলেন, তাকেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। তখন তিনি বললেন, আমাকে তোমরা একটা বড় কাপড় এনে দাও। একজন একটা বড় কাপড় এনে দিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে কাপড়টা বিছিয়ে কাপড়ের ওপরে নিজের হাতে পাথরটা রাখলেন। তারপর তিনি সমস্ত গোত্র প্রধানদেরকে বললেন, আপনারা সবাই এই পাথরসহ কাপড় ধরে ওঠাতে থাকুন। তারা সবাই কাপড়ের বিভিন্ন অংশ ধরে উঁচু করতে থাকলো। যে স্থানে পাথর স্থাপন করার সিদ্ধান্ত সে পর্যন্ত কাপড় পৌছলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাপড় থেকে পাথর উঠিয়ে যথাস্থানে তা স্থাপন করলেন। এভাবে তাঁকে নবী ও রাসূল নির্বাচিত করার পূর্বেই মক্কার কুরাইশদেরকে দিয়ে তাঁকে একজন 'বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি' হিসাবে স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলেন।

সুতরাং, যে মানুষটি নিজের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কোন ব্যাপারেও কখনো অসততা, প্রতারণা, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেননি, সেই তিনিই হঠাৎ করে এতবড় একটা মিথ্যা ও প্রতারণামূলক দাবীসহকারে দন্ডায়মান হবেন,

নিজের রচনা করা অথবা কারো শিখানো কল্পিত জিনিসকে পূর্ণ শক্তিতে ও প্রবলভাবে, দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর নামে প্রচারিত করবেন, এই ধারণা বা অবকাশই কিভাবে থাকতে পারে? সুতরাং পারিপার্শ্বিকতা ও বাস্তবতাই প্রমাণ করে দেয় যে, কোরআন মহান আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাব।

তিনি স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন। তিনি যদি অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হতেন, কিছু লিখতে ও পড়তে সক্ষম হতেন, তাহলে ধারণা করা যেত যে, তিনি নিজে হয়ত কিছু রচনা করতে পারেন। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَّلاَ تَخُطُّهْ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ-

(হে রাসূল) ইতোপূর্বে তুমি কোন কিতাব পড়তে না এবং স্বহস্তে লিখতেও না, যদি এমনটি হতো, তাহলে অবিশ্বাসীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারতো। (আনকাবূত)

আল্লাহর রাসূলের স্বদেশবাসী, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুমহল, পরিচিতজন–যাদের মধ্যে তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর অতিবাহিত করলেন, তারা সবাই এ কথা অত্যন্ত ভালোভাবে অবগত ছিল যে, লোকটি লিখতে জানে না, পড়তে জানে না, জীবনে কোনদিন কোন কিতাব পাঠ করেনি।

অথচ এমন এক ব্যক্তির মুখ থেকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সত্য ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অকল্পনীয় তথ্যাবলী, মানব জীবন বিধানের পরিপূর্ণ দিকসমূহ; ধর্মবিশ্বাসের মূলনীতিসমূহ উচ্চারিত হচ্ছে, তা কোন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে আল্লাহর ওহী ব্যতীত প্রকাশ পেতে পারে না। যদি তিনি অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হতেন, মানুষ যদি তাঁকে কখনো লিখতে-পড়তে এবং অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে দেখতো, তাহলে অবিশ্বাসীদের এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ থাকতো যে, এসব জ্ঞান ওহীর ভিত্তিতে নয় বরং জাগতিক মেধা নিয়োগ করে অর্জন করা হয়েছে–এসব জ্ঞান সাধনালব্ধ জ্ঞান।

পক্ষান্তরে তাঁর নিরক্ষরতা তাঁর সম্পর্কে এসব বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করার কোন অবকাশই রাখেনি। সুতরাং, একজন নিরক্ষর মানুষকে 'কোরআনের রচয়িতা' বলে অপবাদ দিয়ে ঈমান আনা থেকে বিরত থাকা, আর ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

একজন সম্পূর্ণ নিরক্ষর মানুষের পক্ষে পবিত্র কোরআনের মতো একটি অতুলনীয় কিতাব মানুষের সামনে পেশ করা এবং এমনসব অভূতপূর্ব বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রদর্শন করা, যেগুলোর জন্য বহু পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার কোন উদ্যোগ কারো দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি, এসব বিষয় তো অটল বাস্তবতা।

এই বাস্তবতাই প্রমাণ করে দেয় যে, তিনি সত্য নবী এবং কোরআন তাঁর ওপরে আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাব। সারা পৃথিবীতে যারা খ্যাতি অর্জন করেছে, তাদের কারো জীবনী পাঠ করলেই এসব উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় যে, তার ব্যক্তিত্ব গঠনে ও স্ফুরণে এবং তার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশের জন্য তাকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে পরিবেশ সক্রিয় ছিল। তার পরিবেশ ও তার ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানসমূহের ভেতরে একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়।

পক্ষান্তরে নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব গঠনের উপদানের সাথে কোন ধরনের ন্যূনতম সম্পর্ক থাকতে পারে, এমন সব উপাদান সে যুগে গোটা পৃথিবীতে কোথাও অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না। এই অটল বাস্তবতার ভিত্তিতেই এ কথার স্বীকৃতি দিতে বিশ্বের চিন্তাবিদগণ বাধ্য হয়েছেন যে, বিশ্বনবীর সত্তা শুধুমাত্র একটি নিদর্শনের নয়–বরং তা অসংখ্য নিদর্শনের সামষ্টিকরূপ।

কোরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে মানুষ পশুসুলভ জীবন-যাপন করতে পারে না। মানুষের জন্য প্রয়োজন হয় তার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালনার রীতিনীতি। জীবনের এসব দিক পরিচালিত করার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া হয় বিশেষ কোন চিন্তাদর্শ বা মতবাদকে। যে মতাদর্শকে মানুষ অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সে মতবাদ ত্রুটিপূর্ণ হলে মানুষ নিশ্চিত ধ্বংস গহ্বরের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে থাকে। মানুষের গোটা জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি তিরোহিত হয়। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই মানুষের জন্য নির্দিষ্ট একটি আদর্শের প্রয়োজন হয়। মানুষ যে কোন কাজের মুখোমুখি হলেই তার সামনে প্রথম যে সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তাহলো সে কোন নিয়মে তার সামনে উপস্থিত কর্মটি সম্পাদন করবে। কে তাকে নিয়ম পদ্ধতি শিখিয়ে দেবে। এ থেকে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই নিয়মের মুখাপেক্ষী। এখন এই নিয়ম বা আদর্শ কে রচনা করবে অথবা কে এই আদর্শ দান করবে–এই প্রশ্ন মানুষের সামনে

এসে উপস্থিত হয়। প্রথম মানব হযরত আদমকে যখন এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হলো, তখন তাঁর মনে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তিনি কোন আদর্শ অনুসরণ করে এই পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবেন। বিষয়টি তাঁকে অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। তাঁর এই সমস্যার সমাধান আল্লাহ তা'য়ালা দিয়ে দিলেন–

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ–

আমার পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছবে, যারা আমার সেই বিধান অনুসরণ করবে, তাদের জন্য ভয়ভীতি এবং চিন্তার কোন কারণ অবশিষ্ট থাকবে না। (সূরা বাকারা-৩৮)

আল্লাহ তা'য়ালার এ কথা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষের জন্য যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি ও আদর্শ বা জীবন পরিচালনার জন্য যে বিধান প্রয়োজন, তা তিনিই দান করবেন। মানব জীবনের এ জটিল বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালা কোন মানুষের হাতে সোপর্দ করেননি, স্বয়ং তিনিই এ বিষয়টি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। প্রশ্ন আসতে পারে মানুষের জীবন বিধান দেয়ার বিষয়টি কেন তিনি নিজের এখ্‌তিয়ারে রাখলেন এবং এ দায়িত্ব স্বয়ং মানুষের ওপরে অর্পণ করলেন না কেন?

এর জবাব হচ্ছে, মানুষ নিজেকে যতই বুদ্ধিমান, যোগ্যতা সম্পন্ন ও যাবতীয় জ্ঞানের অধিকারী বলে ধারণা করুক না কেন–প্রকৃত পক্ষে মানুষ চরম অসহায়, অক্ষম এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। মানুষের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে পূঁজি করে মানুষের পক্ষে ভারসাম্যমূলক ও ইনসাফপূর্ণ কোন জীবন বিধান রচনা করা সম্ভব নয় বিধায় স্বয়ং আল্লাহ এ দায়িত্ব কোন মানুষের ওপর অর্পণ না করে নিজের এখ্‌তিয়ারে রেখেছেন। কেননা, এ পৃথিবীতে অসংখ্য বাঁকা পথের অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক নিয়ম-নীতি ও আদর্শের অস্তিত্ব রয়েছে। যা অনুসরণ করলে মানুষ নিশ্চিত ধ্বংস গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। মানুষ যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংসের অতল তলদেশে তলিয়ে না যায়, এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ–

আর আল্লাহরই দায়িত্বে রয়েছে সকল পথপ্রদর্শন, যখন বাঁকা চোরা পথও অনেক রয়েছে। (সূরা নাহ্‌ল)

পথপ্রদর্শনের এই দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা কোন নবী-রাসূলের ওপরেও অর্পণ করেননি। তিনি নবী ও রাসূল প্রেরণ করে তাঁদেরকে যে পথ ও আদর্শের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে নির্দেশ দান করেছেন, তাঁরা তাঁদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব সর্বশক্তি নিয়োগ করে পালন করেছেন। সর্বশেষ এ দায়িত্ব পালন করেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর ওপরে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে এ কোরআনকে মানব জাতির জন্য জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করেছেন। এক কথায় মানব জাতির জীবন বিধান হিসাবে এই কোরআনকে অবতীর্ণ করে বলা হয়েছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ-اتَّبِعُوْا مَاأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ-

এটা একটি কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। তোমার হৃদয়ে এর জন্য যেন কোন ধরনের কুণ্ঠা না জাগে। এটা অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্যে এই যে, এর মাধ্যমে তুমি (অমান্যকারীদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করবে এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটা হবে স্মরণ ও স্মারক। (হে মানবমন্ডলী) তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা-ই অনুসরণ করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোন পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ ও অনুগমন করো না। (সূরা আল-আ'রাফ–২-৩)

অর্থাৎ কোরআন যাঁর ওপরে অবতীর্ণ করা হলো, তাঁকে এটা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হলো, এটা মানব জাতির জীবন বিধান এবং উদ্দেশ্যেই এটা অবতীর্ণ করা হয়েছে। কোন ধরনের ভীতি ও কুণ্ঠা ব্যতীতই এই বিধান প্রচার ও প্রসার করতে থাকো। যারা এটা অস্বীকার করবে, তারা তোমার সাথে কি ধরনের ব্যবহার করবে, এ চিন্তা কারার কোন প্রয়োজন নেই। এটা অবতীর্ণ করার কারণ হলো, ভীতি প্রদর্শন করা। অর্থাৎ রাসূল যেদিকে মানবজাতিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, সে আহ্বানকে উপেক্ষা করার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া এবং অচেতন ও উদাসীন লোকদেরকে সচকিত ও সতর্ক করা। আর অবিশ্বাসীদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন বিশ্বাসীগণ স্বাভাবিকভাবেই অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করেন।

অমানিশার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল মানব জাতি। এই অন্ধকার থেকে মানব মন্ডলীকে আলোর দিকে আনার লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে রাসূল প্রেরণ

করে তাঁকে কিতাব দান করেছেন এবং কিতাব কেন অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছে–

كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ–

(হে রাসূল !) এটা একটি কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মানুষদেরকে অমানিশার নিচ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসো।

অর্থাৎ মানুষকে বাঁকাচোরা, ক্ষতিকর, শয়তানি পথ থেকে কল্যাণের পথের দিকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। মানুষ জানে না তাঁর প্রকৃত মালিক কে। কে তার প্রতিপালক। কোন শক্তির দাসত্ব তাকে করতে হবে এবং কেন করতে হবে। কার আইন-কানুন সে পৃথিবীতে অনুসরণ করবে এবং কেন করবে। এসব বিষয় পরিপূর্ণরূপে অবগত করানোর লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ–

প্রকৃত পক্ষে এটা (কোরআন) একটি পয়গাম সমস্ত মানুষের জন্য আর এটা প্রেরণ করা হয়েছে এ জন্য যে, এই কিতাবের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হবে এবং তারা এ কথা অবগত হবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ শুধু একজন আর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে সচেতন হবে। (সূরা ইবরাহীম–৫২)

মানুষ কার দাসত্ব করবে এবং কে মানুষের জন্য জীবন বিধান রচনা করে দেবে, এ বিষয় নিয়ে মানুষের ভেতরে চরম মতপার্থক্য অতীতে যেমন চলেছে, বর্তমান কালেও চলছে। এক শ্রেণীর মানুষ নিজের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত আইন-কানুন মানব গোষ্ঠীকে অনুসরণ করার কথা বলছে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে কিছু সংখ্যক মানুষ আল্লাহর দেয়া বিধানের বিপরীত আইন-কানুন দিয়ে দেশ ও জাতিকে পরিচালিত করছে। আইন প্রণয়নের অধিকার কে সংরক্ষণ করেন এবং কেন করেন, এ বিতর্কের সমাধানের লক্ষ্যেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ কথা সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছে যে, আইন রচনা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা সংরক্ষণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ-وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-

আমি তোমার প্রতি এ কিতাব এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি এ মতভেদের তাৎপর্য এদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরো। যার মধ্যে এরা ডুবে রয়েছে। এ কিতাব পথনির্দেশ ও রহমত হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের জন্য যারা একে মেনে নেবে। (সূরা আন্ নাহ্ল-৬৪)

কল্পনা, ভাব-বিলাস, অন্ধানুকরণ ও কুসংস্কারের এবং জড়বাদ আর বস্তুবাদের ভিত্তিতে যে অসংখ্য মতবাদ, ধর্মমত রচনা করা হয়েছে এবং মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়েছে, এসবের অবসান কল্পে একটি মহাসত্যের স্থায়ী বুনিয়াদের ওপরে যেন মানব গোষ্ঠী দাঁড়াতে সক্ষম হয়, এ জন্য এই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। যারা এ কোরআনকে স্বীকৃতি দিয়ে অনুসরণ করবে এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে, এ কিতাব জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও ক্ষেত্রে তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে। একে অনুসরণ করে চলার কারণে তাদের ওপরে মহান আল্লাহ রহমত অবতীর্ণ করবেন। এই কোরআন তাদেরকে এ সুসংবাদ প্রদান করে যে, আদালতে আখিরাতে তারা সফলতা অর্জন করবে। আর যারা এ কিতাব অনুসরণ করবে না, তারা সমস্ত দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এ কিতাব আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকে সুসংবাদ ও রহমতের সংবাদ এবং সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত স্পষ্ট জ্ঞান দেয়ার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ-

আমি এ কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যা সব জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে এবং যা সঠিক পথনির্দেশনা, রহমত ও সুসংবাদ বহন করে তাদের জন্য যারা আনুগত্যের মস্তক নত করে দিয়েছে। (সূরা আন্ নাহ্ল-৮৯)

অজ্ঞ, নির্বোধ, অসচেতন, উদাসীন, অমনোযোগী, অসতর্ক, বিদ্রোহী মানুষদেরকে সজাগ সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে এ কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন– وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا

আমি এ কোরআনে নানাভাবে মানুষদেরকে বুঝিয়েছি যেন তারা সজাগ হয়।

এই কোরআনে এমন কোন কথা নেই যা বুঝতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আবার সত্য ও ন্যায়ের সরল রেখা থেকে বিচ্যুত হতে পারে এমন কোন কথাও এ কোরআনে নেই। এ কোরআন স্পষ্ট এবং সোজা কথা বলার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা কাহ্ফ-এ বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا–

প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এর মধ্যে কোন বক্রতা রাখেননি। একেবারে সোজা কথা বলার কিতাব।

যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করে তাদের জন্য সুসংবাদ এবং যারা মানুষের বানানো বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে, তাদের ঘৃণ্য পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করার লক্ষ্যে এ কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَبِهٖ قَوْمًا لُّدًّا–

(হে রাসূল !) এই বাণীকে আমি সহজ করে তোমার ভাষায় এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পারো এবং হঠকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারো।

রাসূল এবং তাঁর অনুসরণকারীদের ওপরে এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি যে, যারা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়–তাদের ওপরে শক্তি প্রয়োগ করে তা অনুসরণ করাতে হবে। যারা ঈমান আনবে না, শক্তির মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করাতে হবে। এ দায়িত্ব রাসূলের বা তাঁর অনুসারীদের নয়। কোন অসাধ্য সাধন করার জন্য রাসূলকে প্রেরণ করা হয়নি অথবা এমন কোন দায়িত্ব তাঁর ওপরে অর্পণ করে তাঁকে বিপদগ্রস্ত করা হয়নি। যারা ঈমান আনতে আগ্রহী নয়, ইসলামী আন্দোলন যারা জেনে বুঝে পছন্দ করে না, তাদেরকে সত্য পথে নিয়ে আসার জন্য অযথা সময় নষ্ট করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা কারো ওপরে অর্পণ করেননি। আবার এ কোরআন এ জন্যও প্রেরণ করেননি যে, এই কিতাব যাঁর ওপরে অবতীর্ণ করা হলো তিনি এবং এ কিতাবের অনুসারীগণ পৃথিবীতে অবহেলিত ও লাঞ্ছনাময় জীবন-যাপন করবে। সূরা ত্বাহা-য় আল্লাহ বলেন–

طٰهٰ–مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى–

আমি এ কোরআন তোমার প্রতি এ জন্য অবতীর্ণ করিনি যে, তুমি লাঞ্ছিত থাকবে।

ভুল করা মানুষের স্বভাব–মানুষ ভুল করবেই। সে ভুল করে ভ্রান্ত পথ ও মত অনুসরণ করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আবার অসচেতনতার কারণে মানুষ ধ্বংস গহ্বরের দিকে এগিয়ে যায়। মানুষের এ অবস্থা থেকে তাকে সচেতন করার লক্ষ্যে এ কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَكَذَالِكَ اَنْزَلْنَهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْيُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا–

(আর হে রাসূল !) এভাবে আমি একে আরবী কোরআন বানিয়ে অবতীর্ণ করেছি এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী করেছি হয়তো এরা বক্রতা থেকে নিরাপদ থাকবে এবং তাদের মধ্যে সচেতনতার নিদর্শন দেখা দেবে। (ত্বাহা-১১৩)

মানুষকে সতর্ক করা এবং সৎপথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ–اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ–بَلْ هُوَالْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًامَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍمِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ–

এ কিতাবটি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। এরা কি বলে, এ ব্যক্তি নিজেই এটি রচনা করে নিয়েছে ? না, বরং এটি সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন একটি জাতিকে যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি, হয়তো তারা নিজেদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবে। (সূরা সাজ্‌দাহ-২-৩)

যারা আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে; পরকালীন জীবনকে যারা খেল তামাসার বিষয় বলে মনে করে; আল্লাহর ফেরেশ্‌তা, জান্নাত-জাহান্নম ও আদালতে আখিরাতে হিসাব গ্রহণের বিষয়কে যারা রূপকথার গল্প এবং কবিদের কল্পনা বলে হেসে উড়িয়ে দেয়, তাদের এসব ধারণা খন্ডন করে মহাসত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোরআনকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ ط اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ

مُّبِيْنٌ-لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ -

আমি (নবী)-কে কাব্য কথা শিক্ষা দেইনি এবং কাব্য চর্চা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। এ তো একটি উপদেশ এবং পরিষ্কার পঠনযোগ্য কিতাব, যাতে সে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে এবং অস্বীকারকারীদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (সূরা ইয়াছিন)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করে তাঁর সামনে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু একত্রিত করে সেসব বস্তু নিচয়ের নামসমূহ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর সেসব বস্তুর নাম ফেরেশ্তাদেরকে বলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করে আল্লাহকে বলেছিলেন-

قَالُوْا سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَا-

সমস্ত দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত একমাত্র আপনিই, আমরা তো শুধু ততটুকুই অবগত আছি যতটুকু আপনি আমাদের অবগত করেছেন। (সূরা বাকারা-৩২)

কিন্তু আল্লাহর প্রথম নবী হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ঠিকই সমস্ত বস্তুর নাম ও তার গুণাগুণসহ বর্ণনা করেছিলেন। বিষয়টি কেমন ছিল তা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যাক। ধরা যাক, সে সময় ফেরেশতার সংখ্যা ছিল পাঁচ শত কোটি। তাদের শরীরের আয়তন যদি বর্তমান মানুষের শরীরের আয়তনের মত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের সহজভাবে বসার জন্য যদি একবর্গ গজ করে স্থানেরও প্রয়োজন হতো, তবে তাদের বসার জন্য পাঁচশত কোটি বর্গ গজ স্থানের প্রয়োজন হতো। অর্থাৎ ফেরেশতাদের বসার জন্য প্রায় দশলক্ষ একরেরও বেশী জমির প্রয়োজন হতো। তার মানে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির মত বিরাট একটি মাঠের প্রয়োজন হতো। আমরা পৃথিবীতে যদি এই ধরনের কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করি, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? প্রথমে সাহারা মরুভূমিতে বিরাট একটি মঞ্চ প্রস্তুত করতে হবে। তারপর তার ভেতরে বিশাল আকৃতির একটি গ্যালারী প্রস্তুত করতে হবে। এরপর সেই গ্যালারীতে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর অংশ সাজিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সেখানে উপস্থিত করে যদি প্রশ্ন করা হয়, কে পারবে এই সমস্ত বস্তুর নাম গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বলতে। তাহলে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে কল্পনা করা যায়?

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে সমস্ত বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁরা তা বলতে পারেনি এবং আদম আলায়হিস্ সালাম সেসব

বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বলেছিলেন। এ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি, এই ধরনের একটি বিশাল কিছুর আয়োজন মহান আল্লাহ তাঁর কুদরতি ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করেছিলেন। এবার ধারণা করা যাক, পৃথিবীতে যদি এই ধরনের কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তাহলে তার নাম কি দেয়া হবে? ধরে নেয়া যাক, পদার্থ বিজ্ঞান মেলা বা মহাপদার্থ বিজ্ঞান মেলা একটা কিছু নাম দেয়া হলো।

এখন কোন মানুষকে যদি সেখানের সমস্ত বস্তুর নাম, ব্যবহার পদ্ধতি ও গুণাগুণ বলতে বলা হয়, কোন মানুষ তা বলতে পারবে? মানুষের ব্যবস্থায় এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতের কাছে এটা কোন বিষয়ই নয়। তিনি তা মুহূর্তের ভেতরেই সম্পন্ন করেছিলেন। আবার মনে করা যাক, মানুষের পক্ষে এমন একটি বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হলো। তারপর সেখানে কোন মানুষকে যদি প্রশ্ন করা হয়, এ সমস্ত জিনিষের নাম, ব্যবহার পদ্ধতি ও গুণাগুণ বর্ণনা করতে হবে। কোন মানুষের পক্ষে কি তা বর্ণনা করা সম্ভব? পদার্থ বিজ্ঞানে যারা একাধিক নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন, তারাও কি বলতে পারবেন? কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তা পেরেছিলেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আদমকে যদি আমরা বলি, বস্তু বিজ্ঞানী, প্রাণী বিজ্ঞানী, রসায়ন বিজ্ঞানী পদার্থ বিজ্ঞানী এক কথায় সমস্ত বিষয়ে তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন, তাহলে কি তা ভুল হবে? সে বিজ্ঞানীর শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রথম ছাত্র ছিলেন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এবং আল্লাহ্ তায়ালা হলেন তাঁর শিক্ষক। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁকে বিজ্ঞান শিক্ষা দান করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। সৃষ্টির শুরুতেই বিজ্ঞান, সৃষ্টির প্রথম মানুষ একজন বিজ্ঞানী। কি ধরনের বিজ্ঞানী তা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। হযরত আদম নবী ছিলেন, রাসূল ছিলেন, পৃথিবীতে আসার পূর্বে তাঁকে নবুয়্যত দান করা হয়েছিল না পরে দান করা হয়েছিল, সাপ ময়ূরের অস্তিত্ব সেখানে ছিল কিনা, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ গবেষণা করেন, বিতর্ক করেন। কিন্তু আফসোস, তিনি যে বিজ্ঞানী ছিলেন, তা নিয়ে গবেষণা করেন না। এ সম্পর্কে গবেষণা তো করেনই না, যারা বিজ্ঞান গবেষণা ও চর্চা করেন তাদেরকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করেন এবং তাদের প্রতি নির্দয় মন্তব্য করেন।

এই পৃথিবীতে আল্লাহ যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন তা সবই মানুষের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য। পৃথিবীর বস্তু নিয়ে মানুষ গবেষণা করে তা মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করবে। এসব বিষয়ে মানুষ যেন চিন্তা-গবেষণা করে সে লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কোরআনে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

كِتَابٌ اَنْزَلْنَهُ اِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِّيَدَّ بَّرُوْا اٰيٰتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَاُولُوا الْاَلْبَابِ–

এটি একটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ কিতাব, যা (হে রাসূল!) আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন এরা তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। (সূরা সা-দ–২৯)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনকে মানব জাতির জন্য বরকতপূর্ণ কিতাব বলেছেন। বরকতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি। এই কিতাবকে বরকতপূর্ণ কিতাব বলার কারণ হলো, এ কিতাব অসংখ্য বাঁকা পথের ভেতর থেকে সত্য-সহজ-সরল পথ কোনটি তা মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে। এ কিতাব যারা সঠিকভাবে অনুসরণ করে, তাদেরকে সারা পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন করে দেয়। মানুষের জীবন থেকে অশান্তির শেষ চিহ্নটুকুও দূরীভূত করে দেয়। মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বোত্তম বিধান দান করে। এ কিতাবে আলোচিত বিষয়সমূহ নিয়ে গবেষণা করে মানুষ চরম উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয়। এ জন্য এ কিতাবকে বরকতপূর্ণ বলা হয়েছে এবং চিন্তা ও গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্য এ কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে।

এই কোরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন একমাত্র আল্লাহর গোলাম হয়ে যায়, তারা যেন তাঁরই গোলামী করে এবং গোলামী যেন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। মানুষ নামাজ, রোজা ও হজ্জ পালনের সময়টুকু আল্লাহর গোলামী করবে, আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে অন্য মানুষের রচিত বিধান অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করবে, এ ধরনের দ্বৈত গোলামী করার অবকাশ ইসলামে নেই। মানুষকে এ উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত করার জন্য পৃথিবীতে কোরআন এসেছে। আল্লাহ বলেন–

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ-

(হে রাসূল!) আমি তোমার কাছে হকসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। তাই তুমি একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো। (সূরা আয যুমার-২)

মূলতঃ মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মহান আল্লাহর দাসত্ব করার লক্ষ্যে। এ পৃথিবীতে যা কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সবই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা হয়েছে আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা কেবলমাত্র রাব্বুল আলামীনের গোলামী করবে। মানুষকে এ অবকাশ দেয়া হয়নি যে, সে আল্লাহর সৃষ্টি যাবতীয় নিয়ামত ভোগ করবে আর জীবন পরিচালিত করবে নিজের অথবা অন্যের খেয়াল-খুশী মতো।

এই বাণী পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে যখন কোরআন অবতীর্ণ করা হয় তখন অবিশ্বাসীরা কোরআনের সত্যতার ব্যাপারে যতগুলো যুক্তি প্রদর্শন করতো, তার ভেতরে এই যুক্তিটি ছিল অত্যন্ত প্রবল যে, তুমি বলছো মানুষকে হেদায়াত করার জন্য আল্লাহ তোমার কাছে কোরআন অবতীর্ণ করে থাকেন। মানুষকে হেদায়াত করার আল্লাহর যদি এতই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কেন কোরআনকে পরিপূর্ণ আকারে একটি গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থবদ্ধ করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন না? এভাবে বিরতি দিয়ে অল্প অল্প করে কেন অবতীর্ণ করছেন? তাহলে আল্লাহকে কি মানুষের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়? অথবা বিরোধিদেরকে যা শুনানো হবে এ সম্পর্কে চিন্তা করে কথা বলতে হয়?

আসলে তুমি যা বলছো, এসব আল্লাহর বাণী মোটেও নয়। যদি এটা আল্লাহর বাণীই হতো, তাহলে তিনি পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ প্রেরণ করতেন। তুমি যেভাবেই সক্ষম হয়ে থাকো না কেন, সময় নিয়ে সাধনা করে স্বয়ং তুমি অথবা তোমার কোন অদৃশ্য সহযোগী এ কোরআন রচনা করে আমাদেরকে শুনাচ্ছো। অবিশ্বাসীদের এসব অবান্তর কথার জবাব এবং সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটানোর জন্য সূরা বনী ইসরাঈলের ১০৬ আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

আর কোরআনকে আমি সামান্য সামান্য করে অবতীর্ণ করেছি। যেন তুমি বিরতি দিয়ে তা মানুষদেরকে শুনিয়ে দাও এবং তাকে আমি (বিভিন্ন সময়) পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছি।

ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী আল্লাহর রাসূলকে অভিযুক্ত করতো যে, স্বয়ং তিনি এ কোরআন রচনা করেছেন। তাদের এ ভিত্তিহীন কথার জবাবও আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আদ দাহারের ২৩ আয়াতে এভাবে দিয়েছেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلاً–

হে নবী! আমিই তোমার প্রতি এ কোরআন অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি।

কোরআনের সত্যতার ব্যাপারে তারা প্রশ্ন তুলে বলতো, যদি এটা আল্লাহর কিতাবই হয়ে থাকে, তাহলে সমগ্র কিতাবটি একই সময়ে কেন অবতীর্ণ হচ্ছে না? নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি চিন্তা-গবেষণা করে অথবা অন্য কারো কাছ থেকে জেনে নিয়ে এবং নানা ধরনের গ্রন্থ থেকে নকল করে এনে আমাদেরকে তা শুনাচ্ছে। আল্লাহ মানুষকে বর্তমান ও ভবিষ্যতে কি বলবেন, তা তো তিনি অবগত আছেন। এটা যদি আল্লাহর বাণী হতো, তাহলে তিনি তা একত্রে অবতীর্ণ করতেন। এই যে চিন্তা-ভাবনা করে বিরতি দিয়ে নতুন নতুন বিষয় আমাদের সামনে পরিবেশন করা হচ্ছে–এটাই হলো বড় প্রমাণ যে এটা আল্লাহর বাণী নয়। তাঁর ওপরে কোন ওহী আসছে না। তিনি স্বয়ং রচনা করছেন অথবা কেউ তাকে সরবরাহ করছে। মূর্খতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত এসব কথার জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً–كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلاً–

অস্বীকারকারীরা বলে, এ ব্যক্তির কাছে সমগ্র কোরআন একত্রে কেন অবতীর্ণ করা হলো না? হ্যাঁ, এমন করা হয়েছে এ জন্য যে, যেন আমি একে ভালোভাবে তোমার মনে গেঁথে দিতে থাকি এবং (এ লক্ষ্যে) একে একটি বিশেষ ক্রমধারানুযায়ী পৃথক পৃথক অংশে সজ্জিত করেছি। (সূরা আল ফুরকান–৩২)

এ কথা মনে রাখতে হবে, নবী ছিলেন স্বয়ং নিরক্ষর। যাদের ভেতরে কোরআন অবতীর্ণ হলো তারাও ছিলেন অক্ষর জ্ঞানহীন জনগোষ্ঠী। নিরক্ষর এই জনগোষ্ঠীকে দিয়েই আল্লাহ পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় বিরাট একটি আদর্শিক বিপ্লব ঘটিয়ে ছিলেন যে বিপ্লবের প্রভাব কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এই নিরক্ষর মানুষগুলোই পৃথিবীর পরিবেশ পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং নেতৃত্ব ছিল তাঁদেরই হাতে। আর কোরআন দিয়ে তাঁরা তা সম্ভব করেছিলেন। সুতরাং নিরক্ষর সেই মানুষগুলোর মাধ্যমে নিকট ভবিষ্যতে যে কিতাব দিয়ে বিপ্লব ঘটানো হবে, সেই

কিতাব একত্রে তাঁদের কাছে প্রেরণ করা হলে, তাঁরা তা স্মৃতির কোষাগারে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হতেন না। স্মৃতির ভান্ডারে আল্লাহর কোরআন যেন হুবহু সংরক্ষিত হয়, এ জন্য তা বিরতি দিয়ে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

বর্তমান যুগের ন্যায় সে যুগে প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের কোন আধুনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বর্তমানের কোন আন্দোলনের দিক নির্দেশনা আন্দোলনের কর্মীদের কাছে লিখিত আকারে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সে যুগে কোন নির্দেশ পৌছানো হতো মৌখিক আকারে। যে লোকগুলোকে বাছাই করে সর্বাত্মক বিপ্লব ঘটানোর উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছিলো, তাদের সামনে একত্রে আদর্শ পেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত ছিল না। এ জন্য পূর্বে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তা অন্তরে ধারণ ও পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করিয়ে এবং আন্দোলনের কর্মীদের তা পালনের অভ্যাসে পরিণত করিয়ে পরবর্তী নির্দেশনামা অবতীর্ণ করা হচ্ছিলো। এ পদ্ধতিকেই বর্তমানে বলা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং তখন তাই অবলম্বন করা হয়েছিল।

যে কোন আদর্শের ওপরে কোন ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করলে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে সময়ের প্রয়োজন হয়। রাতারাতি কোন ব্যক্তির চরিত্রে আমূল পরিবর্তন যেমন ঘটানো যায় না এবং তা কোনক্রমে সম্ভবও নয়। যাঁদেরকে সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে কোরআন দিয়ে গড়া হচ্ছিলো এবং সমগ্র মানব জাতির সর্বকালের শিক্ষক হিসাবে যাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছিল, সেই সাহাবায়ে কেরামও মানুষ ছিলেন। তাঁরা কোন সমাজের ছিলেন এবং সে সমাজ কোন স্তরে অবস্থান করছিল, ইতিহাসের পাঠক মাত্রই তা অবগত রয়েছেন। সেই মানুষগুলোকে পরিপূর্ণভাবে গড়া একদিনে সম্ভব ছিল না একং তাঁরা যেন কোরআনের শিক্ষাসমূহ ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন, এ জন্য অল্প অল্প করে কোরআন অবতীর্ণ করে তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো।

আল্লাহর কোরআন মানুষের রচনা করা শোষণমূলক কোন আদর্শের মতো মানব জাতির ওপরে সমগ্র শক্তিতে একই সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এ কোরআন সর্বপ্রথমে মানুষের চিন্তার জগতে সর্বাত্মক বিপ্লব সংঘটিত করে। আর এ বিপ্লবও একদিনে সংঘটিত হয় না। তা পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে হতে থাকে। কেননা মানুষের চিন্তা-চেতনা নামক জগতের গঠন প্রণালী অত্যন্ত জটিল এবং বিচিত্র ধরনের। শক্তি প্রয়োগ করে মানুষের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসবোধের পরির্তন সাধন করা

কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ জন্য কোরআন যে জীবন পদ্ধতি পেশ করে, তার ওপরে মানুষের মন স্থির করার প্রয়োজন ছিল। এ জন্য নির্দেশ ও বিধানসমূহ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করাটাই ছিল বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি। কোরআন সে পদ্ধতিতেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ পদ্ধতি অবলম্বন না করে যদি সমস্ত আইন-কানুন এবং গোটা জীবন ব্যবস্থা একত্রে মানুষের সামনে পেশ করে তা প্রতিষ্ঠিত করার ও অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হতো, তাহলে মানুষের ভেতরে যেমন বিদ্রোহের প্রবণতা দেখা দিত তেমনি তার চেতনার জগতে বিরাজ করতো এক মহাবিশৃংখলা।

আইন অনুসরণকারীদের জন্য সমস্ত বিধান তার ধারা-উপধারাসহ একত্রে পেশ করলে তা অনুসরণের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখা দেবেই। এ জন্য প্রতিটি আইন উপযুক্ত পরিবেশে ও যথাসময়ে জারি করা প্রয়োজন। এভাবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয় এবং আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা অত্যন্ত সহজ হয় এবং এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্যই পবিত্র কোরআন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নানা পর্যায়ে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

দ্বীনি আন্দোলন কোন ফুল শয্যার নাম নয়, এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়–কন্টকাকীর্ণ। এ আন্দোলন সফল হওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় সীমাও নেই। এই আন্দোলনে যাঁরা জড়িত থাকেন, তাঁদেরকে অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, অকল্পনীয় কোরবানী দিতে হয়। বিরোধী শক্তির সাথে তাঁদেরকে প্রতি পদক্ষেপে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রাণ দান করতে হয়। আন্দোলন সফল হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত এসব পরিস্থিতি শুধুমাত্র একবারই যদি সৃষ্টি হতো, তাহলে নেতা-কর্মীদের মনে সাহস সঞ্চার করার মতো উপদেশ, দৃষ্টান্ত, উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক একটি কিতাব তাদের কাছে পেশ করলেই চলতো। পক্ষান্তরে, এই আন্দোলন করতে গিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যে ধরনের পরিস্থিতি পরিবেশের মোকাবেলা করতে হবে, তা সবই রাসূলের সেই তেইশ বছরে প্রকাশিত হয়েছিল–যে তেইশ বছর তিনি আন্দোলন করেছিলেন। এ জন্য দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী এ কোরআন আল্লাহর নবীর ওপরে অবতীর্ণ হয়েছে।

আন্দোলনের কর্মীগণ যখন বিরোধী পক্ষের সাথে সংঘাতে জড়িত থাকে, তখন তাদের মনে সাহস সঞ্চার করা হয় আন্দোলনের পরিচালকদের পক্ষ থেকে। প্রথম অবস্থায় কর্মীগণ মনে করে সে প্রবল এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মোকাবেলা করছে।

এ অবস্থায় যদি তাদের কাছে মাঝে মাঝে পথনির্দেশ আসতে থাকে তখন তাদের মনে এ ধারণা জাগ্রত থাকে যে, যাঁর নির্দেশে এবং সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সে জীবন বাজি রেখে আন্দোলন করছে, তিনি নীরবে বসে না থেকে তাদের ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তারা যে প্রক্রিয়ায় আন্দোলনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করছেন এবং তাদের সমস্যা ও সংকটে পথ প্রদর্শন করছেন। এ কাজে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে বলে বার বার ঘোষণা দান করছেন এবং তাদের সাথে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক স্থাপন করবেন বলে জানিয়ে দিচ্ছেন। এ প্রক্রিয়ায় আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মনে বিপুল সাহস ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং সংখ্যায় অতি অল্প হলেও তাঁদের শক্তি হয় অপ্রতিরোধ্য। তাঁরা তখন তাঁদের অভিধান থেকে 'পরাজয়' শব্দটি মুছে ফেলে।

রাসূলের সময়ও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল। সাহাবাগণ ময়দানে প্রতিটি মুহূর্তে জিহাদে লিপ্ত থেকেছেন, অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং অবশেষে নিজের প্রাণ পর্যন্ত দান করেছেন। এ সময়ে তাঁদের মন-মানসিকতা যেসব কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ওহীর মাধ্যমে তাই শুনিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফোরকানে বলেছেন, 'কোরআনকে একটি বিশেষ ক্রমধারানুযায়ী পৃথক পৃথক অংশে সজ্জিত করেছি।' কেন এমন করেছেন, সে জবাবও আল্লাহ দিয়েছেন–

وَلَايَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّاجِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا–

আর (এর মধ্যে এ কল্যাণকর উদ্দেশ্যেও রয়েছে যে) যখনই তারা তোমার সামনে কোন অভিনব কথা (অথবা অদ্ভুত ধরনের প্রশ্ন) নিয়ে এসেছে তার সঠিক জবাব যথাসময়ে আমি তোমাকে দিয়েছি এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছি। (সূরা ফোরকান–৩৩)

কোরআন কেন পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে, তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত আরেকটি কারণ স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। এ কিতাব অবতীর্ণ করার কারণ এটা নয় যে, মানব জাতির জন্য জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ রচনা করবেন এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে গ্রন্থ প্রচারের লক্ষ্যে পৃথিবীতে নির্বাচিত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে বিষয় যদি সেটাই হতো, তাহলে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রণয়ন শেষ করেই তা নবীর হাতে উঠিয়ে দেয়ার দাবী যুক্তিযুক্ত হতো। আসলে বিষয়টি সেটা নয়। প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ তা'য়ালা

শিরক, কুফর, মূর্খতা, অজ্ঞতা, অন্যায়, অসত্য ইত্যাদির মোকাবেলায় ঈমান, ইসলাম, আনুগত্য ও আল্লাহভীতির একটি আন্দোলন পরিচালনা করতে চান এবং এ লক্ষ্যেই তিনি মানুষের ভেতর থেকে একজন সর্বোৎকৃষ্ট মানুষকে নির্বাচিত করে তাঁকে নবুয়্যত দিয়ে আন্দোলনের আহ্বায়ক ও নেতা হিসাবে মানুষের সামনে প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূল ও রাসূলের সাথীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন এবং আন্দোলন বিরোধিরা যখনই কোন আপত্তি বা সন্দেহ অথবা জটিলতা সৃষ্টি করবে তখনই তিনি তা দূরীভূত করে দেবেন এবং শত্রুপক্ষ কোন কথার ভুল অর্থ করবে তখনই আল্লাহ তার সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে দেবেন। নবীর দীর্ঘ তেইশ বছরের দ্বীনি আন্দোলনের জীবনে এ ধরনের অসংখ্য বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে আর এসব অবস্থার মোকাবেলার জন্য যেসব ভাষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর সমষ্টির নামই হলো আল কোরআন। কোরআন একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের কিতাবের নাম। আর কোরআন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিও কোরআনের স্বভাব ও প্রকৃতিতে বিদ্যমান। আর সে স্বভাব হলো, কোরআনের আন্দোলনের সূচনা লগ্ন থেকে তার সূচনা করতে হবে। এ আন্দোলন সমাপ্তি পর্যন্ত যেভাবে অগ্রসর হতে থাকবে কোরআনও সাথে সাথে প্রয়োজন অনুসারে দিক নির্দেশনা দিতে থাকবে।

ওহীর সূচনা ও অবতীর্ণ হবার পদ্ধতি

রাসূলের ওপরে ওহীর সূচনা পূর্বে প্রায়ই তিনি নির্জনতা অবলম্বন করতেন। যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে তিনি চিন্তায় অস্থির থাকতেন, এসব সমস্যার সমাধান আল্লাহ তাকে ওহীর মাধ্যমে দান করবেন। সুতরাং ওহী নাজিলের সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্জনতা অবলম্বন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তিনি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে একটা পাহাড়ে চলে যেতেন। সে পর্বতের হেরা নামক গুহায় বিশেষ ইবাদাতে নিমগ্ন হয়ে পড়তেন। এ সময়ে তিনি সত্য এবং সুন্দর স্বপ্ন দেখতেন। তিনি এমন স্বপ্ন দেখতেন তা যেন মনে হত তিনি তা বাস্তবে দেখছেন। পর্বতের গুহায় তিনি ইবাদাতের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। বোখারী শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, হেরা গুহায় তিনি যে ইবাদাত করতেন তা ছিল চিন্তা গবেষণা ও উপদেশ গ্রহণ করা।

তিনি বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যেতেন অথবা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা স্বয়ং গিয়ে দিয়ে আসতেন বা লোক মারফত প্রেরণ করতেন। কোন সময় কয়েকদিনের খাবার তিনি একত্রে নিয়ে যেতেন। হযরত আয়েশা বলেছেন, মহান আল্লাহ যে সময়ে তাকে অনুগ্রহ করে মানব জাতির জন্য নবী নির্বাচিত করলেন তখন তিনি নবুয়্যতের একটা অংশ হিসাবে নির্ভুল স্বপ্ন দেখতেন। এ সময়ে মহান আল্লাহ তাঁকে নির্জন বাসের প্রতি গভীর আগ্রহী করে তোলেন। তখন তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা দিনের আলোর মতই বাস্তবে পরিণত হত। একাকী কোন নির্জন স্থান সে সময়ে তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আরেকটি বর্ণনায় দেখা যায়, নবুয়্যতের সূচনা লগ্নে তিনি বাইরে বের হলেই কোন নির্জন উপত্যকায় বা কোন নির্জন সমভূমিতে চলে যেতেন। সে সময়ে তিনি কোন জড়পদার্থের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেতেন, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ !

এ কথা শোনার সাথে সাথে তিনি চমকে উঠে তাঁর চারদিকে তাকিয়ে সালাম দাতার সন্ধান করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর আশেপাশে গাছ পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না। এভাবেই সময় তখন অতিবাহিত হচ্ছিল। গবেষকদের ধারণা, তিনি যেন ওহী এবং হযরত জিবরাঈলকে ধারণ করতে সক্ষম হন, এ কারণেই নবুয়্যতের পূর্বে কিছুদিন মহান আল্লাহ এ অবস্থা সৃষ্টি করে তাঁর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন। হাদীস শরীফে দেখা যায়, যে সময়ে তিনি নির্জনতা অবলম্বন করতেন তখন তিনি প্রচুর দান করতেন। অভাবীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করতেন। বাড়িতে ফিরে আসার পথে কা'বাঘরে এসে তিনি সাতবার বা ততোধিক বার তাওয়াফ করতেন তারপর বাড়িতে যেতেন। এ সময়ে বিশ্বনবী যে সমস্ত স্বপ্ন দেখতেন তা শুধুমাত্র সে সময়ের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ ধরণের স্বপ্ন নবুয়্যত লাভের পরেও তিনি তাঁর জীবনে বহুবার দেখেছেন। হাদীসে কুদসী নামে যে হাদীসগুলো রয়েছে, তা অনেকই এ পর্যায়ভুক্ত। নবী ও রাসূলগণ যে স্বপ্ন দেখেন তা যে সম্পূর্ণরূপে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ–

বস্তুত আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে প্রকৃতই সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণরূপে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। (সূরা আল ফাত্হ–২৭)

এ ছাড়াও বিশ্বনবীর মনে বিভিন্ন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নানা কথার সৃষ্টি করে দেয়া হত। রমজান মাসে তিনি হেরা গুহায় চলে গেলেন। এরপর সেই মহান রাত

বিশ্বমানবতার সামনে এসে উপস্থিত হলো, যে রাতে নির্ভুল জীবন বিধান বিশ্বনবীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হতে থাকলো। সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এ সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে আমার সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছে ছিল একখন্ড রেশমী কাপড়। সে কাপড়ে কিছু লেখা ছিল। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমাকে বললেন, 'পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম আমি পড়তে পারি না। তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর সে আলিঙ্গন এমন ছিল যে, আমার মনে হলো আমার প্রাণ বায়ু নির্গত হবে। তিনি আমাকে পুনরায় বললেন, 'পড়ুন'। আমি পূর্ববৎ বললাম, আমি পড়তে পারিনা। তিনি সেই আগের মতই আমাকে এমন জোরে জড়িয়ে ধরলেন যে, এবারেও আমার ধারণা হলো আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। আবারও তিনি আমাকে আদেশ করে বললেন, 'পড়ুন'। এবার আমি বললাম, আমি কি পড়বো ? তিনি বললেন–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ-خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ-اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ-الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ-

পড়ুন আপনার রবের নাম সহকারে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের এক পিন্ড হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, আর আপনার রব্ব খুবই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা সে অবগত ছিল না। (আ'লাক)

আল্লাহর রাসূল বলেন, তিনি যা পড়লেন আমিও তাঁকে তা পড়ে পড়ে শোনালাম। তখন তিনি বিদায় নিলেন। তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি জাগ্রত হলাম। তখন আমার উপলব্ধি হলো সমস্ত ঘটনাটি এবং যা আমাকে পড়ানো হয়েছিল তা আমার স্মরণে জাগরুক হয়ে আছে। ঐতিহাসিক এবং গবেষকগণ বলেন, বিশ্বনবীর সাথে বাস্তবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম যে আচরণ করবেন সে আচরণ তাঁর ঘুমের ভেতরে করার অর্থ হলো তা ছিল ঘটিতব্য ঘটনার ভুমিকা। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, এরপর আল্লাহর নবী সে পাহাড়ের গুহা থেকে বের হয়ে এলেন। পাহাড়ের মাঝামাঝি অবস্থানে আসার পরে তিনি তাঁর মাথার ওপর থেকে এক অশ্রুত কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তাকে ডেকে বলা হচ্ছে, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরাঈল!

এ কণ্ঠ শ্রবণ করে তিনি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম একজন অপূর্ব সুন্দর মানুষের আকৃতি ধারণ করে আছেন, কিন্তু তাঁর দুটো পাখা রয়েছে এবং সে পাখা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি পুনরায় বললেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরাঈল। তিনি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। এরপর তিনি আকাশের যেদিকেই দৃষ্টি দিলেন সেদিকেই তাকে দেখতে পেলেন। সমস্ত আকাশ জুড়েই হযরত জিবরাঈলকে আল্লাহর নবী বিরাজ করতে দেখলেন। তিনি অবিচল থেকে সেই দৃশ্য দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখতে থাকলেন এবং অবস্থায় তিনি তাঁর কদম মোবারক কোন দিকেই নড়াতে পারছিলেন না।

তিনি দেখছিলেন তাঁর সন্ধানে তাঁর সহধর্মিনী লোক প্রেরণ করেছে, সে লোক তাঁর সন্ধান করছে কিন্তু তিনি সে লোককে বলতে পারলেন না তাঁর নিজের অবস্থানের কথা। লোকটি ফিরে চলে গেল। এরপর আকাশে আর কোন দৃশ্য দেখলেন না। তিনি ভীত কম্পিত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং হযরত খাদিজাকে বললেন, 'আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও! আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও! হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ভীত কম্পিত অবস্থার অবসান হলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, হে খাদিজা! আমার এ কি হলো! তারপর তিনি সমস্ত ঘটনা তাঁর স্ত্রীকে শুনিয়ে বললেন, আমার নিজের জীবনের ভয় হচ্ছে।

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, অসম্ভব! বরং আপনি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহর শপথ! আপনাকে আল্লাহ্ কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি সব সময় সত্য কথা বলেন এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করেন, তাদের হক আদায় করেন। মানুষের আমানত প্রত্যার্পণ করেন। অসহায় মানুষের বোঝা নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেন। গরীবদেরকে নিজে উপার্জন করে সাহায্য করেন। মেহমানের হক আদায় করেন এবং উত্তম কাজে সহযোগিতা করেন। এভাবেই রাসূলের ওপরে প্রত্যক্ষ ওহীর সূচনা হয়েছিল।

এরপরে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আল্লাহর রাসূলকে সাথে করে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। এ লোক ছিলেন বয়সে বৃদ্ধ ও অন্ধ। তিনি ছিলেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার চাচাত ভাই। তিনি পৌত্তলিকতা সহ্য করতে না পেরে পরবর্তীতে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী এবং

হিব্রু ভাষায় ইনজিল লিখতেন। হযরত খাদিজা তাকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। তিনিও আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করে সমস্ত ঘটনা জেনে নিলেন। সবকিছু শুনে তিনি বলে উঠলেন, এ তো সেই ফেরেশতা যাকে মহান আল্লাহ হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আফসোস! আপনার নবুয়্যত যুগে আমি যদি যুবক থাকতাম ! আফসোস! আপনার জাতি যখন আপনাকে বহিষ্কৃত করবে ! সে সময়ে যদি আমি জীবিত থাকতাম! তাঁর এ সমস্ত কথা শুনে আল্লাহর রাসূল জানতে চাইলেন, আমার জাতি আমাকে বের করে দেবে? ওয়ারাকা ইবনে নওফেল জানালেন, অবশ্যই বের করে দেবে! আপনার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, এ দায়িত্ব যার ওপরেই অর্পিত হবে অথচ তাঁর সাথে শত্রুতা করা হবে না, এমন কখনো হয়নি। সে সময় পর্যন্ত আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবো। গবেষকগণ বলেছেন, সাধারণতঃ বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, তাঁকে নবুয়্যত দান করা হয়েছিল চল্লিশ বছর বয়সে। কিন্তু গবেষণায় প্রমাণ হয়, তাঁর আগমন ঘটেছিল হস্তী বছর রবিউল আউয়াল মাসে। আর তাঁকে নবুয়্যত দান করা হয়েছিল হস্তী বছর হিসেবে রমজান মাসে। এ হিসাবে প্রথম ওহী অবতীর্ণের সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর ছয় মাস।

পবিত্র কোরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে ওহীর মাধ্যমে। মানবীয় মন-মস্তিষ্ক; হৃদয়ের ক্ষেত্র আল্লাহর ওহী ধারণ করার জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। নবী ও রাসূলদের ওপরে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, সেই সাথে আল্লাহ তা'য়ালা ওহী ধারণ করার যোগ্যতা তাঁদের ভেতরে সৃষ্টি করেছেন। তাঁদেরকে সেই শক্তিদান করা হয়েছে, যে শক্তি ওহী ধারণ করার জন্য প্রয়োজন। 'ওহী' আরবী শব্দ, এর অর্থ হলো গোপন ইঙ্গিত। শরিয়তের পরিভাষায় ওহী বলতে বুঝানো হয়, যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের অন্তরে প্রবেশ করানো হয় বা ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়। এ কারণে নবীদের অন্তরে বিশ্বাস এমন দৃঢ় হয় যে, সাধারণ মানুষের থেকে সে বিশ্বাসের মর্যাদা পৃথক। তাঁকে মহান আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে যে বাণী প্রেরণ করা হলো এ সম্পর্কে নবীর অন্তরে সামান্যতম দ্বিধা থাকে না। আরেক কথায় বলা যায়; জ্ঞান বৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমের নাম হলো ওহী যা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তা শুধু মাত্র নবী রাসূলদের জন্য নির্দিষ্ট। এর সম্পর্ক সরাসরি আলমে কুদস্ এবং আলমে গায়েবের সাথে।

ওহী কিভাবে অবতীর্ণ হয় তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। আল্লাহর নবী এ সম্পর্কে বলেছেন, 'কখনো তা আমার কাছে মনে হয় যে, ঘন্টার শব্দ অবিরাম গুঞ্জন সৃষ্টি করছে, আবার কখনো মৌমাছীর গুঞ্জনের ন্যায়, আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে এসে আমাকে শোনায় আমি শুনি আল্লাহ আমার অন্তরে তা সুরক্ষিত করে দেন।' বিশ্বনবীর কথায় ওহী অবতীর্ণের অবস্থাকে যেভাবে উপমার মাধ্যমে বা ফেরেশতার আগমনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে, তা মানুষের বোধশক্তির কাছাকাছি হলেও এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, প্রকৃত অবস্থা মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কোন মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে না।

যতদূর উপলব্ধি করা যায় ওহী অবতীর্ণের সময় প্রকৃত অবস্থা যে কি হয় তা বুঝিয়ে বলা নবীর আয়ত্বের বাইরে। তাই বলে এটা নবীর অক্ষমতাও নয়। যেমন, যে ব্যক্তি সাগরের অতল তলদেশে বিশেষ পোশাক পরিধান করে অবতরণ করে, সেখানে তাঁর প্রকৃত অবস্থা কেমন হয় তা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সে প্রকাশ করে তাদের কাছে, যারা কোনদিন সাগরের তলদেশে অবতরণ করেনি। কিন্তু পানির নিচে সে যে অবস্থা উপলব্ধি করে, তাঁর সে উপলব্ধি বোধটাকে সে আরেকজনের ভেতরে সংক্রমিত করতে পারে না। তেমনি নবীগণ ওহী অবতীর্ণের সময় কেমন অবস্থার সৃষ্টি হয় তা বর্ণনা করতে পারেন কিন্তু তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি বোধটাকে তো আর শ্রোতার মনে প্রবেশ করাতে পারেন না। আল্লাহর রাসূল এ কথাও বলেছেন যে, এবং ওহীর এ অবস্থাটা আমার ওপর ভীষণ কঠিন বোধ হতে থাকে। পুনরায় যখন এই কষ্টকর অবস্থার অবসান ঘটে তখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যা বলা হয়ে থাকে তা আমার মনের মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে যায়। ফেরেশতা যখন মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসেন বা পর্দার আড়াল থেকে মহান আল্লাহর সাথে কথা হয় সে সময়ের অবস্থা হয় খুব সহজ। কিন্তু ওহী অবতীর্ণ করার প্রথম অবস্থা অর্থাৎ ওহী যখন মৌমাছীর গুঞ্জনের মত বা ঘন্টার অবিরাম শব্দের মত আসতে থাকে তখন ভীষণ কষ্ট অনুভব হয়। প্রশ্ন হলো এমন কেন হয়?

এ সম্পর্কে গবেষকগণ ধারণা করেন, মহান আল্লাহ মানুষকে মানুষের আবশ্যকীয় শর্ত ও স্বভাব চরিত্রের সাথে এমনভাবে জড়িত করে দিয়েছেন যে, নবী ও রাসূলদের মত পবিত্র এবং নিষ্পাপ সত্তাও নিজেদের সমস্ত পবিত্রতা থাকার পরেও মানবীয় প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে উপায় থাকে না। এ কারণে তাদের ওপরে যখন

ওহী অবতীর্ণ হয় সে সময়ে তাদেরকে সেই উর্ধ্বজগতের প্রভাব আচ্ছন্ন করে রাখে এবং আল্লাহর নূরের ছায়ায় তাঁরা মহান আল্লাহর কথা গ্রহণ করেন। একদিকে তাঁরা মানবীয় দেহধারী অপরদিকে তাঁরা আল্লাহর নূরের ছায়ায়–এ কারণে তাদের ওপরে উভয় জগতের প্রভাব নিপতিত হয়। সে সময়ে তাদের মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে দমন করে তাঁকে এমন এক জগতের উপযোগী করা হয় যে, তাঁরা যেন ওহী শ্রবণ এবং ধারণ করতে সক্ষম হন।

মানুষ নবীর মানবীয় বৈশিষ্ট্য অবদমিত করে তাকে যখন আল্লাহর নূরের জগতের উপযোগী করা হয় তখন তাঁর ভেতরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেটাই হলো মানুষের চর্ম চোখে অস্থিরতা, নবীর কাছে তখন সেটাই কষ্টানুভব হয়। সেই কষ্টের অবসান যখন হয় তখন নবীকে সেই জগতের যাবতীয় পবিত্রতা আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তিনি তখন অপূর্ব শান্তি অনুভব করেন। যে সময়ের ভেতরে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় সে সময়টুকু হয় ক্ষণস্থায়ী।

ওহী অবতীর্ণের বিশেষ অবস্থায় যখন মানবসুলভ অনুভূতি ও বোধ শক্তির ওপর উর্ধ্বজগতের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, তখন মানবদেহে এক ধরণের অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। সে সময় নবীর শ্রবণ শক্তির সম্পর্ক স্থাপন হয় ওহী শ্রবণের সাথে, তখন তাঁর কাছে এ জড়জগতের কোন শব্দ স্থান পায় না। প্রথম প্রকারের ওহী অবতীর্ণের সময় নবীর যে অবস্থা হত এই অবস্থাকে ইউরোপিয় গবেষকগণ রোগ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেই শিশুকাল হতেই মৃগীরোগী। এ রোগ তাঁর মাঝে মধ্যেই দেখা দিত। তাদের কথা যে কত বড় মিথ্যা তা তারা জেনে বুঝেই শুধুমাত্র ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য লিখেছেন। হযরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বাড়িতে অবস্থানকালে শিশু নবীর যে বক্ষবিদারণ করা হয় তখন থেকে নাকি তাঁর এ রোগের সৃষ্টি। আমাদের বক্তব্য হলো, সে সময়ে আল্লাহ নবীর বয়স ছিল পাঁচ বছর। ঐ পাঁচ বছর বয়সেই শুধুমাত্র একবার সে রোগ দেখা দিল আর মাঝের ৩৫ বছর দেখা দিল না, ঠিক যখন তিনি নবুয়্যত লাভ করলেন ৪০ বছর বয়সে, তখন পুনরায় সে রোগ দেখা দিল, এ সমস্ত প্রশ্ন ইসলাম বিদ্বেষী গবেষকদের মনে জাগেনি কেন? প্রকৃতপক্ষে জেনে বুঝেই, বিশ্বনবীর নবুয়্যতকে অস্বীকার এবং ইসলামকে কোন ঐশী বিধান হিসাবে স্বীকৃতি না দেবার লক্ষ্যেই তাঁরা বিশ্বনবীর ওপরে মৃগী রোগের অপবাদ চাপানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী ও রাসুলদের ওপরে ওহী নাযিল করেছেন ফেরেশ্তার মাধ্যমে। স্বয়ং আল্লাহ কোন নবী বা রাসূলের সাথে দেখা করে ওহী দান করেন না, এটা আল্লাহর নিয়ম নয় এবং কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় তাঁকে দেখা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْمِنْ وَّرَائِ حِجَابٍ اَوْيُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ–

কোন মানুষই এ মর্যাদার অধিকারী নয় যে, আল্লাহ তার সাথে প্রত্যক্ষভাবে কথা বলবেন। তিনি কথা বলেন হয় ওহীর মাধ্যমে, পর্দার আড়াল থেকে অথবা তিনি কোন বার্তাবাহক প্রেরণ করেন এবং সে তাঁর আদেশে তিনি যা চান ওহী হিসেবে দেয়। (সূরা আশ্ শুরা–৫১)

পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার অর্থ হলো, বান্দা শব্দ শুনতে সক্ষম কিন্তু শব্দদাতাকে দেখতে সক্ষম নয়। হযরত মুছার সাথেও এ প্রক্রিয়াতেই আল্লাহ কথা বলেছিলেন। তূর পাহাড়ের পাদদেশ অবস্থিত একটি বৃক্ষ থেকে হঠাৎ তিনি আহ্বান শুনতে পেলেন। কিন্তু যিনি কথা বললেন, তিনি তাঁর দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল দীর্ঘ তেইশ বছর দ্বীনি আন্দোলন পরিচালিত করে সফলতা অর্জন করেছিলেন। এ সময়ে আল্লাহর বিধান সম্পর্কিত কোন কথা নিজের প্রবৃত্তি থেকে তিনি বলেননি। যা বলেছেন তা ওহীর ভিত্তিতেই বলেছেন। সূরা নাজমে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى–اِنْ هُوَاِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى–

তিনি নিজের প্রবৃত্তি থেকে কথা বলেন না, এ তো একটা ওহী–যা তাঁর ওপরে অবতীর্ণ করা হয়।

ময়দানে দ্বীনি আন্দোলন পরিচালিত করার ক্ষেত্রে যখন যে নিদের্শের প্রয়োজন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই ওহীর মাধ্যমে রাসূলের কাছে অবতীর্ণ করা হতো। রাসূলের কাছে যে কোরআন অবতীর্ণ হতো, তার ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসূলই করতেন। এ ক্ষেত্রেও রাসূল তাঁর চিন্তাধারা অনুসারে কোরআনের ব্যাখ্যা করেননি। বরং কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও তিনি ওহীর মাধ্যমেই অবগত হতেন। যদিও রাসূলের ব্যাখ্যার প্রতিটি শব্দ কোরআনের মতো ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণকৃত শব্দ

নয়। কিন্তু তিনি যে জ্ঞান দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা দিতেন, সে জ্ঞানও ওহীর উৎস থেকে লাভ করা জ্ঞান ছিল এবং তা ছিল ওহীর উৎসের ওপরই ভিত্তিশীল। রাসূলের এসব ব্যাখ্যা ও আল্লাহর কোরআনের মধ্যে শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, কোরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ ও বক্তব্য সমস্ত কিছুই হলো আল্লাহর বাণী এবং তিনিই তা প্রেরণ করেছেন। আর রাসুলের কথার মূল ভাবধারা, বক্তব্য ও বিষয় ছিল মহান আল্লাহরই শিখানো। আল্লাহর শিখানো বক্তব্য তিনি নিজের ভাষায় মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন। তাঁর এসব কথা ও বক্তব্য হাদীস নামে পরিচিত। তিনি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কোন কথা যদি বলতেন, তাহলে তাঁর সাথে স্বয়ং আল্লাহ কি ধরনের ব্যবহার করতেন এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা সূরা হাক্কায় বলেন–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ-لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ-ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ-

আমার নবী যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমার নামে চালিয়ে দিত, তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠ শিরা ছিন্ন করে ফেলতাম।

পড়ো তোমার রব-এর নামে

বিশ্বনবীর প্রতি প্রথম যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, তা ছিল–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ-خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ-اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ-الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ-

পড়ো তোমার রব-এর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাটবাঁধা এক রক্তপিন্ড হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়ো, এবং তোমার রব অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের দ্বারা জ্ঞান শিক্ষাদান করেছেন। মানুষকে এমন জ্ঞানদান করেছেন যা সে অবগত ছিল না।

এ সূরার নাম হলো 'আল্ আলাক', পবিত্র কোরআনের ত্রিশ পারার ৯৬ নং সূরা। এই সূরার ১ থেকে ৫ নং আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। এই আয়াতগুলোয় স্পষ্ট করে ঘোষনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে মানুষ হলো সর্বোত্তম সৃষ্টি এবং পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত সৃষ্টি এবং এ কারণে মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা। মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতা এটাই যে, তাঁর আগমনের সূচনা হলো অপবিত্র পানি এবং জমাটবাঁধা রক্ত

থেকে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ যখন তাকে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং সর্ব 'নিম্ন পর্যায়ের' সৃষ্টিকে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তাকে এমন গুণ দান করলেন যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা শ্রেষ্ঠগুণ। তাকে জ্ঞান নামক গুণের প্রকাশ ক্ষেত্র হিসাবে প্রস্তুত করলেন। তাকে কলমের মাধ্যমে লেখা শিক্ষা দান করলেন। সব ধরনের জ্ঞান ও আবিষ্কারের ক্ষমতা দান করলেন। আবার মানুষকে এটাও উপলব্ধি করালেন যে, উপায় ও উপকরণগত ধারায় জ্ঞান অর্জনের তিনটি মাত্র নিয়ম বিদ্যমান।

জ্ঞানার্জনের প্রথম প্রকারের মাধ্যম হলো, অন্তর জগৎ ও মেধার জগতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জন্মগতভাবে যে জ্ঞান প্রদান করা হয়, তা শব্দ, অক্ষর এবং চিত্র বা লেখনীর মুখাপেক্ষী নয়। ইলহামের মাধ্যমেই এভাবে মানুষ জ্ঞানার্জন করে। জ্ঞানার্জনের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো কোন কিছু শুনে মুখে আবৃত্তি করে তা স্মরণে রাখা। জ্ঞানার্জনের এ পথ হলো জিহ্বার মুখাপেক্ষী, অক্ষর ও লেখনীর মুখাপেক্ষী নয়। জ্ঞানার্জনের তৃতীয় মাধ্যম হলো, অক্ষর ও লেখনীর দ্বারা। কিন্তু এটা এমন একটি মাধ্যম যে, এই মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের উল্লেখিত দুটো মাধ্যম ছাড়া এই তৃতীয় মাধ্যমকে জ্ঞানার্জনের একমাত্র মাধ্যম হিসাবে অবলম্বন করা যায় না। এ কারণে বলা হয়েছে, তিনি তোমাদেরকে কলমের মাধ্যমে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। কলমের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে হলে যেমন অন্তর ও মেধার জগৎ প্রসারিত হতে হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় জিহ্বা দ্বারা আবৃত্তি করে তা স্মরণে রাখা।

ফেরেশতা বিশ্বনবীর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, আপনি পড়ুন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমি পড়তে জানিনা। ফেরেশতার কথা এটা ছিল না যে, আমি যা আবৃত্তি করছি, আমার সাথে অনুরূপ আপনিও করুন। এই বচন ভঙ্গী বা কথোপকথন থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় হযরত জিবরাঈল প্রথম ওহীর শব্দগুলো লিখিত আকারে তাঁর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। প্রথম ওহী যে তাঁর সামনে লিখিত আকারে ছিল তা বিশ্বনবীর কথার ভঙ্গীতেও প্রকাশ পায়। তিনি বলেছিলেন, আমি পড়তে জানি না। ওহী লিখিত না হলে তিনি এ কথা বলতেন না। ব্যাপারটা যদি শুধুমাত্র মুখের সাথে সম্পর্কিত হত তাহলে তিনি জিবরাঈলের সাথে সাথে প্রথমেই আবৃত্তি করে যেতেন, কোন আপত্তি উত্থাপন করতেন না। আল্লাহর প্রথম বাণী থেকে এ সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁকে নবুয়্যত দেয়ার পূর্বেই বিশেষ কোন প্রক্রিয়ায় তাঁর জ্ঞানের জগতে এ সত্য প্রবেশ করানো হয়েছিল, একমাত্র আল্লাহই

হলেন রব বা প্রতিপালক। আল্লাহর এই রবুবিয়াত ছিল বিশ্বনবীর কাছে প্রকাশিত। এ কারণেই দেখা যায় তিনি কোনদিন কোন মূর্তির কাছে সামান্য কোন প্রার্থনা করেননি। তিনি জানতেন যে, এই মূর্তিগুলো মানুষের রব নয়, রব্ব হলেন একমাত্র আল্লাহ। এ সত্য তাকে অবগত করানো হয়েছিল বলেই তিনি মূর্তিকে প্রচন্ড ঘৃণা করতেন। তিনি ওহী আসার পূর্বেই একমাত্র আল্লাহকে রব বলে জানতেন এবং তাঁকেই একমাত্র রব হিসাবে মেনে চলতেন।

এই রব কি, এটা তাঁর কাছে পরিচিত ছিল ফলে প্রথম ওহীর ভেতরে নবীকে রব-এর পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হয়নি। সরাসরি তাকে বলা হয়েছিল, আপনি আপনার রব-এর নামে পড়ুন বা বিসমিল্লাহ বলে শুরু করুন। ঐ রব-এর নামেই পড়ুন, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি কাকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন এ কথা তাঁর নবীকে বলা প্রয়োজন হয়নি এ কারণে যে, নবীর জ্ঞানের জগতে এ কথাগুলো পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছিল, দৃষ্টির আড়ালে এবং দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান আলোকিত সমস্ত পৃথিবীটা এবং এর ভেতরে যা কিছু আছে, এ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। জমাটবাঁধা রক্ত যা ইতোপূর্বে ছিল তোমাদের দেহ নির্গত এক ফোটা অপবিত্র পানি। যাকে বিশেষ এক সময়ে জমাটবাঁধা রক্তে পরিণত করা হয়েছে, মাংস পিন্ডে পরিণত করে তার ভেতর অস্থি সংযোজন করে মানুষের আকৃতি দেয়া হয়েছে।

মানুষের প্রথম অবস্থা ছিল এক ফোটা অপবিত্র পানি, সেখান হতে সুন্দর মানুষ সৃষ্টি করে তাকে জ্ঞানের সঞ্জিবনী সূধা ঢেলে জ্ঞানের অলংকারে সজ্জিতকরণ সেই আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের প্রকাশ। তাকে শুধু জ্ঞানই দান করা হয়নি, কলমের মাধ্যমে তাকে এমন এক জ্ঞান দান করা হয়েছে যে, অর্জিত জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তা সংরক্ষণের কৌশল ঐ মহান আল্লাহই তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেছেন। তিনি যদি তোমাদেরকে অলক্ষ্যে থেকে কলমের ব্যবহার শিক্ষাদান না করতেন, তাহলে তোমাদের জ্ঞানের জগতে বন্ধ্যাত্ব নেমে আসতো। তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারতে না। তোমরা ছিলে জ্ঞানহীন অচেতন, কিছুই তোমরা অবগত ছিলে না। তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে যখন তোমাদের নিয়ে আসা হয় সে সময়ে তোমাদের কোন চেতনাই ছিল না। তারপর তোমাদেরকে তিনটি জিনিষ দান করা হয়েছে। চোখ কান এবং মস্তিষ্ক। একটা দিয়ে দেখবে আরেকটা দিয়ে শুনবে এবং মাথা দিয়ে চিন্তা করবে। তোমার চিন্তার

জগতে আমিই আবিষ্কারের সূত্রদান করি। যা তোমার কাছে আবৃত, অজানা-অজ্ঞাত ছিল, তা তোমাকে জানানোর ব্যবস্থা আমি করেছি। তোমরা একটা নতুন কিছু উদ্ভাবন করে এ ধারণা করো যে, এটা তোমারই কৃতিত্ব। প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, আমিই তোমার চিন্তার জগতে আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা এবং সূত্রদান করি। তুমি তোমার জ্ঞান দ্বারা কোন কিছুই করতে পারোনা। যতক্ষণ আমি তোমাকে সহযোগিতা না করি। তোমার এ জ্ঞান নেই, তুমি অনুভব করতে পারো না কিভাবে আমি তোমাকে জ্ঞানদান করি।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রথম বাণীতেই তাঁর রাসূলের ওপর কোন বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দেননি। তাঁর সামনে কাজের বিশাল তালিকাও পেশ করেননি। ওহী সম্পর্কে বিশ্বনবী ছিলেন অনভিজ্ঞ, প্রথম বার এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে ওহী সম্পর্কে অভিজ্ঞ করলেন যেন আগামী বার তিনি ওহী ধারণ করতে পারেন। মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতির জন্যও কিছুদিন তাঁকে সময় প্রদান করা হয়েছিল। প্রথমবার তাঁর পবিত্র স্বভাব প্রকৃতির ওপর যে প্রভাব নিপতিত হয়েছিল, তা যেন সহজ হয়ে যায়, এ কারণেও ওহীর বিরতি দেয়া হয়েছিল। প্রথম অবতীর্ণকৃত বাণীর তাৎপর্য হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুয়্যাত সম্পর্কে অর্থাৎ তিনি যে নবী হবেন এ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগত করা হলো, আপনাকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে, সুতরাং আপনি সাধারণের থেকে ভিন্ন। আপনার জীবন এবং সাধারণ মানুষের জীবনে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান।

একজন রাসূলের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আপনাকে তা পালন করতে হবে। অর্থাৎ নবুয়্যাত সম্পর্কে বিশ্বনবীকে সজাগ করে তোলা হয়েছিল প্রথম ওহী অবতীর্ণ করে। বিশ্বনবীর ওপরে মহান আল্লাহ তাঁর প্রথম ওহীতেই তাঁকে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ময়দানে এগিয়ে দেননি। যে দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে দায়িত্ব সম্পর্কে প্রথম ওহীতে কোন নির্দেশ দান করা হয়নি। দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন তাঁর ওপরে ওহী অবতীর্ণ করা হলো, তখন তাঁর প্রতি নবুয়্যাতের দায়িত্বের সাথে রেসালাতের দায়িত্বও অর্পণ করা হলো। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর ওপর অবতীর্ণ করা হলো পবিত্র কোরআনের ৭৪ নং সূরার প্রাথমিক সাতটি আয়াত। এই সূরার নাম হলো সূরায়ে আল্ মুদ্দাস্সির।

বিশ্বনবীর আরেকটি নামও হলো মুদ্দাস্‌সির। আল্লাহর রাসূলের মুদ্দাস্‌সির নামটি হলো গুণবাচক বা উপাধি বিশেষ। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে দ্বিতীয় বার দেখে তিনি অস্থির হয়ে বাড়িতে এসে শয্যায় শুয়ে তাঁকে কম্বল দিয়ে আবৃত করে দিতে বলেছিলেন। এই সময় তাঁর ওপরে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূলকে আহ্বান করা হলো–

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ-قُمْ فَاَنْذِرْ-وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ-وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ-وَالرُّجْزَفَاهْجُرْ-وَلاَتَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ-وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ-

হে কম্বল আবৃত শয্যা গ্রহণকারী! ওঠো এবং সাবধান করো। এবং তোমার রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশালত্বের ঘোষনা দাও। এবং নিজের পরিধেয় পোষাক পবিত্র রাখো। আর মলিনতা অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে অবস্থান করো। আর অনুগ্রহ করো না অধিক লাভের আকাংখায়। এবং নিজের রব-এর জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলকে এভাবে সম্বোধন করা হলো না, হে মুহাম্মাদ ওঠো! মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বনবীকে আহ্বান করা এখান থেকেই শুরু হয়েছে। গোটা কোরআান পাঠ করলে দেখা যায়, এভাবে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুকে নানা ধরনের মধুর নামেই আহ্বান করেছেন। কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যে ব্যক্তিবাচক দুটো নাম রয়েছে, মুহাম্মাদ এবং আহ্‌মাদ, এ দুটো নামে আল্লাহ তাঁকে কখনো আহ্বান করেননি।

মুহাম্মাদ শব্দটা পবিত্র কোরআানে চারটি সূরায় মোট চারস্থানে উল্লেখ করা হলেও সেটা প্রাসঙ্গিকভাবে, তাঁকে আহ্বান করে নয়। আর আহ্‌মাদ শব্দটা একটি সূরায় মাত্র একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের কথা থেকে, তাঁকে আহ্বান করে নয়। অথচ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর প্রথম মানুষ, প্রথম নবী ও রাসূল, প্রথম বিজ্ঞানী হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করেই তাঁর নাম ধরে আহ্বান করে বলেছিলেন–

يَادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ-

হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী এই জান্নাতের মধ্যে বসবাস করো।' (বাকারা)

মহান আল্লাহ কর্তৃক নবীদেরকে আহবানের এই ধারা অব্যাহত থাকলো হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত। এই পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের সবাইকে মহান আল্লাহ সরাসরি নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। প্রয়োজনের

মুহূর্তে আহ্বান করা হয়েছে, হে আদম, হে নূহ্, হে মুসা, হে ইবরাহীম, হে লূত অর্থাৎ নাম ধরে আহ্বান করা হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন বিশ্বনবী এবং তাঁকে কখনো তাঁর ব্যক্তিবাচক নামে আহ্বান করা হয়নি। তাঁর গুণবাচক নাম বা উপাধি দিয়েছেন আল্লাহ এবং সেই উপাধি ধরে বা গুণবাচক নামেই আল্লাহ তাঁকে আহ্বান করেছেন।

এর কারণ হলো বিশ্বনবীর বিশাল মর্যাদা এবং সম্মান। আল্লাহ্ তাঁকে যে কত সম্মান এবং মর্যাদা প্রদান করেছেন, তাঁকে যে ভাষায় এবং ভঙ্গীতে আহ্বান করা হত, সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে অবাক হতে হয়। কম্বল দিয়ে নিজের শরীর আবৃত করে তিনি শয্যায় শায়িত, তাঁকে কি সুন্দর বিশেষণে-কি মধুর ভঙ্গিতে আহ্বান করা হলো, হে কম্বল গায়ে দেয়া শয্যায় শায়িত ব্যক্তি, ওঠো!

দ্বিতীয় পর্যায়ের ওহী অবতীর্ণ করে তাঁকে বলা হচ্ছে, হে আমার প্রিয় বন্ধু! আপনি এমন করে কম্বলে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন কেন! এভাবে শুয়ে থাকা তো আপনার কাজ নয়। মানুষ পশুস্তরে নেমে গেছে, অসহায় মানুষ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আর্তনাদ করছে, মিথ্যে রব-এর কাছে মানুষ নিজের কামনা বাসনা পেশ করছে, এসব দেখে আপনার মনে যে যন্ত্রণার ঝড় শুরু হতো, সে যন্ত্রণার অবসানের জন্যই আপনি কাজ শুরু করে দিন। আপনার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সে দায়িত্ব পালন করুন। এ জন্য আপনি সংকল্পের দৃঢ়তা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হোন। আপনি মানব এবং জ্বিন জাতিকে আদেশ করুন, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি করা পৃথিবীতে বাস করছো, তাঁর নেয়ামত ভোগ করছো, তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত এক মুহূর্ত জীবিত থাকতে সক্ষম হবেনা। অতএব তাঁরই বিধান অনুসরণ করে তাঁর দাস হয়ে যাও। একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করো, আর কারো দাসত্ব করো না। কেননা, তারা দাসত্ব লাভের উপযোগী নয়। তারা যদি তাদের রব-এর বিধান অনুসরণ না করে, তাহলে তাদেরকে সতর্ক করে দিন, তাদেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদের পরিণাম শুভ হবেনা।

এ কথা মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলার পরেই আদেশ করলেন, আপনি যাকে রব্ব বলে জানেন, তিনিই প্রকৃত রব্ব। আয়াতটিতে 'ওয়া রাব্বাকা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। রব আরবি শব্দ। এই শব্দের অর্থ বড় ব্যাপক। রব শব্দের ব্যাখ্যা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ। এখানে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন, যত আইন-কানুনের প্রয়োজন এ সমস্ত যিনি পূরণ করেন তিনিই হলেন রব।

দুনিয়ায় যত নবী রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের সাথে যাদের সংঘর্ষ বেধেছে, তাঁরা আল্লাহকে স্বীকৃতি দিতো, কিন্তু আল্লাহকে রব হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তি করেছে। ফেরআউন ঘোষনা করেছিল, আমিই তোমাদের বড় রব। সে নিজেকে আল্লাহ হিসাবে ঘোষনা দেয়নি, দিয়েছিল রব হিসাবে। আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে এই রব নিয়েই সত্যপন্থীদের সাথে বাতিল শক্তির সংঘর্ষ চলছে। সত্যপন্থীগণ দাবী করছে, এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ; তিনিই আমাদের রব, তিনিই আমাদের জীবন বিধানদাতা। আর বাতিল শক্তি দাবী করছে, আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করলে করতেও পারেন। কিন্তু আইন-কানুন তৈরী এবং জীবন বিধান তৈরী করবো আমরা, এ ব্যাপারে আমরা স্বাধীন। আমাদের যে আদর্শ, আমাদের যে মতবাদ, সে অনুসারেই দেশ চলবে এবং দেশের মানুষকে তা অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহর নবীগণ তাদের এ কথা যখন গ্রহণ করেননি, তখনই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাদের কারো নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছে, কাউকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়েছে, কাউকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, শুধুমাত্র এই রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষনা করার কারণে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ আদেশ করলেন, 'আপনি শুয়ে থাকবেন না, উঠুন এবং আপনার রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষনা করুন। পৃথিবীতে নিজেদেরকে যারা রব্ব বানিয়ে বসেছে, তাদেরকে সতর্ক করে দিন, তোমরা রব নও। রব হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ। কোন আইন-কানুন বিধান রচনা করার এখতিয়ার তোমাদের নেই। রব সেজে যে গদিতে তোমরা বসে আছো, সে গদি ছেড়ে দাও। আল্লাহর বিধান ঐ গদিতে বসে দেশের বুকে, আল্লাহর বান্দাদের ওপরে আইন জারি করবে। পৃথিবীব্যাপী উচ্চকণ্ঠে ঘোষনা করে দাও, আল্লাহ আমাদের রব এবং আল্লাহর সৃষ্টি এই পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বই চলবে, আল্লাহর রবুবিয়াত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন। এই পৃথিবীতে নবী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে একজন নবীর হলো এটাই সর্বপ্রথম কাজ এবং দায়িত্ব। এই পৃথিবীতে যারা নিজেদেরকে রব বলে ধারণা করছে, মূর্খ মানুষ যে সমস্ত দুর্বল অথর্ব বস্তুকে নিজেদের রব্ব বানিয়েছে, তাদেরকে বলে দাও, রব হলেন একমাত্র আল্লাহ।

রব কি, রব কাকে বলে এবং রব-এর প্রয়োজনীয়তা কি, একমাত্র আল্লাহকে কেন রব হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মক্কী সূরাসমূহ এই রব-এর আলোচনা এবং

রিসালাত ও আখিরাতের আলোচনায় পরিপূর্ণ। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত এ তিন বিষয়ে মক্কী সূরায় বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। বলা হয়েছে, তোমরা যাকে রব হিসাবে পূজা করছো, সেও ঐ আল্লাহর দাস এবং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ঐ আল্লাহরই মুখাপেক্ষী। সুতরাং তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করার কোনই প্রয়োজন নেই, রব্ব হিসাবে গ্রহণ করো তাঁকেই যিনি তোমাদেরকে জমাটবাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন; জ্ঞান দান করেছেন এবং তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন যিনি পূরণ করছেন। তোমাদের সমস্ত কাজে তাকেই রব হিসাবে ঘোষনা করবে, একমাত্র দাসত্ব লাভের যোগ্য বলে বিবেচনা করবে এবং আইনদাতা হিসাবে গ্রহণ করবে।

মহান আল্লাহ প্রথম অবতীর্ণকৃত বাণীতে তাঁর নবীকে আদেশ দিলেন, আমিই যে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র রব–এ কথার ঘোষনা করে দাও। তুমি কোন দ্বিধা করোনা। তোমার রব্ব-এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষনা করো এবং কোন শক্তিকে দেখে ভয় করো না। কেননা, সমস্ত শক্তির শ্রেষ্ঠ শক্তি তোমার সাথে রয়েছে। তোমার রব্ব-এর শক্তির সামনে কোন শক্তিই শ্রেষ্ঠ নয়। তুমি তাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট করে বলে দাও, তুমি যে কাজ শুরু করছো, এ কাজের গতি কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে কোথায় কি কাজ করতে আদেশ করলেন, তা বিশ্লেষণ করলে আমাদের সামনে একটা দিক পরিষ্কার হয়ে যায় যে, গোটা পৃথিবীও যদি সত্যের বাহকের বিরুদ্ধে চলে যায় তবুও সত্যের ঘোষনা দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা যাবে না। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে ঘোষনা দিতে আদেশ করলেন, সেই ঘোষনার বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছিল তদানীন্তন পৃথিবীতে। রাসূল যে সমাজে উপস্থিত ছিলেন সে সমাজ এই ঘোষনা শুনতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

এই ঘোষনা দেয়ার সাথে সাথে রাসূলকে তাঁর আপনজনেরাই যে বন্য হায়েনার মত ঘীরে ধরবে এতেও কোন সন্দেহ ছিল না। যারা রব-এর দাবী নিয়ে সে সমাজে দীর্ঘকাল ব্যাপী নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল, নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করছিল, কা'বাঘরসহ নিজেদের ঘরে ঘরে মূর্তিকে রব বানিয়ে তাদের পূজা অর্চনা করছিল, তারা রাসূলের এ ঘোষনা শুনেই রাসূল একজন সৎ এবং সুন্দর চরিত্রের লোক হবার কারণে তাঁর ঘোষনাকে তারা স্বাগত জানাবে অবস্থা এমন ছিল না। বরং এ ঘোষনা দেয়ার সাথে সাথেই বিপদ মসিবতের পাহাড় নিজের ওপরে আপতিত হবে,

আপন আত্মীয়-স্বজন প্রাণের শত্রুতে পরিণত হবে, তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে, তাঁকে হত্যা করার জন্য সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠবে–এটাই ছিল প্রকৃত পরিস্থিতি।

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কোন কথা ঘোষনা করতে আদেশ করলেন, সে কথার যে কি তাৎপর্য এ কথা উপলব্ধি করার মত জ্ঞান রাসূলকে দেয়া হয়েছিল, রাসূল মহান আল্লাহর আদেশের তাৎপর্য অনুধাবন করবেন, তিনি ভীতিগ্রস্থ হতে পারেন, চিন্তিত হতে পারেন, এ কারণে ঐ আয়াতের মধ্যে রাসূলকে এ কথাও বুঝিয়ে দেয়া হলো, ভয় বা চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা তোমার রব-ই শ্রেষ্ঠ, তোমার রব্ব-এর শ্রেষ্ঠত্বের সামনে অন্য সমস্ত শক্তি ধূলিকণার মতই উড়ে যাবে। তোমার রব রয়েছেন তোমার সাথে, তোমাকে দ্বীনি আন্দোলনের উত্তপ্ত ময়দানে এগিয়ে দিয়ে তোমার রব নীরব থাকবেন না। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন শুরু করে দাও, তোমাকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব আমার।

এই সুক্ষ্ম কথাগুলো আল্লাহর রাসূল উপলব্ধি করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছেন ঐ আয়াতে, তা রাসূল অনুভব করেছিলেন বলেই তিনি তাঁর আন্দোলনের গতি পথে কোন শক্তিকে সামান্যতম গুরুত্ব দেননি। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব রাসূল উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি একাকী গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নিজের পোষাক পবিত্র রাখুন

রাসূলের আদর্শ নিয়ে আজো যারা ময়দানে কাজ করতে অগ্রসর হবেন প্রথমে তাদেরকে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা অর্জন করতে হবে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের চিত্র নিজের মনে অঙ্কন করতে হবে। তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তিকেই আর শক্তি বলে মনে হবে না। এরপরে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বললেন, আপনি নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখুন। বিজ্ঞ তাফসীরকারগণ কোরআনের এই আয়াতের ব্যাপক তাফসীর করেছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত আয়াতের মর্মও বড় ব্যাপক। ছোট একটি কথা দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে একটা অর্থ হলো, পরিধেয় পোষাক পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা।

পোষাক মানুষের মনের ওপরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে এতে কোন সন্দেহ নেই। এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামরিক বাহিনীর বিশেষ পোষাক নির্ধারণ

করা হয়েছে। গবেষকগণ বলেছেন, পোষাক-পরিচ্ছেদের পবিত্রতা এবং আত্মার পবিত্রতা অবিচ্ছিন্ন। একটার সাথে আরেকটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পবিত্র রুচি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় সে পুঁতিগন্ধময় কোন খাদ্য তাঁর মুখ গহ্বর দিয়ে দেহে প্রবেশ করাবে। সুতরাং, কোন পবিত্র আত্মার পক্ষেও সম্ভব নয় সে কোন অপবিত্র দেহের ভেতরে বাস করবে। কোন পবিত্র দেহের পক্ষেও সম্ভব নয় সে নিজেকে অপবিত্র অপরিচ্ছন্ন পোষাকে আবৃত রাখবে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন। তিনি অপবিত্রতা প্রশ্রয় দেননা। এ কারণে তিনি তাঁর রাসূলকে আদেশ করলেন, তোমার পোষাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখবে। মহান আল্লাহ্র এ কথা থেকে এটা ধারণা করার কোন অবকাশ নেই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বোধহয় ইতিপূর্বে অপবিত্র অপরিচ্ছন্ন পোষাকে থাকতেন। পবিত্রতা সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না।

প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন জন্মগতভাবেই পবিত্র। মহান আল্লাহ তাঁকে পবিত্র রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাঁর জ্ঞানের জগতে পবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছিলেন। আরবী 'তাহ্হের বা তাহারাত' শব্দের অর্থ শুধু বাহ্যিক পবিত্রতা নয়। অন্তরের কলুষতা দূর করাকেও বোঝায়। পবিত্রতা বা তাহারাতকে কোরআন যে অর্থে উপস্থাপন করেছে, পৃথিবীর এমন কোন ভাষা নেই যে, সে ভাষার একটি শব্দ তাহারাতের সমার্থক হতে পারে বা পবিত্রতার ব্যাপক ধারণা পেশ করতে পারে।

পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করাও পবিত্রতা এবং পাপের ভেতরে নিজেকে জড়িত করাকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে। কোন অন্যায় কাজ বা মিথ্যা কথা থেকে নিজেকে বিরত রাখার অর্থও হলো পবিত্রতা। মিথ্যা কথা বলা অপবিত্রতা। এভাবে যাবতীয় অন্যায় অনাচার, পাপাচার, অত্যাচার, অপরিচ্ছন্নতা, মিথ্যা, চিন্তার জগতে অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকাকেই পবিত্রতা বলা হয়েছে। দেহ এবং দেহের পোষাক পবিত্র–এটা কোন পবিত্রতাই নয়। চিন্তার জগৎ হতে যাবতীয় অপরিচ্ছন্নতা এবং অপবিত্রতা দূর করতে হবে। অজ্ঞানতা তথা মূর্খতাও এক ধরণের অপবিত্রতা। এ সমস্ত অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকার নামই হলো পবিত্র কোরআনের ভাষায় তাহারাত।

ইসলাম আত্মা এবং দেহের পবিত্রতার দাবী করে। সে সময়ে মানুষ জ্ঞানের দিক থেকে, চিন্তার দিক থেকে, চরিত্রের দিক থেকে; স্বভাবের দিক থেকে, নেতৃত্বের

দিক থেকে, কথার দিক থেকে তথা সর্বস্তরে অপবিত্রতায় নিমজ্জিত ছিল। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আদেশ করলেন, মানব সমাজ থেকে এ সমস্ত অপবিত্রতা দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করো। তুমি এই মহান কাজ করছো, এ জন্য যেন তুমি ধারণা করোনা, তুমি তাদের ওপরে দয়া করছো। বরং এটাই তোমার দায়িত্ব, এই দায়িত্ব দিয়েই তোমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। আবার এ ধারণাও করো না যে, এ কাজ করে তুমি তোমার রব-এর কল্যাণ করছো। বরং তুমি তোমার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করছো। যে দায়িত্ব তুমি পালন করছো এ কাজ সহজ নয়। তুমি তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে বাধাগ্রস্থ হবে। তোমার সাথে অহেতুক শত্রুতা করা হবে। তোমাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়া হবে; হত্যা করার প্রচেষ্টা করা হবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তোমার বিরুদ্ধে চলে যাবে। তুমি নানা ধরণের মিথ্যা অপবাদের, ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হবে।

তোমার বাড়ি-ঘর, সহায় সম্পদ বিনষ্ট হবে; আহার নিদ্রায় কষ্ট পাবে। তোমার উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তোমার নামে কুৎসা ছড়িয়ে দেয়া হবে। বিরোধী শক্তি তোমাকে অবরোধ করবে; দেহের রক্ত ঝরবে। তোমার সামনে নানা ধরণের লোভ-লালসা দেখানো হবে। বিভিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করা থেকে তোমাকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু তোমার কাজে তুমি থাকবে অটল অবিচল। তোমাকে এমন ধৈর্য ধারণ করতে হবে, যে ধৈর্যের শেষ সীমা−শেষ পর্যায় বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ওহীর সূচনাতেই মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে এ কথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, কি কাজের জন্য তোমাকে বিশ্বনবী হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে এবং কেন করা হয়েছে। এই কাজের সূচনা কিভাবে করা হবে। এই কাজের কারণে কোন মানুষের কাছে এ কথা বলা যাবে না যে, আমি তোমাদের হেদায়াতের জন্য এসেছি; তোমাদের কল্যাণ করছি, তোমরা আমার হাতে হাত দিয়ে ঈমান যখন আনলে তাহলে এবার আমাকে আমার বিনিময় প্রদান করো।

এ ধরনের কোন আশা মনে পোষন করা যাবেনা, এ কথা সত্যের প্রচারকদেরকে বলে দেয়া হলো। এ কাজ করতে গেলে কি ধরনের বাধা আসবে তাও স্পষ্ট করে বলে দিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে বলা হলো। এভাবে আল্লাহ তাঁর নবীকে দায়িত্ব দিলেন এবং কিভাবে তিনি কাজ করবেন, কার্য ক্ষেত্রে যে সব অসুবিধা দেখা দিত তা দূর করার পথের সন্ধান দিতে থাকলেন। অর্থাৎ ক্রমাগতভাবে ওহী অবতীর্ণ হতে

থাকলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওহী ধারণ করার ক্ষমতা ক্রমশঃ অর্জন করলেন। হযরত জিবরাঈল যে সময়ে ওহী তাঁর কাছে আবৃত্তি করতেন তিনিও তাঁর সাথে দ্রুত আবৃত্তি করতে থাকেন। প্রিয় বন্ধুর এই অস্থিরতা–ব্যস্ততা মহান আল্লাহর কাছে সহ্য হলো না। তিনি তাঁর রাসূলকে বললেন–

وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهْ–وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا–

কোরআন পড়ার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করো না যতক্ষণ না তোমার প্রতি তার ওহী পূর্ণ হয়ে যায় এবং দোয়া করো, হে আমার রব্ব ! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা ত্বা-হা)

আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবকে জানিয়ে দিলেন, আমার ওহী তোমার স্মৃতিতে অম্লান রাখা আমার দায়িত্ব। তুমি শুধু তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকো। আল্লাহ বলেন–

لاَتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ–اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْنَهٗ–فَاِذَا قَرَاْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ–ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ–

এই ওহী অত্যন্ত দ্রুত মুখস্থ করে নেয়ার জন্য তোমার জিহ্বা দ্রুত সঞ্চালন করো না। তা মুখস্থ করিয়ে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। সুতরাং, আমি যখন (আমার পক্ষ থেকে আমার ফেরেশ্তা) পড়তে থাকি, তখন তুমি তার পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকে। তারপর এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমারই দায়িত্ব। (সূরা কিয়ামাহ্-১৬-১৯)

দ্বিতীয় খন্ডের আলোচিত বিষয়

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের
তাফসীর মাহফিল থেকে

বিষয়ভিত্তিক
তাফসীরুল কোরআন

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

ISBN-984-31-1425-13